পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ

প্রথম খণ্ড

(মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)

হায়দার আকবর খান রনো

BanglaBook.org

"পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ" দুই খণ্ডে সম্পন্ন ইতিহাস গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডটি মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী খণ্ডে থাকবে পাকিস্তান আমল।

ইতিহাস গ্রন্থ হলেও গতানুগতিক ধারায় ইতিহাস লেখেননি লেখক হায়দার আকবর খান রনো। প্রথম খণ্ডে প্রধানত বৃটিশ আমলের ঘটনাবলী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা তুলে ধরা হয়েছে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বের ভূমিকা, শ্রমিক কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, তার শ্রেণী উৎস এবং রাজনীতিতে তার প্রভাব— এই সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য শিল্পকলায় কিভাবে বিবর্তন ঘটেছে, সামাজিক চেতনায় তার প্রগতিমুখী উত্তরণ ঘটেছে, সে-সবের চমৎকার বিবরণ আছে। লেখক নিজে বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা। ইতিহাসকে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাসমূহকে অবিকৃত রেখেই। এই গ্রন্থটি ইতিহাসের ছাত্র এবং বাম রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে থাকবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া যায়।

www.BanglaBook.org

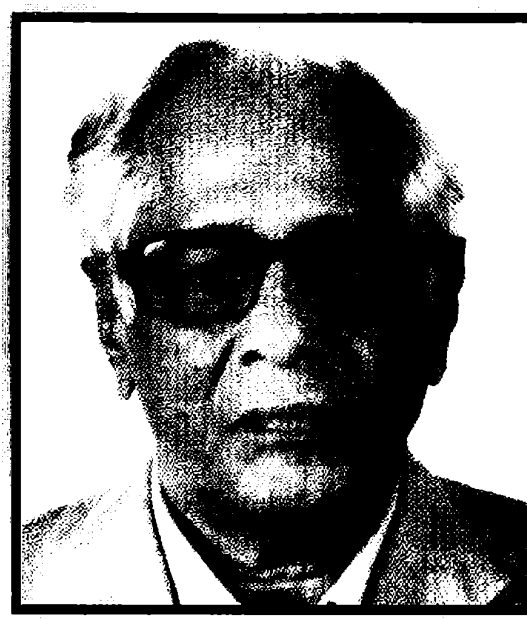

হায়দার আকবর খান রনো (জন্ম : কলকাতা ১৯৪২) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় নেতা। একই সঙ্গে জননেতা ও তাত্ত্বিক। ১৯৬০ সালে যখন তিনি পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছিলেন, তখনই তিনি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন বাঁক ও মোড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য।

'৬২-এর সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা। ষাটের দশকে নতুন ধারার শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক। '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম রূপকার। রনোর বৈচিত্রময় জীবনে তাঁকে বার বার কারাবরণ ও আত্মগোপনে যেতে হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে চলেছেন। মার্কসবাদ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপর বই লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র। পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখেন।

পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ

পলাশী থেকে মুক্তিযুদ্ধ

প্রথম খণ্ড

হায়দার আকবর খান রনো

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছায়াবীথি

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৮, অগ্রহায়ণ ১৪২৫

প্রকাশক
জাহাঙ্গীর আলম
ছায়াবীথি
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০
মোবাইল : ০১৭২৩৮০৭৫৩৯, ০১৮৭২-৭৩৪৫০৫
E-mail : chayabithi2012@gmail.com
Web: www.chhayabithi.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

স্বত্ব
লেখক

কম্পিউটার কম্পোজ
এলিয়েন গ্রাফিক্স
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
ইছামতি প্রেস
নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪২৫.০০ টাকা

PALASHI THEKE MUKTIZUDDHA (1st Part) Writen by Haider Akbar Khan Rano
Published by Jahangir Alam, Chhayabithi, 45/1-A Purana Paltan, 3rd Floor, Dhaka 1000

Local Price in BDT : 425.00 Only
Intl. Price in USD : $ 21.00 Only

ISBN : 978-984-93353-0-6

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে
বঙ্গমাতার যে বীর সন্তানরা
জীবন বিসর্জন দিয়েছেন
তাদের স্মরণে –শ্রদ্ধাভরে

সূচি

ভূমিকা			০৯
পরিচ্ছেদ এক	:	প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা	১৩
পরিচ্ছেদ দুই	:	বাংলায় ইসলাম ধর্মের অভ্যুদ্বয়	১৯
পরিচ্ছেদ তিন	:	বৃটিশ শাসনে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন	২৪
পরিচ্ছেদ চার	:	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও বাংলা লুণ্ঠন	৩১
পরিচ্ছেদ পাঁচ	:	ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিভিন্ন পর্যায়	৪২
পরিচ্ছেদ ছয়	:	ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের কৃষক বিদ্রোহ	৫০
		সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	৫০
		রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)	৫৬
		চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-১৭৯৯)	২৭
		সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭)	৬০
পরিচ্ছেদ সাত	:	নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১)	৬৪
পরিচ্ছেদ আট	:	ওয়াহাবি ও ফরাজী আন্দোলন	
		তিতুমীরের বিদ্রোহ	৬৯
পরিচ্ছেদ নয়	:	উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ	৭৬
পরিচ্ছেদ দশ	:	সিপাহী অভ্যুত্থান (১৮৫৭)	
		ফিরে দেখা দেড়শ বছর পেছনে	৯২
পরিচ্ছেদ এগারো	:	স্বদেশী আন্দোলন, কংগ্রেস ও গান্ধীর আন্দোলন	১০৩
পরিচ্ছেদ বারো	:	সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা	১১৪
পরিচ্ছেদ তেরো	:	কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক কৃষকের সংগ্রাম	১২৫
পরিচ্ছেদ চৌদ্দ	:	বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি মহান কৃষক সংগ্রাম	১৪৪
		তেলেঙ্গনার বিদ্রোহ	১৪৪
		ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন	১৪৯
		ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ	১৫৫
		নানকার বিদ্রোহ: বৃহত্তর সিলেট	১৬১
পরিচ্ছেদ পনেরো	:	বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার শিল্প-সাহিত্য	১৬৯
পরিচ্ছেদ ষোলো	:	সাম্প্রদায়িকতা, পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশ ভাগ	২৩৮

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিকা

২০১৪ সালে একটি বেসকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' এই বিষয়ের উপর নিয়মিত লেকচার দেবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল। কলা ও বিজ্ঞান উভয় অনুষদের সকল বিভাগে এই বিষয়ের উপর একটি বাধ্যতামূলক পেপারও আছে। তার উপর পরীক্ষাও হয়। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমি তখন থেকে উপরোক্ত বিষয়ের উপর ক্লাস নিয়ে আসছি। শিক্ষাদান করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে এই বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক নেই। অথবা যা আছে তা আমার পছন্দ মতো নয়। তাই আমি প্রতি লেকচারের পাশাপাশি আমার তৈরি নোটস ছাত্রদের জন্য সরবরাহ করে আসছি। সেই সকল নোটস একত্রিত করে কিছু সংযোজন বিয়োজন করে এই গ্রন্থটি তৈরি করা হয়েছে। এটি দুই খণ্ডে সম্পন্ন বই হবে। প্রথম খণ্ডটিতে রয়েছে বাংলার মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনটি পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস। প্রথম খণ্ডটি এখন প্রকাশিত হলো। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক সামাজিক ও গণআন্দোলনের ঘটনাবলি। আশা করা যায় এই বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটি ছেপে বের হবে। ১৯৭১ সালের নয় মাসে বিভিন্ন স্তরে বহুমুখী ধারায় যে অসম সাহসী মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, যা ছিল প্রধানত জনযুদ্ধ, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেক লেখক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ মুক্তিসংগ্রামকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যাতে মনে হয়, মুক্তি সংগ্রাম বুঝি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে তার সমাপ্তি ঘটে। ইতিহাস বলতে তারা ১৯৪৭ সাল থেকে আরম্ভ করেন। এর আগের বৃটিশ রাজত্বের দুইশ বছরের (১৯০ বছর) ইতিহাস আমরা উচ্চারণ করি না। আমি এই গ্রন্থে বৃটিশ রাজত্বকাল ও পরবর্তীতে পাকিস্তান রাজত্বকাল- দুই পর্বে যে মুক্তি সংগ্রাম হয়েছিল তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছি। প্রথম খণ্ডটি

শেষ হয়েছে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। পরবর্তীতে পাকিস্তান পর্বটি আলোচিত হবে দ্বিতীয় খণ্ডে।

এই গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডের দুইটি পরিচ্ছেদ (নয় ও দশ) আমার অন্যত্র লেখা (কিছু সংশোধনীসহ) হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। নয় নম্বর পরিচ্ছেদ আমারই লেখা বই 'রবীন্দ্রনাথ-শ্রেণী দৃষ্টিকোণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মহান সিপাহী অভ্যুত্থানের (১৮৫৭) উপর দশ নম্বর পরিচ্ছেদটি আমারই লেখা অন্য এক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। সিপাহী অভ্যুত্থানের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমার সেই লেখাটি দুই কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল দৈনিক 'আমার দেশ' পত্রিকায়।

আমি ইতিহাস বই লিখছি ঠিকই, কিন্তু তা পাঠ্যপুস্তক ধরণের বা গতানুগতিক ধরণের ইতিহাসের বই নয়। জনগণের চিন্তাচেতনা রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে। তাছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষক সংগ্রাম, শ্রমিক আন্দোলন, গণবিদ্রোহ (যথা ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ), ১৯৪৬ সালের নৌসেনা বিদ্রোহ, গণআন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ, সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রাম (যাকে ইংরেজরা বলত সন্ত্রাসবাদ)– এই সবের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই বই শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য ছাত্ররাই পড়বে না, কমিউনিস্ট ও বামকর্মীরাও পড়বেন, তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানকে কিছুটা সমৃদ্ধ করার জন্য– এমন আশা আমার আছে। বাম রাজনৈতিক কর্মীদের কথাটি মাথায় রেখেই এই বইয়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে।

জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের কোনো ইতিহাস নেই'। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারতের সমাজ ছিল নিশ্চল, সময়ের সঙ্গে তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। 'এশীয় স্বৈরতন্ত্র' সম্পর্কিত মার্কসের তত্ত্বটি ঠিকমত বুঝতে না পারার জন্য অনেক মার্কসবাদীও হেগেলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। কিন্তু 'India has some episodes but no history' এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছেন দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী তার লেখা 'An Introduction to the Study of Indian History' গ্রন্থে। কোসাম্বীর লেখা এই গ্রন্থের একেবারে প্রথম প্যারায় তিনি হেগেলের ভুল ধারণা খণ্ডন করেছেন। আমি কিছু বই ও কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে দেখলাম মধ্যযুগ থেকেই বাংলার ইতিহাস জনগণের

BanglaBook.org

সংগ্রামে ভরপুর। অধিকাংশ সংগ্রাম ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম। বইটি আকারে বড়ো হয়ে যাবে এই আশঙ্কা থেকেই আমি অনেক ছোটখাট গণসংগ্রাম, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষকের সংগ্রামের পরিপূর্ণ ইতিহাস এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। পারলে ভালো লাগত।

এই খণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণ ঘটেছিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট উল্লম্ফন দেখা গিয়েছিল সেই সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ আছে (পরিচ্ছেদ নয়)। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ বিকাশ বুঝতে হলে এই পরিচ্ছেদটি কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। সেটা রেনেসাঁ ছিল কি না সে বিতর্ক আমি এড়িয়ে গেছি। কিন্তু এ কথা আমি বলতে চাই যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি এবং হিন্দু সমাজ সংস্কারের ঘটনাবলি মোটেও তুচ্ছ বিষয় নয়। এই সকল বিষয় বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না। বইটির আরেকটি পরিচ্ছেদে (পরিচ্ছেদ পনেরো) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, গান, যাত্রা, পালাগান, গণসংগীত, কবিয়ালদের রচনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলোচনা আছে। অনেকে বলতে পারেন এসব তো সাহিত্য সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে, ইতিহাসের বিষয় নয়। পাঠকগণ লক্ষ করলে দেখবেন আমি বিস্তারিতভাবে সাহিত্যের নান্দনিক বিষয়সমূহ আলোচনা করিনি। এটাকে সাহিত্য সমালোচনাও বলা যায় না। কিন্তু কাব্য ও গদ্য সাহিত্য, যাত্রা ও গান, কবিগান থেকে দেশাত্ববোধক গান, বিদ্রোহের গান ও গণসংগীত– এই সবের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় সমাজ চেতনা কীভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। পরিচ্ছেদটি একটু বড়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রগতিমুখী চেতনার বিকাশকে বুঝতে হলে একটু বড়ো তো হবেই।

এই গ্রন্থটি রচনার জন্য সুপ্রকাশ রায়ের 'ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস', 'বিদ্রোহী ভারত', কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের লেখা 'আমার জীবন ও কমিউনিস্ট পার্টি', কমিউনিস্ট নেতা হরেকিষণ সিং সুরজিতের লেখা 'An Outline History of Communist Movement in India' এবং 'March of the Communist Movement in India', নরহরি কবিরাজের লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা', সুমকল সেনের লেখা 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস', আব্দুল্লাহ রসুলের লেখা 'কিষাণ সভার ইতিহাস', মণি সিংহের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবন সংগ্রাম', সুনীতি কুমার ঘোষের লেখা 'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি', জয়া চ্যাটার্জির 'বাঙলা ভাগ

BanglaBook.org

হল', অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'নানকার বিদ্রোহ', সত্যেন সেনের 'বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা', রজনীপাম দত্তের লেখা বই 'India Today' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে আমি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য নিয়েছি।

এই গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা অন্তু চন্দ্র নাথ। আরও বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন ফারুক চৌধুরী, কবি ড. আমিনুর রহমান সুলতান, রেজা শামসুর রহমান, শেখ রফিক, মনজুর এ খুদা তরফদার, মশাররফ হোসেন, দীপঙ্কর গৌতম। আমি এই বন্ধুদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

আমি আগেই বলেছি যে এই বইটি গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তক ধরণের গ্রন্থ নয়। তবে এই বইটি যদি সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী সক্রিয় বাম রাজনৈতিক কর্মীদের কোনো কাজে আসে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

হায়দার আকবর খান রনো
ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৮

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

পরিচ্ছেদ এক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা

বাংলাভাষাভাষিদের ভূখণ্ডরূপে যে অঞ্চলটি দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত তা এখন রাজনৈতিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। পশ্চিম অঞ্চলে রয়েছে ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়াও ভারতের বিহারের কিছু অঞ্চলে এবং পূর্বভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে বাঙালির বাস রয়েছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার সময় বাংলাকেও ভাগ করেছিল।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ছোটনাগপুর ও পূর্বে লুসাই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনও বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়নি। প্রকৃত পক্ষে জাতির উদ্ভব ঘটে পুঁজিবাদী বিকাশের পর্বেই। তার আগে একই ভাষা একই সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠীকে ইংরেজিতে ন্যাশনালিটি বলা হয়। বাংলা ভাষাও প্রায় এক হাজার বছরের পুরানো। সেই সময়ও বাংলা লিপিতেই কয়েকটি ভাষার লিখিত রূপ পাওয়া যায়– বাংলা, অসমিয়া, মনিপুরী এবং অতীতের মৈথালী ভাষা। বাংলাভাষা এসেছে প্রাকৃত ভাষা থেকে যা সংস্কৃত সাহিত্যে (যথা কালিদাসের নাটকে) শ্রমজীবী ও সাধরণ মানুষের কথ্য ভাষারূপে উল্লেখিত আছে।

আর্যরা এসেছিল উত্তর ভারতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে। আর্যরা এই উপমহাদেশ দখল করলে উত্তর ভারতের কোনো কোনো ট্রাইব দক্ষিণ ও পূর্বে সরে যায়। দক্ষিণে গিয়েছিল দ্রাবিড়রা। পূর্বে এবং বাংলাদেশে এসেছিল বং ট্রাইব। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ সালের মধ্যে আর্যরা পূর্ব দিকেও অগ্রসর হয় এবং আজকের বাংলাদেশর ভূখণ্ড দখল করে এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

BanglaBook.org

এই অঞ্চলের প্রচীনতম অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে কিছু পীতবর্ণের গোষ্ঠীর (race) অন্তর্ভুক্ত (পূর্ব দিকে) এবং সাঁওতাল, কোল, ভীম প্রমুখ কৃষ্ণবর্ণের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

আর্যদের ধর্ম থেকে এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের ধর্ম ভিন্ন ছিল। কালক্রমে মিশ্রণ ঘটেছে। শাসক আর্যরা যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম চাপিয়ে দিয়েছিল তা ছিল শ্রেণী শোষণকে রক্ষা করার উপায়। তারা বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথার প্রচলন করে। শূদ্ররা হচ্ছে সবচেয়ে নিচে অবস্থিত। তারা কায়িক শ্রম দিয়ে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য সম্পদ ও সুখের উপাদানসমূহ তৈরি করত। কিন্তু নিজেরা ছিল খুবই দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং মর্যদাহীন। পরবর্তীতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের আবির্ভাব ছিল আর্য শাসক শ্রেণী ও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি রূপ।

বাংলা আর্যদের দখলে গেলেও, কখনও কখনও স্বাধীন রাজা ও ভূস্বামীর আবির্ভাব ঘটেছিল। বিহারের যে অংশ প্রচীন বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা অঙ্গ ও মগধ নামে পরিচিত। বাংলায় অধিকাংশ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতির অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দেখা যায়। আবার মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের দখলেও চলে গিয়েছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার স্বাধীন রাজা। তিনি বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন।

বঙ্গীয় সমতলের রাজারা গৌড় থেকে রাজত্ব করতেন। সেজন্য তাদের গৌড়পতি বলা হতো। বর্তমানের মালদহ (ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) অথবা রাজশাহী জেলার পশ্চিম দিকে গৌড় অবস্থিত ছিল।

মুসলমান বিজয়ের আগে দুইটি রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করেছিল– পাল বংশ ও সেন বংশ। পালরা এই দেশের সন্তান ছিলেন। কিন্তু সেনরা ছিলেন আর্য। পরবর্তীতে তুর্কি, আরব, আফগান, মোগল শাসকরা ছিলেন বিদেশ থেকে আগত। সেনরা এসেছিলেন কর্ণাটক থেকে। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গোপাল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজা রূপে। তার রাজধানী ছিল গৌড়। তার পুত্র ধর্মপাল পরবর্তীতে রাজা হন। তিনি বিক্রমশীল উপাধি গ্রহণ করেন। সেই নামানুসারে তার রাজত্বেরই একটি জায়গা মুন্সীগঞ্জ আঞ্চলের নাম হয় বিক্রমপুর। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাল রাজত্বের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো কৈবর্ত্য বিদ্রোহ। ১০৭০ সালে তখন পাল রাজা দ্বিতীয় মহিপাল ক্ষমতায় ছিলেন। কৈবর্ত্যরা ছিলেন

BanglaBook.org

সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী। সেই যুগের শ্রেণী সংগ্রামের এই বড়ো ঘটনাটি (কৈবর্ত্য বিদ্রোহ) নিয়ে বিশিষ্ট লেখক ও রাজনীতিবিদ সত্যেন সেনের একটি উপন্যাস আছে– 'কৈবর্ত্য বিদ্রোহ'। কৈবর্ত্য বিদ্রোহ সফল হয়েছিল। পাল রাজারা মগধে পালিয়ে যায়। কৈবর্ত্য রাজা ছিলেন পরপর দিব্যক, রুদ্রক ও ভীম। পরে পালরা মগধ থেকে আবার গৌড় দখল করেন।

১১২০ সালে কর্ণাটক থেকে আসা বিজয় সেন গৌড় দখল করেন। তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং বৌদ্ধদের নিশ্চিহ্ন করতে সক্রিয় ছিলেন। সেন রাজাদের আমলে আসামের অংশ বিশেষ পর্যন্ত বাংলার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। সেন আমলে নবদ্বীপে (বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলায় অবস্থিত) রাজধানী ছিল।

সেই আমলে আরব, পাঠান, তুর্কী মুসলমান ব্যবসায়ী ও ধর্ম প্রচারকরা বাংলায় যাতায়াত শুরু করেন। দিল্লিতে তখন মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের অধীনস্থ জায়গীরদার বক্তিয়ার খিলজি মগধ জয় করেন এবং ১২০১ সালে নবদ্বীপ আক্রমন করেন। তখন রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তিনি যশোরে পালিয়ে যান। এরপর খিলজি গৌড় আক্রমণ করেন।

এরপর থেকে শুরু হয় বাংলায় মুসলমান শাসন। একে একে তুর্কী, আরব, আফগান ও মোগলরা শাসন করেছেন। বাংলা কখনও কখনও স্বাধীনও ছিল। ছিল ছোটো ছোটো স্বাধীন নৃপতি। কখনও কখনও বা দিল্লীর শাসকের অধীনস্থ ছিল।

এখনে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার তরবারির জোরে হয়নি। মুসলমান রাজারা ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তারা শাসনকার্যে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়েছিলেন। যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব।

বাংলার নিচুজাতের মানুষ, যারা আবার শ্রমজীবী, প্রধানত কৃষক, তারা কীভাবে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন সেই সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। লক্ষণ সেনের আমলে শাসকরা কি রকম নির্মম, নিষ্ঠুর ছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কীভাবে গোপনে সংগঠিত হচ্ছিলেন এবং সবশেষে কিভাবে মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটল এবং নিচু বর্ণের মানুষ দলে দলে মুসলমান হলেন, তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় বিশিষ্ট লেখক শওকত আলীর অসাধারণ উপন্যাস 'প্রদোষে প্রাকৃতজন'এ।

BanglaBook.org

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত। প্রধানত দুইটি শ্রেণী– সামন্ত ও কৃষক (এবং কারিগর)। শ্রেণী শোষণ থাকলে শ্রেণী সংগ্রামও থাকবে এবং ছিলও। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ছয়ভাগের একভাগ খাজনা হিসেবে সামন্ত প্রভুকে দিতে হতো। শেরশাহ ও আকবরের আমলে তা এক-তৃতীয়াংশে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে তা অর্ধেকের বেশি পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছিল। এছাড়া রাজা ও জমিদারদের নানা ধরণের দৈহিক ও আর্থিক অত্যাচার তো ছিলই। জিয়াবারণির লেখা 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী' শীর্ষক রচনায় লেখা আছে, 'লোকে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের যমের মতো ভয় করত। এই বিভাগের কেরানিগিরি করাকে পাপকর্ম বলে গণ্য হতো।'

অনেক সময়ই স্থানীয় কৃষক ও সৈনরাও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, যা শাসকরা নির্মমভাবে দমন করেছিল। সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে স্থানীয় কোতওয়ালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাজি মোল্লা নামে জনৈক কোষগার রক্ষীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে স্থানীয় জনগণ। যশোরের জমিদার কেদার রায়ের রাজত্বকালে বর্তমানের নোওয়াপাড়ায় কৃষক জনগণ বিদ্রোহ করেছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষক প্রজা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে এই ঘটনাটি বেশি করে ঘটেছিল। কৈবর্ত্য কবি রামদাস তাই লিখেছেন–

'দেশে খাজনার তরে পালাইয়া যাই
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই।'

সেই যুগে শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিত ধর্মীয় আন্দোলনের আবরণে এবং লোকগীতি ও লোক সাহিত্যে। বাংলায় শ্রী চৈতন্য যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন তা একেবারে নতুন ধর্ম নয়। বলা যেতে পারে হিন্দু ধর্মের সংস্কার। ১৪৮৬ সালে নবদ্বীপে তাঁর জন্ম। তখন বাংলায় মুসলমান শাসন আমল চলছিল। নিচু বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হচ্ছিল। শ্রী চৈতন্যের মানবতাবাদী উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে ধর্মান্তরিত হওয়ার স্রোতকে ঠেকিয়েছিল। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হলেও হিন্দুর জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর অনেক মুসলমান শিষ্যও ছিল। বাংলার সামজিক ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকা ছিল বিরাট এবং ইতিবাচক।

BanglaBook.org

মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও বেশ কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা প্রায় সকলেই দরিদ্র মেহনতী শ্রেণী থেকে আগত। তারা হিন্দু মুসলমানের ঐক্য এবং মানবতাবাদী সমাজের জন্য প্রচার করেছিলন। যেমন কবীর লিখেছিলেন, 'হিন্দুর হিন্দুয়ানী, মুসলমানের মুসলমানী দুইই দেখিলাম। ইহাদের কেহই পথের সন্ধান দিতে পারিল না।' কবীর ছিলেন মুসলমান ঘরের সন্তান, বংশগতভাবে তাঁতি। তার অনেক বক্তব্য যথেষ্ট উচ্চ মানের দর্শনিকতায় পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কিছু বাণী ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

দাদু প্রচার করছিলেন, "হিন্দু মুসলমানের দুই হাত। দুই হাত একত্রে না হলে কেমন করে অঞ্জলি রচিত হবে?"

রামানন্দের শিষ্য শোন ছিলেন নাপিত, ধন ছিলেন শূদ্র আর রামদাস ছিলেন মুচি। মারাঠা কবি তুকরাম ছিলেন নিম্নবর্ণীয়। তারা সকলেই সমাজ সংস্কারক, কবি, মানবতাবাদী ও দরিদ্র মেহনতী ঘর থেকে আসা মহাপুরুষ।

মধ্যযুগে নানক, কবীর, শ্রী চৈতন্যের ধর্মাশ্রয়ী রচনাসমূহ সাহিত্য রসের দিক দিয়েও উন্নত ছিল। আবার মানবতাবাদী গুণেও সমৃদ্ধ ছিল। বাংলায় এই ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যা অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

মধ্যযুগে বাংলায় পাচালি, যাত্রা, সংগীত প্রভৃতির রচনা ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বেশ উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ধর্মের আবরণ থাকলেও তার মানবিক দিক ছিল প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে শোষিত মানুষের ক্ষোভের প্রকাশ ও সংগ্রামের দিকও ছিল।

সেই সময়ের পদাবলি সাহিত্য হিসাবেও উন্নত। যদিও তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম অথবা ধর্মীয় উপাদান ছিল তবু তার মানবিক দিকটাই ছিল প্রধান।

যেমন, চণ্ডীদাসের কবিতার কয়েকটি লাইন এখনও উদ্ধৃত হয়—

"শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম, দৌলতকাজী, আলাউল, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ ইতিহাস বিখ্যাত। তাদের অধিকাংশ কবিতায় শোষিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়।

BanglaBook.org

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম ও সবশেষে ইসলাম ধর্মকে সামাজিক বিকাশ এবং শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে দেখা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম ছিল আদিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যে খৃষ্টানধর্ম ও ইসলামধর্ম ছিল শোষিত মানুষের শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার।

বাংলায় সেন রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্মের উপর নির্মম নিপীড়ন চলেছিল। বৌদ্ধ ধর্মও দীর্ঘ শতাব্দী ধরে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের যে সংস্করণটি জনপ্রিয় হয়েছিল তা সহজিয়া ধর্ম নামে পরিচিত। সহজিয়া ধর্মের মধ্যে মানবিক দিক অনেক বেশি ছিল। সহজিয়া ধর্মের সাহিত্যে বৈদিক ধর্ম, পৌরাণিক পূজা পদ্ধতি, এমনকি বৌদ্ধ ধর্মের অনেক আচার নিষ্ঠাকে কটাক্ষ করা হয়েছিল।

এক কথায় মধ্যযুগেই বাংলার সমাজে এক ধরনের উদারনীতিবাদী ভাবাদর্শ মানুষের মনে বিরাজ করছিল। এই কারণেই বাংলাদেশে সেই সময়ের তুলনায় প্রগতিশীল ইসলাম ধর্মকে জনগণ সহজে মেনে নিয়েছিল।

পরবর্তীতে আমরা বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ দুই

বাংলায় ইসলাম ধর্মের অভ্যুদ্বয়

আগেই বলা হয়েছে যে বাংলার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তার পেছনে রাজশক্তি কাজ করে নি। মুসলমান শাসকদের প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লী। অথচ দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষ হিন্দুই রয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলা ছিল দিল্লী থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, মোগল আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা আদেশ জারি করেছিলেন কোনোরকম ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে সেনাপতি, শাসক, বড়ো আমলা হিসেবে পশ্চিম থেকে যারা এসেছিলেন তারা নিজেদেরকে অভিজাত মনে করতেন। মুসলমান হলেও তাদেরকে বলা হতো আশরাফ। আর নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বলা হতো আতরাফ। আশরাফ-আতরাফদের সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব ছিল। শাসক আশরাফরা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত। অথবা দুই এক পুরুষ আগে ভারতের বাইরে পশ্চিমের দেশ থেকে এসেছেন। মোটকথা বহিরাগত। তাদের ভাষাও ছিল ভিন্ন। ফার্সি, উর্দু, ইত্যাদি। বাংলা নয়। ধর্মের দিক দিয়েও তারা প্রধানত ছিলেন শিয়া। তারা নিজেরাও নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী হিন্দুদের মুসলমান বানাতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। তারা আতরাফদের নিচু জাত বলে মনে করতেন। যদিও ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ বলে কোনো কিছু কোনোদিনই ছিল না। আশরাফরা বাস করতেন নগরে। আর আতরাফরা থাকতেন গ্রামে, পেশায় কৃষিজীবী। "আশরাফ-আতরাফ বিভাজনের প্রসঙ্গটি স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র মঙ্গলকাব্যে বিধৃত ষোড়শ শতাব্দীর নগরবাসী বহিরাগত মুসলমান ও

BanglaBook.org

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ধর্মান্তরিত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আর্থ-সামজিক অবস্থানের নিপুণ বর্ণনায়।" (অতীশ দাসগুপ্ত)

স্বাভাবিকভাবেই শাসকশ্রেণী আশরাফ মুসলমানরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। আর শাসকশ্রেণী মাত্রই অত্যাচারী। কিন্তু যে বহিরাগত ধর্ম প্রচারকদের হাত ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই ধর্মের প্রচারকরা প্রতিক্রিয়াশীল-শোষক-শাসক ছিলেন না। বরং সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা ছিলেন সাধু পুরুষ এবং অবশ্যই মহাপুরুষ। তারা ছিলেন প্রধানত সুন্নি মুসলমান এবং সুফী মতবাদে বিশ্বাসী।

বাংলার সাধারণ মানুষ এই মহাপুরুষদের জীবন আচরণ দেখে এবং নতুন ধর্মের (ইসলাম) মধ্যে সাম্য তথা তুলনামূলক প্রগতিশীল উপাদান দেখে আকৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আরও দুইটি বিষয় আলোচিত হওয়া আবশ্যক। একটি হচ্ছে দার্শনিক দিক। অপরটি হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক।

বাংলার গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের মধ্যে সহজিয়া মতবাদ যে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। জনগণ ধর্ম প্রচারকদের সুফি মতবাদের সঙ্গে সহজিয়া মতবাদের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। তাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে মনের দিক থেকেও তাদের কোনো বাধা ছিল না। বাংলার লোকায়েত সমাজে প্রচলিত দর্শন এই ক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তারকে সহজতর করেছিল। এই দর্শনটি ছিল বেদ বিরোধী এবং তার প্রকাশ ঘটেছিল 'সহজিয়া' ধর্মের মধ্যে। সহজিয়া দর্শনের স্বীকৃতি এসেছিল অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের রাজত্বকালে। 'সহজিয়া' মতবাদ কেবল বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপার ছিল না। বাংলার হিন্দু সমাজেরও এক বড়ো অংশের মধ্যে তার প্রভাব ছিল।

সহজিয়া ঐতিহ্যের দুইটি ধারা প্রকাশিত হয়েছিল– সগুণ ও নির্গুণ। বৈষ্ণব সহজিয়া ভক্তিবাদের প্রকাশ ঘটেছিল সগুণ ধারায় যার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন শ্রীচৈতন্য দেব ও চণ্ডীদাস। আর নির্গুণ সহজ পথের পথিক হলেন বাউল সাধকরা। চৈতন্যদেব ও চণ্ডীদাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামাজিক অবদান হলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ। তবে বৈষ্ণব সাধকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও তাদের সহজ পন্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমিত থাকলো রাধা ও কৃষ্ণের লীলার জয়গানে।

BanglaBook.org

অন্যদিকে নির্গুণ বাউল সাধকরা অধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভই তাদের দর্শন চেতনার মূল বিষয় ছিল। তবে তারা ঈশ্বরকে খুঁজেছেন চৈতন্যের গভীরে, মনের মানুষ রূপে। সেই জন্য বাউল সাধকরা ছিলেন মানবিক। তাদের সংগীতে যত না আধ্যাত্মিকতার বিষয় রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে মানবিকতার স্পর্শ। বাউল সাধকদের এই ঐতিহ্যই সুফিবাদী ইসলামী মতবাদকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। সূফীবাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা থাকলেও মানবিক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের এক মহৎ কাজ বাউল গনের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে 'হারামনি' নামে। সেই সংকলনের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন– "আমাদের দেশে যারা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তারা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি– এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে। কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদ-বিরোধে বর্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের আগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"

বাংলার বাউল ও উত্তর ভারতের সুফি সাধকদের মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায় যারা ধর্মীয় সমন্বয়ের গান গেয়েছেন। উত্তর ভারতেও অনেকে সুফি সাধকদের মাধ্যমে লোকায়ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তাতি সম্প্রদায়ের মুসলিম সাধক কবীরের কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাক। হিন্দুস্তানি ভাষায় বাধা গান বঙ্গানুবাদ করে নিচে উদ্ধৃত হলো।

"খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে বাকি জায়গাটা কার? তীর্থে মূর্তিতেই যদি রাম থাকে তবে তার বাইরে বিস্তীর্ণ সমাজটা দেখে কে?"

BanglaBook.org

অথবা

"আমাকে যদি হিন্দু বলতে চাও, তবে আমি হিন্দু নই। আমি মুসলমানও নই। তবে কী আমার পরিচয়? পাঁচ তত্ত্বের এই শরীর, তার মধ্যে অনির্বচনীয় নিগূঢ় পুরুষ করছেন লীলা, এই পরিচয় ছাড়া আর কী বলতে পারি?"

আবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বাংলাদেশের লোকসমাজে যে দার্শনিক পরিবেশ ছিল তাতে সুফি মতবাদী ইসলাম ধর্ম খুব সহজে জায়গা করে নিতে পেরেছিল।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম ইসলামকে ম্লেচ্ছ অথবা শত্রুভাবাপন্ন ধর্ম হিসাবে দেখে থাকলেও সহজিয়ারা ইসলাম ধর্মকে সেভাবে দেখেনি। তাই বাঙালি গরিব কৃষকের মনকে সহজেই টানতে পেরেছিল উদারপন্থী সুফিবাদী ইসলাম ধর্ম।

একইভাবে শরীয়ত পন্থী কট্টর মোল্লাতন্ত্র হিন্দু ধর্মকে যেভাবে শত্রুতার মনোভাব নিয়ে দেখে, সুফি সাধকদের সহিষ্ণু মানোভাবের সঙ্গে তার দুস্তর তফাৎ ছিল। সুফি দর্শনের সঙ্গে মতবিনিময় প্রসঙ্গে সহজিয়া সাধকদের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। নির্গুণ সহজিয়ারা অর্থাৎ বাউলরা যতটা সুফিদের প্রসঙ্গে সহিষ্ণু ছিলেন, সগুণ সহজিয়ারা অর্থাৎ বৈষ্ণবরা ততটা উদার ছিলেন না।

এবার ইসলাম ধর্ম বিস্তারের কারণ অনুসন্ধানে অর্থনৈতিক দিকটা দেখা যাক। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গঙ্গানদীর মূল স্রোত গঙ্গার শাখা পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে বাংলার জনপদের সাথে উত্তর ভারতের সংযোগ সহজতর ও অধিক বিস্তৃত হয় জলপথের মাধ্যমে। আগে গঙ্গার নদীর পানি প্রধানত ভাগিরথী দিয়ে প্রবাহিত হতো। এর ফলে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। তুর্ক-আফগান যুগের শেষ পর্বে এবং মুঘল রাজত্বের প্রথম পর্বে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলার সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। এই ঘটনাটির সঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রসারের বিষয়টি যুক্ত ছিল কীভাবে?

এই সময় একদিকে যেমন শাসনকর্তাদের কাছ থেকে অধিক রাজস্ব আদায়ের চাপ তৈরি হয়েছিল, অন্যদিকে তারই প্রয়োজনে অথবা জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গল কেটে নতুন জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গের তুলনায় পূর্ব বঙ্গেই জলা-জঙ্গল বেশি ছিল। তাই

BanglaBook.org

জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি জমি উদ্ধারের ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছিল পূর্ব বঙ্গে অর্থাৎ সেই অঞ্চলে যা আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত। তাই দেখা যায়, রাজস্ব আদায়ের বৃদ্ধির হার পূর্ব বঙ্গেই বেশি ছিল। ১৫৯৫ থেকে ১৬৫৯ সালের মধ্যে অর্থাৎ অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এই বৃদ্ধির হার ছিল ১১৭ শতাংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় তা ছিল ৫৪ শতাংশ।

এই অর্থনৈতিক দিকটি কীভাবে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তা জানা যায় ঐতিহাসিক অতীশ দাসগুপ্তের নিম্নোক্ত গবেষণালব্ধ বিবরণ থেকে।

"রাজস্ব সংগ্রহের বর্ধিত মূদ্রা অর্জনের জন্য জমির সন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলো কৃষি কর্মে উৎসাহী নতুন নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে পরিশ্রমী কৃষক শ্রেণীর, যারা স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এই আর্থিক তাগিদ যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করল তার বিভিন্ন অভিমূখ ছিল। উৎসাহী নেতৃত্ব দিতে যারা এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষই ছিলেন। যা লক্ষণীয় তা হলো, উৎসাহী হিন্দুদের অধিকাংশ ছিলেন উচ্চ বর্ণের বর্হিভূত, আর উৎসাহী মুসলমানদের বেশিরভাগই শরীয়ত পন্থী ছিলেন না, তাদের আনুগত্য ছিল বিভিন্ন সুফি সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এদের নেতৃত্বে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নিম্ন বর্ণের কৃষক সমাজভুক্ত বিশাল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ সাড়া দিলেন জঙ্গল সাফ করে কৃষি জমি সম্প্রসারণের অভিযানে। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মাবলম্বী বেশ কিছু উদ্যোগী মানুষ। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সুফি সম্প্রদায়ভূক্ত মুসলমান নেতৃত্বের। তার ফলস্বরূপ যে বিশাল সংখ্যক কৃষক পূর্ববঙ্গে এদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তাদের অধিকাংশ সুফি মতামতের প্রভাবের মধ্যে আসতে শুরু করলেন। তুর্ক-আফগান-মুগল শাসকরা কিন্তু এই প্রভাব আরোপিত করেননি। এটি হলো আর্থিক তাগিদের আরেকটি অভিমুখ বা বৈশিষ্ট।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ তিন

বৃটিশ শাসনে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন

মোগল আমলের শেষ দিকে বাংলার গ্রাম

বাংলার বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করতো। তারা কিছু কৃষিজীবী, কিছু হস্তশিল্পী, তাঁতি। গ্রামে একজন প্রধান ব্যক্তি থাকত। তার ক্ষমতা অনেক। তার কাজ ছিল খাজনা আদায় করা, শান্তি রক্ষা করা ও বিচার করা। কৃষক ও হস্তশিল্পী ছাড়াও ছিল গুরুমশাই (শিক্ষক), জ্যোতিষী, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি– যারা গ্রামবাসীদের সেবা করতেন। বিনিময়ে গ্রামবাসীরা তাদের কিছু নিষ্কর জমি দিত।

ব্যবস্থাটি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তবে ইউরোপের মতন নয়। এখানে জমিদার ছিল প্রধানত খাজনা আদয়কারী যে খাজনা যেতো রাজা বা সম্রাটের কাছে। জমিদার সেই আদায়কৃত খাজনার অংশ লাভ করত।

গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামবাসীর প্রয়োজন গ্রামেই মিটতো। লবন ও মশলা ছাড়া অন্য কিছু আমদানীর প্রয়োজন হতো না। মুদ্রার প্রচলন ছিল সীমাবদ্ধ।

এমন নিশ্চল স্থবির গ্রামীন জীবন সম্পর্কে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন ('ভারতে বৃটিশ শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধে) "এই হীন অচল ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। ... ছোটো ছোটো এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে

BanglaBook.org

অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা পশু করে তোলে মানুষকে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমান দেবরূপী বানর এবং শাবলাদেবরূপী গরুর আর্চনায় ভুলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।"

প্রায় একই কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সনাতন ভারতের "সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসর বৎসর বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেই গুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই সকল কঠিন সংস্কারের ইট পাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংস্কারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। তাই সংসারের বাইরে মানব ব্রহ্মাণ্ডের দিক দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলছে, তার ঘূর্ণ্যমান নিহারিকা আদ্যোপান্ত সনাতন প্রথায় ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পর সীমানার সংকোচন প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচরে ছিল না।" (কালান্তর– রচনাবলি খণ্ড ২৪, পৃ ২৪৩)

পরিবর্তনের সূচনামাত্র: বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব

স্থবির অর্থনীতির মধ্যেও মোগল আমলের শেষ দিকে নতুন ধরনের উৎপাদন যুক্ত হতে থাকে। কয়েকটি শহরে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে উৎপাদন শুরু হয়, যদিও যান্ত্রিক শিল্প আসেনি। ইউরোপের মতো শিল্প বিপ্লবও হয়নি। কিন্তু বাংলাদেশের বা ভারতের পণ্য ইউরোপে চালান হতো। ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ বণিকরা এই ব্যবসা করতো। বিদেশি বণিকরা বাংলাদেশ থেকে রেশমী দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য ও নীল কিনে ইউরোপে রপ্তানী করত। ব্যবসা হতো রৌপ্য মুদ্রায়। ফলে বাংলাদেশে কিছু লোকের হাতে রৌপ্য মুদ্রা জমা হতে থাকে। রূপা আমদানীর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

দেশি পুঁজিপতি উদ্যোক্তা এবং বিদেশি পুঁজিপতি বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে এবং সমৃদ্ধ নগর তৈরি হয় এবং মজুরি শ্রমিকভিত্তিক কারখানা গড়ে ওঠে। মজুরিও কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

ভারতে ও বাংলায় এক শ্রেণীর উদিয়মান ধনিক দেখা দেয় যারা মহাজনী কারবার, দাদনী কারবার, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও

BanglaBook.org

মজুরী শ্রমিক ভিত্তিক কারখানা করত। তারা রাজা, বাদশা, নবাবকে অর্থাৎ রাষ্ট্রকে ঋণ দিত। রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরেও ধনীক শ্রেণীর প্রভাব দেখা গিয়েছিল। কোনো কোনো পর্যটক লিখেছেন, এই ধনীদের অর্থের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, তা গণনা করা সম্ভব হতো না। সাধারণতঃ ওজন করে অর্থের পরিমাণ নিধারণ করা হতো।

আগে রাষ্ট্রকে খাজনা দিত হতো পণ্যে। প্রধাণত শস্যে। দিল্লীর বাদশাকে খাজনা দেওয়া হতো হাতিতে। নতুন অবস্থায় নগরে কর চালু হলো রৌপ্য মুদ্রার দ্বারা। ঢাকায়, মুর্শিদাবাদে ও অন্যান্য কয়েকটা জায়গায় বড়ো বড়ো কারখানা গড়ে উঠেছিল। যেমন কাশিমবাজারে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের যেসব কুঠি ছিল সেখানে ৭/৮ শত মজুর একত্রে কাজ করতেন।

নতুন ধনীদের মধ্যে মাড়ওয়াড় থেকে আসা জগৎশেঠ পরিবার উল্লেখযোগ্য। সিরাজউদ্দৌলাহ'র বিরুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জগৎশেঠ অন্যতম ছিলেন। ইংল্যান্ডের বার্ক জগৎশেঠ পরিবারের কারাবারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের কারবারের তুলনা করেছিলেন। বস্তুত বাংলা তথা ভারতেও ব্যাংক ব্যবস্থার ভ্রুণ তৈরি হচ্ছিল। জগৎশেঠ ও অন্যান্য সুদী কারবারী ধনীরা আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট ব্যবস্থার মতো ব্যবস্থা চালু করেছিল। তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিল।

তাহলে ভারতেও পুঁজিবাদী বিকাশের উপাদান মাত্র দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তা বিকশিত হয়নি। তার প্রধান কারণ ছিল নিম্নরূপ--

১. রাষ্ট্রের উপর সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ। ইউরোপের মতো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য কোনো লেখক, দার্শনিকের অভ্যুদয় ঘটেনি। কোনো সামাজিক বিপ্লবও হয়নি।
২. ইউরোপের মতো জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেনি। টোল-মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ফলে বৈজ্ঞানিক আবিস্কারও হয়নি। শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রও তৈরি হয়নি।
৩. গ্রামগুলো ছিল অল্পে তুষ্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ। সদ্য গঠিত শহরের ধনীক শ্রেণী গ্রামকে আঘাত করতে পারেনি। বণিকদের বাজার ছিল শহরেই সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ ও একপেশে। অথচ গ্রামেই বাস করতো অধিকাংশ মানুষ।

BanglaBook.org

গ্রামভিত্তিক এই সমাজকে ভেঙ্গে দিয়েছিল বৃটিশ শাসন। বণিজ্যের প্রসারের প্রয়োজনে বৃটিশ শাসন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপন করেছিল। পণ্যের ব্যাপক প্রচলন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার অনুপ্রবেশ ভেঙে দিয়েছিল নিশ্চল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জীবন। বৃটিশ শাসন বাংলা তথা ভারতে যে ধরণের পরিবর্তন এনেছিল তাকে এক ধরনের বিপ্লব বলেই মার্কস অভিহিত করেছেন। বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচক কার্ল মার্কস বলেছেন, বৃটিশরা নিজের অজান্তেই এই ধরনের বিপ্লব সাধন করেছিল। 'ভারতে বৃটিশ শাসন' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন,

"ঐসব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামজিক সংগঠনগুলো অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও জীবিকার্জনে বংশানুক্রমিক উপায়–দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে, এইসব শান্তসরল (idyllic) গ্রাম গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়ানক... এইসব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন।

"এ কথা সত্য যে, ইংল্যান্ড হিন্দুস্থানে সামজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধুই হীনতম স্বার্থ সাধনে; তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, এশিয়ার সামাজিক অবস্থার মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মানব জাতি কি তার নতুন ভবিষ্যত গড়তে পারে? যদি না পারে তবে ইংল্যান্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সাধনে বৃটিশ শাসন ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"

বৃটিশ শাসন এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল তার ইতিবাচক দিক সত্ত্বেও তার ধ্বংসাত্মক দিকটাই প্রধান ছিল। বাংলা তথা ভারত পারাধীন হলো। বৃটিশ পুঁজিবাদ ভারতকে লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু এই দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালু করেনি। করলে তা আপেক্ষিকভাবে হলেও ভালো হতো। কারণ পুঁজিবাদ সামন্তবাদের চেয়ে উন্নত। যে পুঁজিবাদ ইংল্যান্ড বা ইউরোপে সামন্তবাদকে ধ্বংস করেছিল, ভারতে এসে বৃটিশরা সেই

BanglaBook.org

পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। বরং নতুন ধরণের সামন্তবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। বৃটিশের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ছিল বর্বর, নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক।

প্রথম পর্যায়ে কোম্পানী যা করেছিল তা হলো উলঙ্গ বর্বর লুণ্ঠন। একদিকে কুটির শিল্প দ্বারা তৈরি মসলিন কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য জোর করে নগণ্য মূল্যে কিনত যাতে উৎপাদন খরচও উঠত না। অপরদিকে জমির খাজনা অত্যাধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল যার ফলে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই বাংলা দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পর কৃষককে জমিদারের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জমিদারের সামন্ত শোষণ অব্যাহত ছিল এবং অনাহার ও দুর্ভিক্ষ গ্রামীণ জনগণের নিত্য সাথী ছিল। কুটির শিল্পকে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে ধংস করা হয়েছিল, এমনকি দক্ষ তাঁতীদের আঙ্গুলও কেটে দেয়া হয়েছিল যাতে বাংলার তাঁত শিল্প ধংস হয়ে যায়।

বৃটিশ শাসন যে গ্রাম বাংলার নিশ্চল জীবনকে ভেঙে দিয়েছিল সেটা ছিল ইতিবাচক, বৈপ্লবিক। কিন্তু বৃটিশ পুঁজিবাদ একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক ঔপনিবেশিক শাসন। এইখানেই ছিল মার্কসের আক্ষেপ। তিনি এই মর্মবেদনা প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে, "ভারত হারাল তার পুরানো জগৎ কিন্তু নতুনত্বের আস্বাদ থেকেও সে রইল বঞ্চিত।"

সেই যুগে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় চেতনা

জাতি ও জাতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিবাদের অবদান। একই অঞ্চলের এক ভাষাভাষি ও একই ধরনের সংস্কৃতির অধিকারী মানুষকে একটি জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে পুঁজিবাদ নিজস্ব বাজারকে সংরক্ষিত করার স্বার্থে। জাতীয় চেতনা তৈরিও হয় একই সাথে। কিন্তু পুঁজিবাদের আগেও একই ভাষাভাষি ও একই সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতি গঠনের (Nationality) প্রক্রিয়া দেখা যায়। মোগল আমলেও বারো ভূঁইয়ার অভ্যুদয় এবং বাংলার ছোটো ছোটো শাসকদের দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তার মধ্যে কিছুটা ন্যাশনালিটি গঠনের প্রক্রিয়া দেখা যায়। সম্রাট আকবরের আমলে চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি জমিদাররা মোগল শাসনকে বিদেশি শাসন বলে চিহ্নিত করে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। এটাকে অনেক

BanglaBook.org

ঐতিহাসিক জাতীয়তার ভ্রূণ বলে বর্ণনা করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক বাংলার মুসলমান নবাবদের (যথা আলিবর্দি, সিরাজদ্দৌলা, মীর জাফর) হিন্দু প্রজাদের হোলি উৎসবে যোগদানের ঘটনাকে কিছুটা বাঙালি হয়ে যাবার প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। নরহরি কবিরাজ তার "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা" শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে এই দিকটি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে "এই রাজা, বাদশা, সামন্তপ্রভূ ছাড়াও সাধারণ নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মগত ও সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যমের মাধ্যমে এই বাঙালি 'ন্যাশনালিটি' গঠনের প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হতে থাকে।"

তবে একথা সত্য যে, জাতীয় চেতনা তৈরি হয়েছে বৃটিশ যুগেই। বৃটিশ বিরোধী মনোভাব থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় চেতনার অভ্যুদ্বয় ঘটে। সেটা অনেক পরে। এবং সেক্ষেত্রে বৃটিশ প্রবর্তিত পাশ্চত্যের শিক্ষা অপ্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছিল।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলাহ'র পরাজয় থেকে কলোনীর যুগ শুরু হলেও সেদিন কিন্তু এই দেশের জনগণ বোঝেনি, কী তারা হারালো। নবাব সিরাজও তাদের কেউ নন। তিনিও বিদেশি ভাষায় কথা বলেন। ইংরেজ ক্লাইভও তা-ই।

অবশ্যই মোগল শাসন এবং ইংরেজ শাসনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। মোগল বা মুসলমান শাসক বা তার পূর্ববর্তী অন্যান্য শাসকরা বিদেশ থেকে আগত হলেও (সেই অর্থে আর্যরাও বিদেশি) তারা ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। তারাও শাসক শ্রেণী। কিন্তু দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে যায়নি। একমাত্র ইংরেজরাই বাংলা তথা ভারত থেকে শোষণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বা সম্পদ অথবা সরাসরি লুণ্ঠনকৃত সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করেছিল। তাই ইংরেজ আমলকে বলা হয় কলোনীর যুগ বা পরাধীনতার যুগ।

কিন্তু ইংরেজ শাসন বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন যে নতুন অন্ধকার যুগ বা পরাধীনতা যুগের সূচনা করেছিল সেই বোধ তখন না জনগণের না সিরাজ বা ক্লাইভের অধীনস্থ এদেশীয় সৈন্যদের উপলব্ধির মধ্যে ছিল। এই প্রসঙ্গে নাজমা জেসমিন চৌধুরীর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য ('বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

BanglaBook.org

"সিরাজদ্দৌলা যখন পলাশীর রণাঙ্গনে ক্লইভের সঙ্গে জীবন মরণ যুদ্ধে রত, শোনা যায় তখন না কি রণস্থলের নিরাপদ দূরত্বে উপস্থিত ছিল এদেশের কৌতূহলী নিষ্ক্রিয় দর্শকবৃন্দ। যুদ্ধটা তাদের কাছে সম্ভবত প্রতিভাত হয়েছিল শক্তির ব্যক্তিগত পরীক্ষা রূপে। ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধে প্রজাকুলের ঔদাসীন্য ১৭৫৭ সালের সময়ের এবং তার আগের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটা স্মারকচিহ্ন। অতীতে ভারতবর্ষের স্বল্পতুষ্ট, স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মকেন্দ্রীক, অপরিবর্তনশীল গ্রামীণ জীবনে রাজকীয় ক্ষমতার লড়াই তেমন বিরাট করে আঘাত হানতে পারত না। রাজার অদল-বদল জনজীবনে বিশেষত গ্রাম জীবনে বিশাল কিছু পরিবর্তন ঘটাত না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ চার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এবং বাংলা লুণ্ঠন

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিল। তারা প্রথমে সুরাট, মাদ্রাজ (বর্তমানে চেন্নাই), বোম্বাই (বর্তমানে মোম্বাই) তে কুঠি স্থাপন করে। ঢাকা শহরে কুঠি স্থাপন করে ১৬৬৮ সালে এবং কোলকাতায় কোম্পানীর কাজ শুরু হয় ১৬৯৮ সাল থেকে।

সেই যুগে ইংরেজ ছাড়াও পর্তুগীজ, ওলন্দাজ (ডাচ) ও ফরাসি কোম্পানীও ভারতে ব্যবসা করতো। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো ভারত থেকে গন্ধক, নীল ও অন্যান্য মশলা ইউরোপে নিয়ে বিক্রি করতো। ঢাকার মসলিন ও মুর্শীদাবাদের সিল্কেরও কদর ছিল ইউরোপে।

বাণিজ্যের জন্য নদীপথে বা স্থলপথে আনা নেয়ার সময় ভারতের সম্রাটকে আভ্যন্তরীণ শুল্ক দিতে হতো। সম্রাট শাহ জাহানের আমলে বৃটিশ কোম্পানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিল। এর ফলে ইংরেজ বণিকরা অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক, এমনকি দেশীয় বণিকদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ইংরেজ বণিকরা যে কেবল এই সুবিধা পেত তাই-ই নয়। কোম্পানীর কর্মচারীরাও রাজা ফরমান দেখিয়ে বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতো। এটা ছিল দুর্নীতি। দুর্নীতি ছাড়াও তারা বলপূর্বক কম দামে জিনিস ক্রয় করত এবং দস্যুবৃত্তি করতো। এই কারণে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দোলাহ'র সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারই পরিণতিতে পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন ১৭৫৭ সাল)। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মির জাফর ষড়যন্ত্র করে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে আরও লিপ্ত ছিল জগৎসেঠ, রায়বল্লভ প্রমুখ বিত্তশালী ও প্রভাশালী ব্যক্তিরা।

BanglaBook.org

এবং তারই ফলশ্রুতিতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ও ইংরেজের জয় হয়। এই ভাবেই এক অন্ধকারময় পরাধীনতার যুগের সূচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে' পরিণত হয়েছিল।

প্রথমে ইংরেজরা সরাসরি শাসনভার না নিয়ে পুতুল শাসক বসায়। মির জাফর, মির কাশিম ও পরে আবার মির জাফরকে ক্ষমতায় বসায়। এক পর্যায় তাদের বসানো মির কাসিমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তার কারণ মির কাসিম দেখলেন যে, ইংরেজ বণিকরা এককভাবে আভ্যন্তরীণ শুল্ক মওকুফের সুবিধা পাওয়ায় দেশীয় বণিকরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই তিনি দেশীয় বণিকদের উপর থেকে সকল ধরনের শুল্ক ও কর দুই বৎসরের জন্য রহিত করলেন। এতে ইংরেজরা ক্ষেপে উঠল। তারা মির কাসিমকে সরিয়ে আবার মির জাফরকে মসনদে বসায়। বস্তুত তখন বাংলার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানীর হাতে এসে গিয়েছিল। ইতোপূর্বে বাংলার নবাব কার্যত স্বাধীন হলেও দিল্লীর মোগল বাদশাকে নামকেওয়াস্তে কর দিত বা অধীনতা মেনে নিত।

১৭৬০ সালে কোম্পানী বর্ধমান ও মেদিনীপুরের এবং পরে সমগ্র বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভার পেল। কিছুকাল বাংলায় দ্বৈত শাসন ছিল। রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এবং শাসনের দায়িত্ব নবাবের। আরও পরে পুরো শাসন ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে ন্যাস্ত হয়। বাংলার তথা ইংরেজ অধিকৃত সমস্ত ভারতের রাজধানী হয়েছিল কোলকাতা।

বস্তুত ১৭৫৭ সাল থেকে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শুরু হয়েছিল যা একশত বৎসর চলেছিল। ১৮৫৭ সালে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহের পরে সরাসরি বৃটিশ সরকারের দখলে আসে সমগ্র ভারতবর্ষ, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলেছিল। তার মানে আমরা প্রায় দুইশত বৎসর (১৯০ বছর) ইংরেজের দখলে ছিলাম। যার প্রথম একশত বৎসর ছিলাম ইংরেজদের এক বাণিজ্যিক কোম্পানীর প্রজা। এটা নিতান্তই লজ্জার কথা।

১৭৫৭ সালে ইংরেজ শাসন প্রথমে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলেও কালক্রমে প্রায় সমগ্র ভারত ইংরেজদের দখলে আসে।

BanglaBook.org

ইংরেজ শাসন বা কোম্পানীর শাসনের প্রথম যুগটি ছিল বেপরোয়া লুণ্ঠনের যুগ। নবাবী আমলে জনগণের জীবনে যে খুব সুখ সমৃদ্ধি ছিল এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ তখন ছিল নিষ্ঠুর সামন্ত শোষণের যুগ। কিন্তু ইংরেজদের দখলদারিত্বের আমলে জনগণের অর্থনৈতিক জীবন আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পাবার পর ইংরেজ শাসকরা রাজস্বের পরিমাণ দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি তাঁতিদের বাধ্য করতো বাজার দর থেতে ২৫ শতাংশ এমনকি ৪০ শতাংশ কম হারে কোম্পানীর কাছে বিক্রি করতে। ফলে তাঁতশিল্প ধ্বংসে পরিণত হয়। সমৃদ্ধশালী নগরগুলো জনশূন্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি রাজস্বের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সব মিলিয়ে বাংলায় দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যাকে বলা হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০-১৭৭১ সাল)। মাত্র নয় মাসের মধ্যে বাংলার তিন কোটি জনগণের মধ্যে এক কোটি না খেয়ে মারা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে মন্বন্তর যখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তখনও কোম্পানীর রাজস্ব আদায় ছিল আগের বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি। এবং তার পরের বৎসর খাজনা আদায় হয়েছিল আরও ১৩ লক্ষ টাকা বেশি। (টাকার পরিমাণটি সেই সময়ের মুদ্রামান বিবেচনায় রেখে হিসেব করতে হবে।)

খাজনার ভয়ে কৃষকরা পালিয়ে গেলে এমনকি মারা গেলে বাকি গ্রামবাসীর কাছ থেকেও কর আদায় করা হতো। যাকে বলা হয় 'নাজাই কর'।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার ইতিহাসে তিনটি বড়ো দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। প্রথমটি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ইংরেজ শাসনের একেবারে শুরুর দিকে (যে সম্পর্কে এখনই উল্লেখ করা হলো)। দ্বিতীয়টি ইংরেজ শাসনের একেবারে শেষ জামানায় ১৯৪৩ সালে যাকে বলা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেই সময় অবিভক্ত বাংলায় ৩৫ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছিল। এটিও ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। যুদ্ধের কারণে চাল সংরক্ষণ ও পোড়া মাটি নীতি কার্যকর করতে গিয়ে বৃটিশ শাসকরা তদানিন্তন মুসলিম লীগ সরকারের (নাজিমউদ্দিন-সোহরাওয়ার্দী) সহযোগিতায় এই দুর্ভিক্ষটি সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয়টি ছিল ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। এটি হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে (পশ্চিম বঙ্গ অন্তর্ভুক্ত নয়)। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে এটিও ছিল মনুষ্য সৃষ্ট যার জন্য তদানিন্তন সরকারের নীতিই দায়ী। সেই দুর্ভিক্ষে মারা

BanglaBook.org

গিয়েছিল পাঁচ লক্ষ মানুষ। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষের বছরে কিন্তু ধান উৎপাদন হয়েছিল তার আগের বৎসরের চেয়ে বেশি। তার মানে সরকারের দুর্নীতি, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মজুতদার ও মুনাফাখোরদের কারসাজি এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী।

ফিরে আসি সেই বৃটিশ আমলের প্রথম যুগে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)

আমার বিবেচনায় কোম্পানীর শাসনের একশত বৎসরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো দুইটি। এক, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ সাল)। দুই, শাসনকার্যে ইংরেজি ভাষার প্রচলন এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রবর্তন (১৮৩৫ সাল)। পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে কি প্রভাব পড়েছিল তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। এখন প্রথমটি অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনে কী তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, তা দেখা যাক।

মোগল আমলে জমিদাররা ছিল রাজস্ব সংগ্রহকারক, জমির মালিক নয়। জমির আসল মালিক রাজা বা বাদশা। তবে জমিদাররা সংগৃহীত রাজস্বের অংশ পেত। এই রাজস্ব আদায়কারী জমিদারও কিন্তু ছিল বংশানুক্রমিক। অন্যদিকে যে কৃষক জমি চাষ করতো তার ছিল জমির উপর দখলিস্বত্ব অর্থাৎ এক প্রকার অধিকার।

কোম্পানীর শাসনকর্তা লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সামন্ত ব্যবস্থার নতুন রূপ প্রদান করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা অনেকটা ইউরোপীয় ধরনের জমিদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা কিছু লোককে নির্দিষ্ট এলাকার জমিদার বানানো হলো। সেই এলাকার অন্যান্য মানুষ কৃষক হলো প্রজা। তারা হারালো জমির উপর অধিকার। জমিদার রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট অঙ্কে খাজনা দেবার পরিবর্তে সমগ্র জমিদারিতে কৃষকের উপর ইচ্ছেমত খাজনা আদায় করতে পারতো, খুশিমতো বিভিন্ন কর বসাতে পারতো, এমনকি নিজস্ব কয়েদখানায় রেখে নির্যাতন করতে পারত। কৃষক-প্রজারা যেন অর্ধ দাসে পরিণত হলো। সমগ্র বৃটিশ আমলেই এই জমিদারী ব্যবস্থা ছিল, যদিও বহু কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার হয়েছিল পরবর্তী সময়ে।

BanglaBook.org

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একদিকে নির্দিষ্ট অঙ্কের খাজনা নিশ্চিত করা, অন্যদিকে (এবং রাজনৈতিকভাবে সেটাই প্রধান) বৃটিশ অনুগত একদল সামন্ত শ্রেণী তৈরি করা।

কার্ল মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে সেই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,

"ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে কেবল দেখা যায়, সে দেশের আর্থব্যবস্থায় অনেকগুলো ব্যর্থ ও কুখ্যাত পরীক্ষা হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি করেছে বিলাতি ধরনের বড়ো আকারের জমিদারীর নিকৃষ্ট উদাহরণ।"

তবে জমিদাররা বৃটিশ ভক্ত ছিল। জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক (শাসনকাল : ১৮২৮-১৮৩৫) এক সরকারি বক্তৃতায় খোলাখুলি বলেছিলেন: "গণ বিক্ষোভ বা গণ বিপ্লব থেকে নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই বন্দোবস্ত অন্যান্য অনেক দিক থেকে এবং অনেক মূল বিষয়ে নিরর্থক হলেও বৃটিশ আধিপত্যের উপর নির্ভরশীল এক ধনী জমিদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে।"

এই নতুন জমিদাররা কিন্তু মোগল আমলের জমিদার নয়। যারা কোম্পানীকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল কোম্পানী তাদেরকেই জমিদার বানিয়েছিল। তারা বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারী ভোগ করবে। ফলে মোগল আমলের জমিদার যারা প্রধানত ছিল মুসলমান, তারা হঠাৎ করেই বিত্ত ও ক্ষমতা হারালো। অন্যদিকে বাংলার নতুন জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

জমিদারদের নিচে থাকতো কয়েকধাপ সামন্ত শ্রেণী যথা পত্তনিদার, গতিদার, তালুকদার ইত্যাদি। যারা তাদের উপরের সামন্তকে খাজনা দিত এবং নিচের স্তরের সামন্তের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। সবার তলে ছিল কৃষক, যারা ছিল শ্রমজীবী। জমিদার ও অন্যান্য সামন্তশ্রেণী ছাড়াও অর্থাৎ ক্ষুদে জমিদার ছাড়াও ছিল নায়েব ও অন্যান্য কর্মচারি– যারা সামন্ত ব্যবস্থারই অংশ। আরও ছিল মহাজন শ্রেণী যারা সামন্ত ব্যবস্থারই অন্তর্ভুক্ত।

জমিদারদের একমাত্র কাজ ছিল বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারকে দেয় খাজনা পরিশোধ করা। অনেক জমিদার এতই অপদার্থ ছিল যে সম্পূর্ণ জমিদারীর ভার নায়েবের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবল আনন্দ-

BanglaBook.org

ফুর্তি ও বিলাসিতায় মেতে থাকতো। তাদের অনেকে রাষ্ট্রকে দেয় খাজনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হয়ে জমিদারী হারিয়েছিল। তাদের জমিদারী নিলামে উঠত। এইভাবে জমিদারী কেনাবেচা শুরু হয়েছিল। যা মোগল যুগে ছিল না। এইভাবে দেখা যায় লর্ড কর্নওয়ালিস যাদের জমিদার বানিয়েছিলেন, পরবর্তীতে অনেকেই আর জমিদার থাকেনি। নতুন জমিদার সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর তেমনই জমিদারী ক্রয় করে জমিদার হয়েছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমির কেনাবেচাও শুরু হয়েছিল যা মোগল আমলে ছিল না। ইংরেজ আমলেই জমি পণ্যে পরিণত হয়েছিল।

ইংরেজরা নগদ টাকায় রাজস্বের ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। ইতোপূর্বে কৃষকরা নগদ টাকায় লেনদেন খুবই কম করত এবং নগদ টাকায় রাজস্ব দানে অনভ্যস্থ ছিল। মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য এখন তারা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিতে শুরু করল। অধিকাংশ সময় তারা জমি বন্ধক রেখে ঋণ নিত। ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ইংরেজ প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী আদালত বন্ধককৃত জমি মহাজনদেরই হাতে অর্পণ করত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনের পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইংল্যান্ডে শিল্প বুর্জোয়া ক্ষমতাশীল হয়ে উঠল তখন কুটির শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত করা হলো বাংলার গ্রামগুলোকে। সেই পণ্য ক্রয়ের জন্য মুদ্রার সঞ্চয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কৃষকরা তাই বেশি বেশি করে তুলা, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি উৎপাদন করতে শুরু করে। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী দালালের উদ্ভব হলো যারা এই সকল বাণিজ্যিক ফসল বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এমনকি ভারতের বাইরেও রপ্তানী করত। এইভাবে বাংলার কৃষক বিশ্ব বাজারের সঙ্গেও সম্পর্কিত হয়ে পড়ল।

মোটকথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছিল তা একটা নতুন অবস্থা তৈরি করেছিল। কৃষকরা তিন শ্রেণীর দ্বারা শোষিত হচ্ছিল– জমিদার, মহাজন ও দালাল ব্যবসায়ী। একদিকে গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রবেশ, অন্যদিকে জমিদার মহাজনদের অত্যাচারে কৃষকের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছিল। জমিদাররা শুধু যে নির্দিষ্ট অঙ্কের খাজনা আদায় করত তাই-ই নয়, নানা অজুহাতে তারা নানা ধরণের নজরানা বা বেআইনী খাজনাও আদায় করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় যে পরিমাণ খাজনা কৃষকরা জমিদারকে দিত ক্রমান্বয়ে তা বাড়তে থাকে।

BanglaBook.org

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষককে একেবারে নিঃস্ব করেছিল। জমিদার বিরোধী আন্দোলন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বড়ো রাজনৈতিক ঘটনা।

জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকরা বারবার বিদ্রোহ করেছেন। নরহরি কবিরাজের লেখা 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা' গ্রন্থে এই রকম ছোটো বড়ো স্বতঃস্ফুর্ত বিদ্রোহের বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে, সেখান থেকে দু'টি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। (তিনি অভয় চন্দ্র দাস-এর লেখা 'The Indian Ryot' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।)

"একজন রায়ত তাঁর জবানবন্দীতে বলছেন– 'আমাদের আগের জমিদার মারা গেলেন। তাঁর ছেলে, ইনি কিছুটা ইংরেজি জানতেন এবং মদ খেতেন, জমিদার হলেন। তাঁর বাবার আমলে যে খাজনা ধার্য ছিল তিনি তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি আমাদের খাজনা যা ছিল তার দেড়গুণ ধার্য করলেন, তাছাড়া বেআইনী করও পূর্বের মত ধার্য রইল। গ্রামে হাঙ্গামা দেখা দিল। রায়তেরা আমীনদের আক্রমণ করল। কর্তৃপক্ষ খবর পেল; ৪০ জন বরকন্দাজ হাতীর পিঠে চড়ে এসে উপস্থিত হলো। তারা গ্রামের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিল, গ্রামের সকলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করল, প্রধান প্রধান কৃষক নেতাদের জমিদারের কাছারীতে আটক করে রাখা হলো'।

আর একটি হাঙ্গামার কাহিনি নিম্নরূপ– 'একটি গামে জমিদারীর হাত বদল হলো। নতুন জমিদার খাজনার হার বাড়িয়ে দিল। কিন্তু গ্রামের মোড়ল প্রতিবাদ করল এবং চাষীরা তার পাশে এসে দাঁড়াল। জমিদারের লোকেরা মোড়লকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। মোড়লের সাথীরা চট করে এগিয়ে গিয়ে বন্দুক ছিনিয়ে নিল এবং জমিদারের লোকদের উপর চড়াও হলো। তখন জমিদারের লোকেরা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল'।"

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-'৭৩)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জমিদার বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপক আকার লাভ করেছিল পাবনা জেলায়। সেখানে খাজনা ও বেআইনী কর বৃদ্ধি করা হয়েছিল অস্বাভাবিকরূপে। তাছাড়াও কৃষকদের ঠকানোর জন্য তারা জোর করে বর্ধিত খাজনা দেবে এই মর্মে কৃষকদের কাছ থেকে জমিদাররা কবুলিয়ত সই করিয়ে নিত। তাতে জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করার অধিকার জমিদারের থাকবে বলেও লিখিত থাকত। খাজনা বৃদ্ধির

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা হয়েছিল। এই সকল মামলার রায় কৃষকদের বিরুদ্ধেই যেত। তবে একটি ব্যতিক্রমী মামলায় জমিদার কর্তৃক আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক করে ডিক্রি করা হয়। এটা ১৮৭২-'৭৩ সালে দিকের ঘটনা। কৃষকদের কাছ থেকে যে কুবুলিয়ত জোর করে আদায় করা হয়েছিল সেগুলো তারা আগুনে নিক্ষেপ করে।

জনৈক ঈশান রায় এই কৃষক বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের কৃষকরাই এই নেতার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। ঈশান রায়কে তারা বলতেন বিদ্রোহী রাজা। পাবনা বগুড়া ও আশেপাশের অঞ্চলেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরে। বিভিন্ন জায়গায় কৃষকরা বিদ্রোহী সমিতিও গঠন করেছিলেন। জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের এই সংগ্রামকে তারা ধর্মঘট বলে অভিহিত করতেন।

সমসাময়িক দেশীয় পত্রিকাগুলো কৃষকদের সংঘশক্তির প্রশংসা করেছিল। পাবনার এই বিদ্রোহের পরপরই মীর মশাররফ হোসেন লিখেছিলেন তার বিখ্যাত নাটক 'জমিদার দর্পণ'। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাবনার কৃষক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং মীর মশাররফ হোসেনের লেখা 'জমিদার দর্পণ'টি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।

সেই যুগের অন্যান্য শ্রেণী

সেই যুগে জমিদার ও বিভিন্ন ধাপে সামন্ত শ্রেণী একদিকে এবং কৃষক হলো তার বিপরীত দিকে। প্রধান শোষক ও শোষিত শ্রেণী। এ ছাড়াও ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে ছিল প্রধানত চাকরিজীবী, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসার ফলে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব ঘটে প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। তারা বাংলা সাহিত্যের প্রভূত বিকাশ সাধন করেন এবং হিন্দুদের মধ্যে সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর হাত দিয়েই আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী ছিল। তারা হলো মুৎসুদ্দি শ্রেণী। কোলকাতায় বসবাসকারী জমিদার ও মুৎসুদ্দি শ্রেণী এই দুইটি অর্থবান শ্রেণী এক নতুন ধরণের নোংরা সংস্কৃতি তৈরি করেছিল যাকে বলা হয় বাবু

BanglaBook.org

কালচার। পতিতালয়ে গমন, বাইজি নাচ, মোরগ লড়াই ও অন্যান্য কুৎসিত আমোদ ফুর্তিই ছিল বাবু কালচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মোগল আমলের শেষ দিকে স্বাধীন দেশীয় বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই স্বাধীন অর্থবান শ্রেণীটি আর থাকলো না। তারপর রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো কয়েকজন উদ্যোগী পুরুষ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করা, জাহাজ কোম্পানী করা, চা বাগান করা, খনি সম্পদ ক্রয় করা ইত্যাদি দিকে উদ্যোগকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। বস্তুত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠেছিল আরও পরে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং তাও হিন্দু বা মুসলমান বাঙালির মধ্যে তেমন ব্যবসায়ীর উদ্ভব ঘটেনি।

জনৈক লেখক কিশোর চাঁদ মিত্র লিখেছেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের আগে অর্থবান নেটিভদের ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজ ফার্মের বেনিয়ান হবার সৌভাগ্য অর্জন করা, বিলাতি কুঠির মহাজন হওয়া অথবা মুৎসুদ্দি হয়ে ঐসব কুঠির হুকুম তামিল করা এবং দস্তুরি পাওয়া– এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই সময় বাঙালি অর্থবানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।"

ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরি হওয়ার আগেই বাংলায় এবং ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির সময়ে যারা রেলওয়ে, খনি, পাটকল (মূলত কোলকাতার কাছে), জাহাজ পরিবহন ও আসামের চা বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। তবে এই শ্রেণীটির সংখ্যা তখনও পর্যন্ত ছিল খুবই নগণ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশি ছিল না।

বৃটিশ শাসনের তাৎক্ষণিক ফলাফল

১. পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা কার্যত পরাধীন হয়েছিল, যদিও তখনো নামকে ওয়াস্তে দিল্লীর বাদশাহকে সম্রাট বলে স্বীকার করে নেওয়া হতো। অল্প দিনের মধ্যেই বাংলার শাসনভার পুরোপুরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চলে আসে। ধীরে ধীরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সারা ভারতই দখল করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরাসরি বৃটিশ রানির শাসনাধীন হয়েছিল। বাংলা তথা ভারত বহু শতাব্দী আগে থেকেই বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। পাল আমল বাদ দিলে বাংলার শাসকরা বিদেশি ছিলেন। আর্য থেকে শুরু

BanglaBook.org

করে তুর্কি, পাঠান, মোগল যারাই ভারতবর্ষে এসেছিল এবং শাসন করেছিলেন তারা ভারতীয়ই হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজদের মতো এইদেশকে কলোনী বানাননি। তাই সিরজুদ্দৌলা প্রমুখ অবাঙালি হলেও বাংলাকে তখনো পর্যন্ত স্বাধীন বলেই ধরে নিতে হবে। ইংরেজ শাসনের প্রথম ফলাফল হলো এই যে আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীন দেশে পরিণত হলাম।

২. ইংরেজ শাসন ছিল খুবই বর্বর ও নিষ্ঠুর। এর আগের দেশীয় শাসকরাও নিষ্ঠুর ছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা যে ধরনের নিষ্ঠুরতা ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছিল তার সঙ্গে অতীতের কোনো যুগকে তুলনা করা চলে না। পলাসীর যুদ্ধের অল্পদিন পরেই যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যাতে বাংলা দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ না খেয়ে মারা যায়, তা ছিল সরাসরি ইংরেজ শাসনেরই প্রত্যক্ষ ফল।

৩. ইংরেজ শাসনের প্রথমার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারত থেকে পণ্য ইউরোপে রপ্তানী করত যদিও ভারতের পণ্য উৎপাদনকারীকে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করত। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির দিকে ভারত ইংল্যান্ডের বাজারে পরিণত হলো। এই পর্যায়ে বাংলা তথা ভারতের কুটির শিল্পের ধ্বংস সাধন করা হয়। এমনকি দক্ষ তাঁতীদের আঙ্গুল পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়। তবে ইংরেজ শাসনের ফলেই বাংলা তথা ভারতের গ্রাম বিশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়ায় বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ অল্পে তুষ্ট বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সমাজ ভেঙে যায়। বাংলার গ্রামীণ সমাজের এই পরিবর্তনকে মার্কস বিপ্লবের মতোই ঘটনা বলে অভিহিত করেছিলেন, "যে বিপ্লব সাধনে বৃটিশ শাসন ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"

৪. ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

৫. বৃটিশ শাসনের ফলে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির প্রবর্তন হয়েছিল। যদিও বৃটিশ শাসকরা নিজেদের বাণিজ্য ও প্রশাসনিক সুবিধার্থেই এগুলো করেছিল তবু একে উন্নয়নের ইতিবাচক দিক হিসেবেই ধরতে হবে।

৬. বৃটিশ শাসক নিজেদের স্বার্থেই, কম খরচে প্রশাসনিক ব্যয়ভার কমানোর প্রয়োজনে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করে। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষ পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে

BanglaBook.org

আসে এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তারা সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য রচনায় মনযোগী হয়েছিলেন। এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে এক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিদের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল তার গুরুত্ব কম নয়। সতীদাহ প্রথা উঠে যায় এবং হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের আইন তৈরি হয়েছিল।

৭. বৃটিশ আগমনের ফলে কয়েকটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পুরাতন তাঁতী ও কুটির শিল্পী শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে তৈরি হয়েছিল জমিদার, মহাজন ও মুৎসুদ্দি শ্রেণী। কিছু পরে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির দিকে শ্রমিক শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটেছিল।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ পাঁচ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিভিন্ন পর্যায়

পলাশীর যুদ্ধ থেকেই আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে বাংলা দখল করে, পরে ক্রমে ক্রমে সারা ভারত দখল করেছিল। ১৭৫৭ এর পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯৪৭ এর ভারতের স্বাধীনতা লাভ– এই সময়কালকে যদি ইংরেজের রাজত্বকাল ধরি, তাহলে সেটা হবে ১৯০ বৎসর। (১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চলে গেলেও আমরা অরেক ধরনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিলাম। পাকিস্তানের এক ধরনের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।) আমরা এখানে বৃটিশ যুগের কথাই আলোচনা করছি। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ এই একশত বৎসর আমরা ছিলাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীন। ভাবতে অবাক লাগে যে, আমাদের শাসক ছিল একটি বাণিজ্যিক কোম্পানী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ সাল থেকেই শাসকে পরিণত হয়েছিল। যদিও নামে অন্য কেউ যথা মির জাফর, মির কাশিম প্রমুখ নবাব হয়েছিল। তাদের নবাব বানিয়েছিল কোম্পানী। ১৭৬৫ সালে তারা সর্বপ্রথম দিল্লীর বাদশাকে কিছু রাজস্ব প্রদানের পরিবর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজত্ব দখল করে।

১৮৫৭ সাল থেকে আমরা সরাসরি বৃটিশ রাজার কলোনীতে পরিণত হলাম। ১৮৫৭ সালেও মহান সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত দিল্লীর লাল কেল্লায় বাস করতেন মোগল শাসকদের বংশধর। নামে সম্রাট হলেও তার শাসন ক্ষমতা দিল্লী শহর পর্যন্তও ছিল না। তবু নামকেওয়াস্তে তিনি ছিলেন দিল্লীর বাদশা। দিল্লীর শেষ স্বাধীন বাদশাহর নাম বাহাদুর শাহ। ১৮৫৭

BanglaBook.org

সালে সিপাহী অভ্যুত্থান বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ পরাজিত হলে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। স্বাধীন ভারতের প্রতীক চিহ্নটুকুও মুছে গিয়েছিল।

যাই হোক আমরা আলোচনার সুবিধার্থে বৃটিশ রাজত্বকালকে অখন্ড ১৯০ বৎসর ধরেই আলোচনায় অগ্রসর হব। প্রায় দুইশত বৎসর ধরে বৃটিশরা আমাদের নির্মমভাবে শোষণ করেছে, যা ছিল খুবই বর্বর ও নিষ্ঠুর। তবে অর্থনৈতিক শোষণের রূপ একেক যুগে একেক রকম ছিল। শাসক ইংরেজরা ছিল পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে অন্যান্য যারা বাইরে থেকে আক্রমণ করেছিল, তাদের সঙ্গে ইংরেজদের এটা ছিল মৌলিক পার্থক্যের বিষয়।

ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রক্ষমতায় যে বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল এই দুইশ বৎসরে তাদেরও অনেক পরিবর্তন হয়। প্রথমে ছিল বাণিজ্য পুঁজির যুগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যারা ভারত ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে দ্রব্য ক্রয় করে ইউরোপে বিক্রি করত। বাণিজ্য পুঁজির যুগেই তারা ভারতকে কলোনী বানিয়েছিল। এই সময়কালেই আদিম পুঁজির সঞ্চয় হয়েছিল। ১৭৫৭ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ছিল বাণিজ্য পুঁজির যুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃটেন শিল্প পুঁজির যুগে প্রবেশ করে। তখনও ভারত বৃটিশের দখলে ছিল। এই সময় বৃটেনে শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং এক শ্রেণীর শিল্প-কলকারখানার মালিকের অভ্যুদয় ঘটে, যারা কার্যত বৃটেনের শাসন ক্ষমতা দখল করে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতকে তাদের শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিণত করা। অতএব সেই যুগের শোষণ পদ্ধতিও আগের চেয়ে ভিন্ন হবে। আরও পরে ইংল্যান্ডে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ হয় যখন শিল্প ও ব্যাংক পুঁজির একত্রীকরণ ও একচেটিয়াত্বের উদ্ভব ঘটে। এই সময় বৃটেন কলোনীতে পুঁজি পাচারও করে অধিকতর মুনাফার জন্য। এই তৃতীয় স্তরটিকে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। কালপর্ব হিসেবে ভাগ করলে আমরা বলতে পারি ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাণিজ্য পুঁজির যুগ এবং ভারতবর্ষ বাণিজ্য পুঁজির কলোনী ছিল। ১৮৫৭ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি ভারতবর্ষ বৃটেনের শিল্পপুঁজির কলোনী ছিল। পরবর্তীতে ১৯৪৭

BanglaBook.org

সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কলোনী ছিল। এবার আমরা দেখব কোন যুগে শোষণের ধরণ কেমন ছিল।

বাণিজ্য পুঁজির যুগ

বাণিজ্য পুঁজির যুগেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তারা ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার লাভ করেছিল। অবশ্য ভারতে ইউরোপের অন্যান্য দেশের এই ধরনের কোম্পানী ব্যবসা করত। ফরাসি, ওলন্দাজ (নেদারল্যান্ডস) ও পর্তুগীজ। এর মধ্যে ইংরেজরাই অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেশ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। ফরাসি ও পর্তুগিজদের দখলেও ছিটেফোটা কলোনী ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল সস্তায় ভারতীয় পণ্য ক্রয় করে ইউরোপে বিক্রি করা। রাজত্ব লাভের পর তাদের প্রচেষ্টা ছিল কত সস্তায় বংলা তথা ভারত থেকে এই দেশের শিল্পজাত পণ্য যথা মসলিন কাপড়, সিল্ক কাপড়, সুতি কাপড় ও অন্যান্য জিনিস কেনা যায়। এই পর্যায়ে তাদের শোষণের ধরণটি ছিল জোরজবরদস্তি করে বাঙালি তাঁতিদের কাছ থেকে নগণ্য দামে জিনিস ক্রয় করা। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অতিরিক্ত খাজনা আদায় করা। শোষণের পদ্ধতিটা ছিল খুবই বর্বর। এটাই ছিল বৃটিশ পুঁজির জন্য আদিম সঞ্চয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের লুণ্ঠনের কারণেই দেখা দিয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)।

বাণিজ্য পুঁজির যুগের উপনিবেশের ও লুণ্ঠনের ধারাটিকে বিশ্ব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, "পুরানো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা"।

শিল্প পুঁজির যুগের কলোনী

ভারত থেকে লুণ্ঠিত অর্থ সম্পদ দিয়েই ইংল্যান্ডে পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে। ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটার ক্ষেত্রে ভারতের অবদান ছিল অনেক। ভারত ও অন্যান্য কলোনীর লুণ্ঠন, আফ্রিকা থেকে মানুষ শিকার ও দাস ব্যবসা এবং আমেরিকা মহাদেশ লুণ্ঠন– এইভাবে বৃটিশ শিল্প পুঁজির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। এখন বৃটিশ শিল্পের মালিকরা বিশেষ করে কাপড় ও সুতাকলের মালিকরা আর ভারত থেকে কাপড় আমদানিতে আগ্রহী নয়, বরং তারা ভারতের শিল্পকে ধ্বংস করে তাদের মিল কলকারখানার বাজার করতে চেয়েছিল। শিল্প পুঁজির সঙ্গে আগের বাণিজ্য পুঁজির দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল

BanglaBook.org

ইংল্যান্ডে। তার প্রতিফলনে দেখা যায়, ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে, কোম্পানীর দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়েছিল। বার্ক প্রমুখ রাজনীতিবিদ কোম্পানীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন। কোম্পানীর লুণ্ঠন ব্যবস্থার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক ছিলেন পুঁজিতন্ত্রের তাত্ত্বিক অ্যাডাম স্মিথ। তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসারও বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার সনদ উঠে গেল। কিন্তু কোম্পানীর শাসন অব্যাহত ছিল সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত (১৮৫৭)।

শিল্প পুঁজির যুগে আরম্ভ হলো শোষণের আরেক ধরণ। আগে বৃটিশ বণিকরা ভারত থেকে কাপড় কিনত এবং ইউরোপে বিক্রি করত। এখন হলো উল্টো ব্যবস্থা। বৃটিশ কারখানায় তৈরি কাপড় ভারতে বিক্রি করতে হবে। আগে ভারত 'পৃথিবীর কারখানা' রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এখন ভারত ক্রমান্বয়ে শুধুই কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হলো। পরিকল্পিতভাবে ভারতের তাঁত ও অন্যান্য শিল্প ধ্বংস করা হলো। অন্যদিকে ইংল্যান্ড হয়ে উঠলো 'পৃথিবীর কারখানা'।

বাণিজ্যপুঁজির যুগে ভারত থেকে বৃটেনে কাপড় যেত। এই যুগে তা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। নিচের পরিসংখ্যান থেকেই বিষয়টি বোঝা যাবে। ভারত থেকে বৃটেনে রপ্তানিকৃত কাপড়ের টুকরো–

১৮১৪ সাল– ১২ লক্ষ

১৮৩৫ সাল– ৩ লক্ষ

১৮৪৪ সাল– ৬৩ হাজার

অন্যদিকে বৃটেনের কাপড়ের মিলে তৈরি কাপড় ভারতে আমদানি হয়েছিল:

১৮১৪ সালে– ১০ লক্ষ গজ

১৮৩৫ সালে– ৫১০ লক্ষ গজ

বৃটেনের সুতোকলে তৈরি সুতো বৃটেন থেকে ভারতে আমদানির পরিমান এই সময়ে (১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৬ সাল) বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫২০০ গুণ।

এইভাবে বৃটেন হলো শিল্পজাত পণ্যের (কাপড় অথবা সুতো) উৎপাদনকারী এবং ভারত তার বাজার। অন্যদিকে ভারত হয়ে উঠল কাচামালের সরবরাহকারী। যেমন বৃটেনের সুতোকল ও কাপড়ের মিলের

BanglaBook.org

জন্য ভারত থেকে বৃটেনে তুলা রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেল। নিচের পরিসংখ্যান থেকেও তা বোঝা যাবে।

ভারত থেকে বৃটেনে তুলা রপ্তানির পরিমাণ–

১৮১৩ সালে– ৯০ লক্ষ পাউন্ড (ওজনে)

১৮৪৪ সালে– ৮৮০ লক্ষ পাউন্ড (ওজনে)

১৯১৪ সালে– ১৬৩০ লক্ষ পাউন্ড (ওজনে)

পশমের জন্য কাচামাল ভারত থেকে বৃটেনে রপ্তানির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৩৩ সালে যা ছিল ৪০০০ (চার হাজার) পাউন্ড (ওজনে) তা ১৮৪৪ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ পাউন্ডে (ওজনে)।

ভারত থেকে খাদ্য শস্যের রপ্তানি (বৃটেনে) ঠিক একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮৪৯ সালে ছিল ৮ লক্ষ পাউন্ড (মুদ্রায়)

১৮৭০ সালে ছিল ৭৯ লক্ষ পাউন্ড (মুদ্রায়)

১৯১৪ সালে ছিল ১৯৩ লক্ষ পাউন্ড (মুদ্রায়)

এমনিতেই আধুনিক যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত কাপড় সুতো ইত্যাদি পণ্যের দাম সস্তা হবে এবং তার সঙ্গে তাঁত ইত্যাদি কুটির শিল্প টিকে থাকতে পারে না। পারেওনি। উপরন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার নিশ্চিত করতে তাঁতীদের আঙ্গুল কেটে দিয়েছিল। বিশেষ করে ঢাকার মসলিন কাপড় উৎপাদনকারীদের। অতএব শিল্পপুঁজির যুগেও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও অত্যাচার একইভাবে বর্বর রয়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও বৃটিশ সরকারের শুল্কনীতি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে বৃটিশ শিল্পপতিদের জন্য সহায়ক হয়। যথা, ১৮৩৬ সালে বাংলায়, ১৮৩৮ সালে বোম্বাই(বর্তমানে মহারাষ্ট্র) এবং ১৮৪৪ সালে মাদ্রাজে (বর্তমানে তামিলনাড়ু) উৎপন্ন কাঁচা তুলা ইংল্যান্ডে রপ্তানির জন্য যে শুল্ক ছিল তা রহিত করা হয়েছিল।

এই কালপর্বে ভারতে নীল চাষ প্রবর্তন করে ইংরেজ বণিকরা যা ইংল্যান্ডের কাপড় শিল্পের জন্য প্রয়োজন ছিল। ১৮৩১ সালে শুধু বাংলাতেই ৩০০ থেকে ৪০০ নীলকুঠি ছিল যার মালিক ছিল ইংরেজরা। নীলকুঠিতে যেসব ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ ছিল তাদের অত্যাচার ছিল নির্মম ও বর্বর। তারা কৃষকদের নীলচাষ করতে বাধ্য করত এবং দাম কম দিত। তাছাড়া দৈহিক অত্যাচারও যুক্ত ছিল। নীলকুঠির ইংরেজ মালিকদের অত্যাচারের উপর

BanglaBook.org

ভিত্তি করে দীনবন্ধু মিত্র যে নাটক লিখেছিলেন "নীলদর্পণ" তা ছিল ইতিহাস বিখ্যাত। *নীলদর্পণ* নাটক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নীল চাষীদের বিদ্রোহ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ফিন্যান্স পুঁজির যুগ

ইংল্যান্ডসহ সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে এক পর্যায়ে শিল্পপুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির মিলন ঘটে এবং একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ একই পুঁজিপতি (পুঁজিপতি কোম্পানী বা পুঁজিপতি গোষ্ঠী) একই সঙ্গে হয়ে বসলো শিল্প ও ব্যাংকের মালিক। স্বল্পসংখ্যক কোম্পানী গোটা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এই যুগকেই লেনিন বলেছেন ফিন্যান্স পুঁজির যুগ এবং সেটাই হলো লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদী যুগ।

ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলোনী ছিল বাণিজ্য পুঁজি, শিল্পপুঁজি এবং ফিন্যান্স পুঁজির যুগে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের তিন যুগেই আমরা বৃটেনের কলোনী ছিলাম। ফিন্যান্স পুঁজির যুগটি শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ফিন্যান্স পুঁজির যুগের একটা বৈশিষ্ট হলো উপনিবেশ বা অনুন্নত দেশে পুঁজির রপ্তানি, কারণ তাতে অধিকতর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। কলোনীতে শ্রমশক্তি সস্তা, কাঁচামাল সস্তা ও সহজলভ্য, জমিও সস্তা। তাই এই যুগে পুঁজির রপ্তানি একটা বিশেষ বৈশিষ্ট লাভ করে। কিন্তু কলোনীতে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করুক, এটা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা চায় না। তাই ভারতীয় পুঁজির বিকাশ তারা ঠেকাতে চেয়েছিল নানাভাবে।

বৃটিশ পুঁজি এদেশে এসেছিল মুনাফা লুট করে নিতে, দেশকে শিল্পায়িত করতে নয়। এই পুঁজি লেগেছিল সরকারকে প্রদত্ত ঋণের আকারেও। রেলপথ নির্মাণ, টেলিগ্রাফ নির্মাণ, খনি ও কাঁচামাল প্রসেসিংয়ের জন্য এই পুঁজি ব্যয়িত হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে বৃটিশ সরকার যখন সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল তখন বৃটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ৭০০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেছিল। বলাই বাহুল্য এই ঋণের বোঝা আসলে চেপেছিল ভারতের জনগণের কাঁধে।

১৯১৯ সালে ভারত ও সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) নিয়োজিত বৃটিশ লগ্নি (ফিন্যান্স) পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩৬৫০ লাখ পাউন্ড। তার মধ্যে কোন

BanglaBook.org

শিল্পে বা খাতে কত ব্যয় হয়েছিল তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় স্যার জর্জ পেইস কর্তৃক প্রদত্ত চার্ট (নিম্নে প্রদত্ত) থেকে–

খাতের নাম	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ পাউন্ড)
সরকার মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত	১৮২৫
রেলওয়ে	১৩৬৫
চাষ (চা, রবার, কফি)	১৪২
ট্রামওয়ে	৪২
খনি	৩৫
ব্যাংক	৩৪
তেল	৩২
শিল্প-বাণিজ্য	২৫
অর্থ, ভূমি বিনিয়োগ	১৮
বিবিধ	৩৩

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় বৃটিশ ফিন্যান্স ক্যাপিটাল এদেশের উন্নয়নমূলক কোনো কাজে ব্যয়িত হয়নি।

(জর্জ পেইস কর্তৃক উপরোক্ত হিসাবটি সংগৃহিত হয়েছে নরহরি কবিরাজের লেখা 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা' গ্রন্থ থেকে)

দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অথবা বৃটিশ সরকার চায় নি যে, ভারতে বুর্জোয়া বিকাশ ঘটুক। তবু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতেও বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। ১৮৫১ সালে 'বোম্বাই উইভিং এ্যান্ড স্পিনিং কোম্পানী'র উদ্যোগে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় যা কাজ শুরু করে ১৮৫৫ সাল থেকে। ১৮৭২-৭৩ সালের দিকে বোম্বাইতে ১৮টি এবং বাংলায় দুইটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বুর্জোয়ারা বৃটিশ শিল্প বুর্জোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে কিনা, এই ভয়ে বৃটিশ বুর্জোয়ারা তাদের সরকারকে দিয়ে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করায়। ভারতে বিলাতি কাপড় আসার পথে যে আমদানি শুল্ক ছিল তা বাতিল করা হয় ১৮৮২ সালে।

BanglaBook.org

অন্যদিকে ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের উপর নতুন এক কর (excise duty) বসানো হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ তথা ভারতে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আগেই শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। বৃটিশরা যে রেলওয়ে স্থাপন করেছিল সেই নির্মাণ কাজে এবং পরবর্তীতে রেলওয়েতে কর্মরত শ্রমিকরাই ছিল এদেশের প্রথম শ্রমিক শ্রেণী। ১৮৬২ সালেই পরাধীন ভারতে কোলকাতার নিকটে হাওড়ার ১২০০ রেলশ্রমিক আট ঘণ্টা শ্রমদিবসের দাবিতে কয়েকদিন ধর্মঘট পর্যন্ত করেছিলেন। সেই খবর আবার ছাপা হয়েছিল "সোমপ্রকাশ" নামক পত্রিকায়, যে পত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুক্ত ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে চা বাগান, কাপড়ের মিল ও জুট মিল (চটকল) গড়ে উঠেছিল। চা বাগানগুলো ছিল প্রধানত ইউরোপীয় মালিকানাধীন। বস্ত্রশিল্পের ৯৯ শতাংশ পুঁজি ছিল ভারতীয়। আর চটকলে ইউরোপীয় কর্তৃত্বই প্রধান ছিল।

১৯০৫ সালে ভারতে মোট ফ্যাক্টরির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৬৮৮টি। শিল্পে নিয়োজিত ভারতীয় পুঁজির মধ্যে বাঙালির অংশ ছিল নগণ্য আর বাঙালি মুসলমান পুঁজিপতি কেউ ছিল না। ১৯০৫ সালে ভারতীয় পুঁজি নিয়ে গঠিত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৯ টি। ১৯০৭ সালে প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছিল– "টাটা আয়রণ এ্যান্ড স্টীল কোম্পানী"।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করেই ভারতীয় পুঁজি বিকাশ লাভ করেছিল। অন্যদিকে বাংলার তথা ভারতের শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব ছিল বৃটিশ পুঁজি ও ভারতীয় পুঁজি উভয়ের সঙ্গে। ১৯২১ সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতের শ্রমিক সংখ্যা ছিল মোট ১,৫৭,০০,০০০।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ ছয়

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের কৃষক বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই ভারতের বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ শাসন বিরোধী অসংখ্য সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রমজীবী কৃষকরাই এবং তা ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত লড়াই। এই সকল বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনকে কাঁপিয়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহগুলো বিজয়ী হতে পারেনি। তার প্রধান কারণ এই যে এই বিদ্রোহগুলো প্রধানত আঞ্চলিক ছিল এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে ইংরেজবিরোধী পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার অভাব ছিল। তবু এই মহান সংগ্রামগুলো বাংলার জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রমাণ বহন করে। অন্যদিকে বৃটিশ যুগে যে নতুন শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল তারা এই সংগ্রামগুলোকে সমর্থন তো করেনই নি বরং ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন (অবশ্যই দুই একজন ব্যতিক্রম ছিলেন)।

আমরা এখানে মহান কৃষক বিদ্রোহসমূহের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরব।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

পলাসীর যুদ্ধের মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যেই ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশ ও বিহার ব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, যা চলেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি। প্রায় চার দশক ধরে। ইংরেজদের শোষণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ গরিব গ্রামের মানুষ। এই বিদ্রোহ ইতিহাসে সন্ন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বস্তুত তা ফকির সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ ছিল না। বিদ্রোহীরা কখনও কখনও ফকির সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে জনসাধারণের মধ্যে মিশে থাকতেন।

BanglaBook.org

সম্ভবত এই কারণে এই নামকরণ হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টার, টমসন গ্যারট প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহীদের জমিহারা, বাস্তুহারা কৃষক এবং এককালীন মোগল সাম্রাজ্যের সৈনিক (এখন যারা কর্মহারা) বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইংরেজদের সীমাহীন শোষণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচার (যে কারণে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল) বাংলায় বিদ্রোহের বস্তুগত অবস্থা তৈরি করেছিল। বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসলেন কয়েকজন বীর নেতা। তারা জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী শোনালেন এবং যেটুকু অস্ত্র জোগড় করা সম্ভব, তাই দিয়েই বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে, কখনও সম্মুখ যুদ্ধ, কখনও বা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ। এই বিদ্রোহের মহান নায়ক ছিলেন মজনু শাহ, অনুপ নারায়ণ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, নুরুল মহম্মদ, পীতম্বর, শ্রী নিবাস প্রমুখ। এই বিদ্রোহ ছিল হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন মজনু শাহ। তিনি বাংলা বিহারের সর্বত্র ভ্রমণ করে জনসাধারণকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং বিদ্রোহী সেনা বাহিনী গঠন করেছিলেন। তাঁর নামে ইংরেজ শাসকরা ভয়ে কাঁপত। তিনি রানি ভবানী প্রমুখ জমিদারদের সঙ্গেও যোগযোগ করেছিলেন। কিন্তু জমিদাররা তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ইংরেজের পক্ষই নিয়েছিলেন। মূলত এটা ছিল সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ। এক পর্যায়ে তারা উত্তর বঙ্গ থেকে ইংরেজ প্রশাসন উৎখাত করে স্বাধীনতার পতাকা তুলেছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পর ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহীরা প্রথমে আক্রমণ ও দখল করেছিলেন পূর্ব বাংলায় ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ঢাকার কুঠিগুলো। তখন ইংরেজদের কুঠিগুলো ছিল ইংরেজ শাসন ও ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ও শয়তানের ঘাটি। জনগণের আক্রোশও ছিল কুঠিগুলোর উপর। গুরুত্বের দিক দিয়ে কোলকাতার পরেই স্থান ছিল ঢাকার কুঠির। গেরিলা কায়দায় বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠি দখল করে বহু কামান বন্দুক ও অর্থ হস্তগত করেছিলেন। অনেক ইংরেজ বন্দি হয়েছিল। পরে ইংরেজ সৈন্যরা অধিকতর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঢাকা আক্রমণ করলে বিদ্রোহীরা পিছু হটে উত্তর বঙ্গে ঘাটি স্থাপন করেন।

BanglaBook.org

সেই সময় কুচবিহারের রাজার অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহীরা কুচবিহারে আক্রমণ চালালে ইংরেজ সৈন্যরা কুচবিহার রাজার পক্ষে এসে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু পারেনি। তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা কুচবিহার দখল করে রাজ বংশের অপর এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

১৭৬৪ সালে বিহারের সারণ জেলায় প্রতি বৎসরের মতো এবারও মেলা বসেছে। ইংরেজের এক অনুচর ছিল। নাম তার দেবীসিংহ। (পরে ১৭৮১ সালে দেবীসিংহকে ইংরেজরা রংপুরের ইজারাদার নিযুক্ত করেছিল। তার অত্যাচরের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। সে অনেক পরের কথা। সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।) দেবীসিংহ তার নিজস্ব ফৌজ নিয়ে আসতো মেলায় এবং মেলায় যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করতো। সেবার মেলায় দেবীসিংহের সৈন্যদের শায়েস্তা করার জন্য স্বয়ং মজনু শাহ'র নেতৃত্বে পাঁচ হাজার বিদ্রোহী সেনা সন্ন্যাসী বেশে মেলায় জনগণের সঙ্গে মিশে থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এদিকে দেবীসিংহের বাহিনীর অত্যাচার শুরু হয়েছে। তখন মজনু সর্দারের বাঁশি বেজে উঠল। পাচ হাজার বিদ্রোহী সেনা শত্রু সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে জনগণকে রক্ষা করেছিলেন। দেবীসিংহের ফৌজের সেনাপতি হাসান খাঁ বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে যেমন ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ, তেমনি ইংরেজদের দালালদের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোক ছিল। (এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মির জাফর আলী খান। ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিল জগৎ শেঠ ও রায়বল্লভ যারা ধর্মের দিক দিয়ে হিন্দু। আবার পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষ হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিলেন মোহনসিং ও মদন লাল। তারাও ধর্মের দিক দিয়ে হিন্দু।)

১৭৬৫ সাল। বিদ্রোহীদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা রাজশাহীতে প্রধান ঘাঁটি করে বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেছেন। সেখান থেকে রাজশাহী ও দিনাজপুরে ইংরেজ কুঠিগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে এই দুই জিলাকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করেছিলেন। তারপর তারা রংপুরের দিকে অগ্রসর হন। ১৭৭২ সালের ডিসেম্বর জাফরগঞ্জের নিকট বিদ্রোহী ও

BanglaBook.org

ইংরেজ বাহিনী মুখোমুখী হয়। যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় হয়। বহু ইংরেজ সৈন্য পালিয়ে যায়। কিন্তু গ্রামবাসী তাদের খুঁজে খুঁজে বের করে বন্দি করেছিল। যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি টমাস নিহত হয়েছিল। রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুরের বৃহৎ অংশ আবার স্বাধীন হলো।

তারপর বিদ্রোহীরা বগুড়ার দিকে অগ্রসর হলেন। তারা বগুড়ায় অবস্থিত বহু ইংরেজ কুঠি ধ্বংস করলেন। এই খবর পেয়ে কোলকাতা থেকে অনেক বেশি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইংরেজ বাহিনী বগুড়ায় এল। ইংরেজ বাহিনীর সংখ্যা আট হাজার। বিদ্রোহীদের সৈন্যসংখ্যা চারহাজার। (অবশ্য জনগণ বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিল)। বিদ্রোহীরা সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে পিছু হটলেন। কিন্তু ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারে অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। কুচবিহারের সন্তোষপুরের ইংরেজ দুর্গ তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলেন।

এরপর কিছুদিন বিদ্রোহীরা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করেন। এই সময়ে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ হয়েছিল বালুরঘাটে। বিদ্রোহীরা সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় কৌশল যুগপৎ ব্যবহার করেছিলেন। ইংরেজরা পরাজিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড নিহত হয়।

এই যুদ্ধের পর ইংরেজদের মনোবল ভেঙে পড়ে। বিদ্রোহীরা আবার উত্তরবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। তারা কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন, কামান বন্দুক তৈরির ছোটো ছোটো কারখানাও তৈরি করেন। তারা বিশাল নৌ বাহিনী গঠন করেছিলেন। অনেকগুলো নৌ ঘাটিতে বজরা ও ছিপ নৌকা বানালেন।

এবার বিদ্রোহীরা পুনরায় ঢাকা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলেন। নৌ পথে। দুই পক্ষের দেখা হলো এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো গোয়ালন্দের নিকটে। এবারও ইংরেজদের পরাজয় হয়েছিল। ঢাকার ইংরেজ কুঠি সহজেই দখল হয়ে গেল। কুঠির ইংরেজ বড়কর্তারা পালিয়ে জীবন বাচায়। ঢাকার কুঠি থেকে বহু অর্থ সম্পদ ও অস্ত্র বিদ্রোহীদের হস্তগত হলো।

এদিকে উত্তরবঙ্গে তখনও বিদ্রোহীরা একের পর এক ইংরেজ ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। নুরুল মহম্মদের নেতৃত্বে এক বাহিনী ইংরেজদের রাজশাহী জিলার প্রধান ঘাটি রামপুর বোয়ালিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজদের কুঠি দখল করেন। কুঠির প্রধান বেনেট বিদ্রোহীদের

BanglaBook.org

হাতে বন্দি হয়। বিদ্রোহীদের আরেক বাহিনী রংপুর ঘাটিতে আক্রমণ করলে কুঠির বড়কর্তা ইংরেজ মর্টেন সাহেব নিহত হয়েছিল।

বারবার পরাজিত হবার পর ইংরেজরা এবার অনেক বেশি শক্তি নিয়ে রংপুরের দিকে যাত্রা করলো। তারা খুব চুপি চুপি অগ্রসর হচ্ছিল, যাতে বিদ্রোহীরা টের না পায়। কিন্তু বিদ্রোহীরা তো জনগণেরই অংশ। জনগণ যেমন তাদের গোপনে আথবা প্রকাশ্যে আশ্রয় দিয়েছে, তেমনি ইংরেজ বাহিনীর সংবাদও দিয়েছে। বিদ্রোহীরা সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে রংপুর ত্যাগ করে জনগণের সঙ্গে মিশে গেলেন। ইংরেজ বাহিনী সহজেই রংপুরে প্রবেশ করল, কিন্তু বিদ্রোহীদের কাউকে খুঁজে পেল না। বিজয় দর্পে রংপুর দখল করে যখন ইংরেজ সেনাপতি স্মিথ সসৈন্যে নেপালের কাছাকাছি তরাই অঞ্চল দিয়ে ফিরছিলেন, তখন হঠাৎ করে বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালায় এবং ইংরেজদের পরাজিত করেন। ইংরেজ সেনাপতি স্মিথ নিহত হন। রংপুর আবার বিদ্রোহীদের দখলে এল।

রংপুর দখল করতে এবার আরও বড়ো ইংরেজ সেনাদল এল সেনাপতি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে। এবারও বিদ্রোহীরা রংপুর শহর ত্যাগ করে জনগণের সঙ্গে মিশে গেলেন। কিন্তু তারা প্রায়াই ছোটো ছোটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ইংরেজ সৈন্যদের উপর গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালাতেন। এইভাবে ইংরেজ সৈন্যদের তারা দুর্বল করে তুলেছিলেন। তারপর একদিন হঠাৎ করে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হলো। ইংরেজ বাহিনীতে যে সকল দেশীয় সৈন্য ছিল, তারা তাদের স্বদেশী ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। সেনাপতি এডওয়ার্ড শুধু শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের নিয়েই যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি এডওয়ার্ড সহ প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈন্য নিহত হয়েছিল।

বারবার পরাজয়ে ইংরেজরা দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিদ্রোহীরা এই বিজয় বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। ইংরেজদের বিশাল অস্ত্রশক্তির কাছে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। ইংরেজরা পাগলের মতো সারা উত্তরবঙ্গ চষে ফেলতে লাগলো বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে। ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের জড়ো করে উত্তরবঙ্গে ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু করল ইংরেজ দুশমনরা। বগুড়ার নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে স্বয়ং মজনু সর্দার পরাজিত হন। তিনি বিহারের দিকে চলে যান। তিস্তা নদীর তীরে এক যুদ্ধে বিদ্রোহী নেতা নুরুল মহাম্মদ

BanglaBook.org

এবং করতোয়া নদীর তীরে আরেক বিদ্রোহী সেনাপতি পীতম্বর শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। তাবে তারা দুজনেই সরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত গেরিলা কায়দার বদলে সম্মুখ যুদ্ধের কৌশল নেবার কারণেই এই পরাজয় হয়েছিল।

কিন্তু এক বৎসর অতিক্রান্ত না হতেই বিদ্রোহীরা আবার সংগঠিত হলেন। মজনু সর্দার বিহার থেকে এক বাহিনী সংগঠিত করে বাংলাদেশে ফিরে এলেন। নুরুল মহম্মদ, পীতম্বর, ভাবানী পাঠক প্রমুখ বিদ্রোহী নেতারা বাংলাদেশ থেকে দুইটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে মজনু শাহ'র সঙ্গে মিলিত হলেন। আবার তারা উত্তরবঙ্গ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেন। রাজশাহীর দুর্গে আবার উঠল স্বাধীনতার পতাকা।

উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধারের জন্য আবারও কোলকাতা থেকে ইংরেজ বাহিনী ছুটে এল। রংপুরের নিকটে এক স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হলো, যদিও তাদের অস্ত্র সম্ভার অনেক বেশি ছিল। ইংরেজ সেনাপতি টমাস যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

বিজয় উল্লাসে নুরুল মহম্মদ ও পীতম্বর এবার বিদ্রোহ বাহিনী নিয়ে কোলকাতার দিকে ছুটলেন। মনে তাদের বিরাট আশা। কোলকাতা দখল করে এই দেশ থেকে পরদেশ লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল ইংরেজদের চির বিদায় জানাবেন। মজনু সর্দারের অবশ্য ভিন্নমত ছিল। তিনি মনে করতেন, সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা কৌশল প্রয়োগ করা দরকার। বস্তুত কোলকাতা দখলের জন্য অভিযানটি ছিল হঠকারীতা।

এবার ইংরেজরাই বরং চুপি চুপি অগ্রসর হয়ে যশোরের কাছে মোগলহাট নামক স্থানে ভোররাত্রে নিদ্রারত বিদ্রোহী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালালো। মোগলহাট হয়ে উঠলো আরেক পলাসীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাঙালি বিদ্রোহীসেনারা পরাজিত হলেন। মোগলহাটের মাটি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল। যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে শহীদ হলেন দুই বীর সেনানায়ক, নুরুল মহম্মদ ও পীতম্বর।

এরপরও বিদ্রোহীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বহু বৎসর পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলেছিল।

স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেলেও জনগণের মনে তা যে রেখাপাত করেছিল, পরবর্তী পর্যায়ে তা স্বাধীনতার জন্য প্রেরণা যুগিয়েছিল। গণমানুষের কোনো সংগ্রামই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয় না।

BanglaBook.org

রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩)

দেবীসিংহ নামে ইংরেজদের এক কুখ্যাত দালালকে কোম্পানীর সরকার ১৭৮১ সালে রংপুরে ইজারাদার নিয়োগ করেছিল। তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়নি। ইজারাদারী পেয়েই কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা ও নানা ধরনের বেআইনী কর আদায় করতে শুরু করে। অত্যাচারিত কৃষকরা কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনেক আবেদন জানিয়েও, দরখাস্ত দিয়েও কোনো প্রতিকার পায়নি। কর্তৃপক্ষ ছিল দেবীসিংহের পক্ষে। এই অবস্থায় রংপুরের কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নুরুলউদ্দীন। সম্ভবত তাকে সাধারণ জনগণ নুরুলদীন নামে জানত। এই বিদ্রোহের পটভূমিকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক এক অসাধারণ নাটক লিখেছিলেন "নুরুলদীনের সারাজীবন"। জনপ্রিয় নাটকটি বাংলাদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে অনেকবার।

বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৮৩ সালের ১৮ জানুয়ারি। রংপুর জেলার টেপা, কাজীরহাট ও কাঁকিনা অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে থাকে পাঁচ সপ্তাহ। রংপুরের ইংরেজ রাজস্ব সংগ্রহকারী (কালেক্টর) কোম্পানীর রাজধানী কোলকাতায় যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল বাংলার কোথাও এত বড়ো বিদ্রোহ আর কখনও হয়নি।

বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল দেবীসিংহ। তারা দেবীসিংহের কাছারিতে আক্রমণ করেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কাগজপত্তর পুড়িয়ে ফেলেন। স্বাভাবিকভাবেই দেবীসিংহ ইংরেজের সাহায্য কামনা করল। ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনী রংপুরে এল বিদ্রোহ দমন করতে। রংপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় দুইপক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। ইংরেজ বাহিনীর ছিল কামান, বন্দুক ইত্যাদি। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের ছিল তীর, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি দেশিয় অস্ত্র। বিদ্রোহীদের সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশি। উপরন্তু জনসমর্থন তো ছিলই। বিদ্রোহী যোদ্ধাদের মধ্যে ছিল দুইশ তীরন্দাজ। কৃষক বিদ্রোহীরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়েছিলেন। কারন ইংরেজদের ছিল উন্নত অস্ত্রসম্ভার।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা পাটগ্রামে মিলিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুন হন। এরপরও ইংরেজ বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে আবারও পরাজিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই শহিদ হন ৬০০ জন বীরযোদ্ধা।

BanglaBook.org

বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এই কৃষক বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। পাঁচ সপ্তাহের জন্য হলেও তারা একটি সরকার গঠন করেছিলেন, যারা শাসন পরিচলনা করতেন। ইংরেজকে খাজনা প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এই সরকার কৃষকদের উপর এক ধরনের কর ধার্য করেছিলেন যা ছিল সহনীয় পর্যায়ের। এই করের নাম ছিল 'ডিঙ', যার মানে হলো বিদ্রোহ কর বা খরচ।

এই বিদ্রোহ ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম। বিদ্রোহের অঞ্চলগুলোতে সাধারণত আগের থেকে চলে আসা স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত মোড়লরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। শত শত মোড়ল নিজ নিজ অঞ্চলে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ ও জমায়েত করেছেন। দেখা গেছে বিদ্রোহের পরাজয় ঘটলেও ইংরেজ সরকারের (কোম্পানীর সরকারের) সৈন্যরা যখন মোড়লদের গ্রেফতার করতে গেছে, তখন গ্রামবাসীরা সৈন্যদের ঘেরাও করে বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পাশাপশি রংপুরের এই কৃষক বিদ্রোহ বাঙালি কৃষক জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রমাণ বহন করে।

চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-১৭৯৯)

১৭৯৮-৯৯ সালে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশজুড়ে যে চোয়াড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তা এই দেশের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। চোয়াড় শব্দটির অর্থ 'দুর্বৃত্ত ও নীচু জাতি'। এই শব্দটি দ্বারা বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের অরণ্যবাসী আদিবাসীদেরই বোঝানো হয়ে থাকে। মোঘল আমলে এরা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ এলাকায় স্বাধীনভাবে বসবাস করত এবং অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে ও আদিম প্রথায় চাষ আবাদ করে দিন যাপন করত। মোঘল আমলে তারা খাজনাও দিত না এবং শাসকরা তাদের স্বাধীন জীবন যাপনে হস্তক্ষেপ করত না। চোয়াড় অধ্যুষিত এলাকাটিকে জঙ্গল মহল বলা হয়ে থাকে। ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পর চোয়াড়দের জমি জমা কেড়ে নিয়ে জমিদারদের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রি করে এবং কিছু এলাকা ইজারাদারদের নিকট ইজারা দিতে আরম্ভ করে।এই সকল জমির উপর উচ্চহারে খাজনা ধার্য করা হয়। ফলে চোয়াড়দের এ যাবত চলে আসা জীবন হুমকির মুখে পড়ে। তারা ঘর বাড়ি জমি জীবিকা সবই হারিয়ে নিশ্চিত ধংসের মুখে পতিত হয়। এটাই ছিল চোয়াড়

BanglaBook.org

বিদ্রোহের প্রধান কারণ। ইংরেজ শাসকদের ও নতুন জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বিরাট অঞ্চলজুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই চোয়াড়দের সঙ্গে যোগ দেয় পাইক নামক একটি বিশেষ সম্প্রদায়। মোঘল আমলে তারা অনেকটা সরকারি পুলিশের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তার পরিবর্তে তারা বিনা খাজনায় কিছু জমি ভোগ করতেন। তাদেরকে মোঘল শাসকরা কোন বেতন দিত না। তার পরিবর্তে যে জমি দেওয়া হয় তাকে বলা হয় পাইকান জমি। ইংরেজ শাসকরা পাইকদের সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করে কয়েকজন জমিদারদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। জমিহারা, গৃহহারা হাজার হাজার পাইক চোয়াড়দের সঙ্গে এই বিদ্রোহে যোগদান করেন।

একই সময়ে কিছু সাবেক জমিদারও এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হন। ইংরেজরা খাজনার পরিমাণ দারুণভাবে বৃদ্ধি করলে কয়েকজন জমিদার তা দিতে অপারগ হন। ইংরেজ শাসকরা তাদের জমিও কেড়ে নিয়ে নতুন জমিদারদের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। ফলে জমি হারানো জমিদারদের অনেকেই এই বিদ্রেহে যোগদান করেন। তিনটি শক্তির মিলিত সংগ্রাম খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। জমিদারি হারানো বিদ্রোহী জমিদারাদের মধ্যে দুর্জন সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন। মেদিনীপুরে জেলার রায়পুর পরগণার জমিদার ছিলেন দুর্জন সিংহ। রায়পুর পরগণা থেকেই প্রথমে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে এবং পরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯৮ সালের মার্চ মাসে দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে দেড় হাজার বিদ্রোহী চোয়াড় ও পাইগণ রায়পুর পরগণার ৩০টি গ্রামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নতুন জমিদাররা যে সকল নতুন প্রজাদের পত্তন দিয়েছিল তাদেরকেও সরিয়ে জমি পুনর্দখল করেন। জমিদারদের আমলা, কর্মচারী এমনকি থানার দারোগা পর্যন্ত এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। পরে ইংরেজ শাসকদের সৈন্যরা রায়পুর পরগণায় আসলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা সরকারি সৈন্যের সঙ্গে না পেরে রায়পুর পরগণা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। তবে দুইমাসের মধ্যেই দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে পাঁচশ বিদ্রোহী পুণরায় রায়পুরা পরগণায় প্রবেশ করে জমিদারের নায়েবের কাছারিবাড়ি ভস্মীভূত করেন। কিন্তু এবারও সরকারি সৈন্যদের সঙ্গে না পেরে এলাকা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন বিদ্রোহীরা। আবারও মাত্র দেড় মাসের মাথায় তারা রায়পুর

BanglaBook.org

পরগণায় আক্রমণ চালান এবং সরকারি সৈন্যদেরকে পরাজিত করে সমগ্র পরগণাটির উপর কিছুদিনের জন্য নিজস্ব আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হন।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন পরগণার উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। মেদিনীপুর পরগণাটি বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে অন্ততপক্ষে ১২৪টি গ্রাম বিদ্রোহীরা দখল করে জমিদার ও নায়েবদের হত্যা করেন। কাছারিবাড়িতে আগুন লাগান।

বিদ্রোহীদের আরেকটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল শালবনী পরগণায়। এটি ছিল প্রধানত পাইকদের বাসস্থান। বিদ্রোহীরা শালবনীতে অবস্থিত তহসিলদারের কাছারি, সরকারি অফিস ও সৈন্যদের ব্যারাকের সবকিছু লুণ্ঠন করেন।

১৭৯৯ সালের দিকে দেখা গেল, জঙ্গল মহল থেকে রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। জঙ্গল মহলে যে নতুন প্রজা আনা হয়েছিল তারাও প্রাণভয়ে চলে যায়। কোনো কোনো জায়গা থেকে দারোগারা পর্যন্ত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরের ইংরেজ কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডকে যে চিঠি দেন তা লেখা ছিল, "জঙ্গল মহলের সমস্ত গ্রাম ধংস করতে সক্ষম হওয়ায় চোয়াড়দের সাহস এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তারা সদরে এসে হানা দিতেও ভয় পায় না। মফস্বলের সর্বত্র এমনকি মেদিনীপুর শহরেও সকলে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে গেছে। জঙ্গল মহল থেকে রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।"

চোয়াড় বিদ্রোহীরা জানতেন যে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত সরকারি সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না। সেজন্য তারা এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে সরকারি বাহিনী আসলে কোন জমিদার ব্যবসায়ী তহসিলদার ও ইজারাদারগণ যেন তাদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য না করতে পারে। বিদ্রোহীরা তহসিলদার, ইজারাদার, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের চিঠি দিয়ে সতর্ক করে দেন যে ইংরেজ পক্ষের সৈন্যরা আসলে যদি কেউ খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এইরূপ ভীতি প্রদর্শন অনেকাংশে কাজে লেগেছিল।

১৭৯৯ সালে মেদিনীপুরের চোয়াড় ও পাইক বিদ্রোহীদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার পাইকরাও এসে যোগদান করেন। এরপর বিভিন্ন পরগণায় সরকারি বাহিনীর সঙ্গে অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়।

BanglaBook.org

এইভাবে প্রায় দুই বছর ধরে বিদ্রোহ চলার পর ১৭৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পুরাবিত্রা ও আনন্দিনী নামক দুইটি তালুকে এবং ১৮০০ সালের জানুয়ারিতে তমলুকের বাসুদেবপুর অঞ্চলের কৃষকগণ খাজনা বন্ধ করে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন।

সামরিক বাহিনী দিয়েও এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব নয় জেনে সরকার ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পাইকান জমি দখল করার নীতি আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। তারা পাইকানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিছু কিছু চোয়াড় সরদার ও পাইকদের পুলিশের কাজে নিযুক্ত করার প্রস্তাব রাখে। ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসলেও ইতিহাসে তা এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছ। এই বিদ্রোহ জনগণের নিজস্ব শক্তির পরিচয় বহন করছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭)

১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবদের অংশবিশেষ এবং বিহারের ভাগলপুর জেলা– এই গোটা অঞ্চলটি জুড়ে ব্রিটিশ শাসন এবং জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তা ইতিহাস বিখ্যাত। এ অঞ্চলে ইংরেজদের সহযোগী জমিদার এবং মহাজনদের অত্যাচারে সাঁওতাল কৃষকরা চরমভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছিল। মহাজনরা অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ দিত এবং নানা কায়দায় তাদেরকে ঠকাত। ইংরেজ লেখক স্যার ইউলিয়াম হান্টারের বই 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে সাঁওতালদের উপর জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের এবং সাঁওতালদের চরম দুর্দশার এক বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়াও ছিল ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের খাজনা আদায়ের নামে সর্বস্ব লুটের ঘটনা। মহাজনদের সুদের পরিমান ছিল শতকরা পঞ্চাশ থেকে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত। তার উপর বেআইনী কর আদায়, জোর করে জমি দখল, শারীরিক অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন এসবই ছিল সাধারণ ঘটনা। এর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের ক্ষোভ থাকলেও নিরীহ সাঁওতালরা কখনও বিদ্রোহ করেনি। প্রথমবারের মতো জেগে উঠল নেতা সিধু ও কানু দুই ভাইয়ের ডাকে। সিধু-কানুর গ্রাম ভাগনাদিহিতে চারশ গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল জমায়েত হন। সেখানে তারা শপথ গ্রহণ করেন যে

BanglaBook.org

তাদের এলাকা থেকে জমিদার মহাজন ও ব্রিটিশ শাসকদেরকে উৎখাত করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। গোটা সাঁওতাল এলাকায় বিদ্রোহের পতাকা উড়ল। এই অঞ্চল থেকে জমিদার মহাজনরা ভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজ শাসকরাও কামান বন্দুক নিয়ে বারবার সাঁওতালদের উপর আক্রমণ চালায় কিন্তু প্রথমদিকে প্রতিবারই ইংরেজ সেনারা পরাজিত হয়। সাঁওতালরা লড়েছিলেন বিষাক্ত তীর, কুঠার, তরবারি ও সামান্য কিছু বন্দুক নিয়ে। তারা নিজস্ব এলাকায় অত্যাচরী জমিদার মহাজন ও পুলিশদের বেছে বেছে হত্যা করেন। জমিদার মহাজনদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ধানের গোলা, গরু, মহিষ, প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে গরিব সাঁওতালদের মধ্যে বিলি করেন। ইংরেজ সাহেবদের কুঠিগুলোও নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়।

বিদ্রোহী সাঁওতালদের পক্ষে এসে দাঁড়ান বাংলাদেশের গরিব হিন্দু ও মুসলমান। তাদের মধ্যে ছিলেন কামার, কুমার, চামার, ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ এবং মুসলমান তাঁতী যাদেরকে বলা হতো মোমিন। ১৮৫৫ সালের ৩রা জুলাই এক দারোগার নেতৃত্বে একদল পুলিশ সাঁওতাল এলাকায় একটি বাজারে হানা দিলে বিদ্রোহীরা দারোগাসহ সকল পুলিশকে হত্যা করেন এবং বন্দুকগুলো হস্তগত করেন। পুলিশ আসার পর তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল পাঁচজন মহাজন। বিদ্রোহীরা তাদেরকেও হত্যা করেন। এরপর বিদ্রোহীরা সাঁওতাল অঞ্চলের রাজধানী বার্ন হাইটের বাজার আক্রমণ করে সকল অত্যাচারী মহাজনদের হত্যা করেন। পাকুড়ের জমিদারের প্রাসাদও তারা আক্রমণ করেন।

বিদ্রোহী সাঁওতালদের আত্মবিশ্বাস ও শক্তি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। পাকুড়ের পর বিদ্রোহীরা অম্বর পরগণার জমিদারের কাছারিবাড়ির গুদাম ও গোলা আক্রমণ করেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা এবং বিহারের একটা বড়ো অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে চলে আসে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সিধু ও কানু ভ্রাতৃদ্বয় এবং ভৈরব ও চাঁদ। তাছাড়াও স্থানীয়ভাবে নতুন নতুন সাহসী নেতার অভ্যুদ্বয় ঘটে।

এই বিদ্রোহ কোলকাতায় অবস্থিত ইংরেজ শাসকদেরও ভীত করে তুলেছিল। ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুলাই কোলকাতা থেকে মেজর বরোজ নামক এক ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে বিরাট সেনাবাহিনী বহু বন্দুক কামান নিয়ে ঐ এলাকায় বিদ্রোহ দমন করতে আসে। সিধু ও কানুর

BanglaBook.org

নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীণ হলেন। অন্যদিকে বিদ্রোহীরা চারদিক থেকে ইংরেজদের ঘিরে ফেললেন। পাঁচঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ধ্বংস হলো। এরপর বড়োলাট ডালহৌসির নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লয়েডের নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাদল বিদ্রোহী এলাকার উপর অভিযান চালায়। কিন্তু সেবারও গভীর রাতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের অকস্মাৎ আক্রমণে দিশেহারা ইংরেজ বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই জয়লাভের পর বিদ্রোহীরা রানিগঞ্জের একটি অঞ্চলও দখল করে ফেলেন।

বারবার পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজ শাসকরা গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে ত্রাশ সৃষ্টি ও রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার অভিপ্রায়ে অধিকতর বিরাট সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের জমিদাররা ইংরেজদেরকে অর্থভাণ্ডার ও পাইক বরকন্দাজ দিয়ে সাহায্য করেছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তার পঞ্চাশটি হাতিও এই অভিযানের জন্য ইংরেজদের দান করেছিল। পরে এক পর্যায়ে বর্বর ইংরেজ শাসকরা এই হাতিগুলোকে পাগল করে সাঁওতাল অঞ্চলে ছেড়ে দিয়েছিল। পাগলা হাতির পায়ের নিচে পড়ে শত শত সাঁওতাল প্রাণ হারিয়েছিল। হাজার হাজার কুড়েঘর চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

কামান বন্দুকের মুখে তীর ধনুক লাঠি তরবারি ও বর্শায় সজ্জিত বিদ্রোহী বাহিনী এক পর্যায়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইংরেজদের সাথে বিদ্রোহীদের মোট ১৩টি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। বিদ্রোহের দুই বীর নায়ক চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের যুদ্ধে শহিদ হলেন। কিন্তু পাশাপাশি বীরভূমের একটি গ্রামে কানুর নেতৃত্বে পরিচালিত সাঁওতাল বাহিনীর কাছে ইংরেজ বাহিনী চরমভাবে পরাজিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। একই সময়ে সিধুর নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর উপর সাঁওতাল আক্রমণ অব্যাহত থাকে। রাজমহলের পশ্চিম দিকে সকল নীলকুঠি ও ইংরেজদের ঘাঁটি বিদ্রোহীদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরে বিদ্রোহীদের দমন করতে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ চালায়। মহেশপুর গ্রামে তুমুল যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল। ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ ও বর্বতার মুখে বিদ্রোহী সেনাপতি সিধু তার বাহিনী নিয়ে বীরভূম থেকে পিছু হটে সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ করেন। তখন সাঁওতাল পরগণা ইংরেজদের দখলে চলে এসেছে এবং ইংরেজ সৈন্যরা সাঁওতালদের

BanglaBook.org

উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে। এতে সাঁওতালদের মনোবল কিছুটা ভেঙ্গে পড়ে। বিদ্রোহী নেতা সিধু অবশ্য ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গেরিলা কায়দায় ইংরেজদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। হতাশাচ্ছন্ন একদল সাঁওতাল সিধুর গোপন আস্তানার খবর দিয়ে দেয় ইংরেজদেরকে। ইংরেজদের হাতে সিধু ধরা পড়েন এবং ইংরেজরা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

সাঁওতালদের আরেক নেতা কানু কখনও জীবিত ছিলেন। তিনি বহুদিন পর্যন্ত গেরিলা কায়দায় ইংরেজ বাহিনীর উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এতে ইংরেজবাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়। অন্যদিকে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের মাত্রাও বাড়তে থাকে। গোটা সাঁওতাল এলাকা অসংখ্য সাঁওতালের মৃতদেহে ভরে উঠল।

১৮৫৭ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাঁওতালদের বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য ১৮৫৭ সালেই সারা ভারতব্যাপী সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্য সাঁওতাল বিদ্রোহের সঙ্গে জাতীয় অভ্যুত্থানের (সিপাহী বিদ্রোহ) কোনো যোগাযোগ ছিল না।

সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন দ্বিতীয়বারের মতো জ্বলে উঠেছিল ১৮৭১ সালে। সেবারও অমিত সাহস ও সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সাঁওতালরা। ততদিনে ইংরেজের শক্তি অনেক সংহত হয়েছে। ইংরেজ সেনাবাহিনী ছয়মাস ধরে সাঁওতাল এলাকা ঘেরাও করে ঘুরে ঘুরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের গুলি করে হত্যা করে।

তারপর সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদলধ্বনি আর শোনা যায়নি। কিন্তু অসম সাহসী এই সাঁওতাল বিদ্রোহ স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে আজও স্মরণীয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ সাত

নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬১)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে নীলের চাষ ও ইংল্যান্ডের বস্ত্রমিলে সরবরাহ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। ইংল্যান্ডে বস্ত্র কারখানার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন করা হয়। কিন্তু সেকালে নীলগাছ থেকে এই দ্রব্যটি উৎপাদন করা হতো। নীলকর সাহেবরা বাংলার জমিদারদের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে কৃষকদেরকে নীল উৎপাদন করানোর জন্য বাধ্য করত। তারা নীল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের একটি চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য করত। অল্প কিছু অগ্রিম হিসেবে দাদন দিত এবং নির্দিষ্ট জমি কৃষককে নীলের গাছ উৎপাদনের জন্য বাধ্য করত। বস্তুত তারা কৃষকদের একধরনের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। কৃষকদের যে দামে নীলকরদের কাছে নীল বিক্রয় করতে বাধ্য করা হতো তাতে তাদের উৎপাদন খরচও উঠত না। কোন কৃষক ঐ চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হতো, এমন কী গুলি করেও হত্যা করা হত। নীলকর সাহেবদের থাকত পাইক-বরকন্দাজ, নিজস্ব কয়েদখানা এবং যথেষ্ট পরিমাণ বন্দুক। ইংরেজ শাসক ও জজ ম্যাজিস্ট্রেটগণও ছিল নীলকরদের পক্ষে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলকর সাহেবরাই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিচারব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত হতো। প্রধানত বাংলায় বিশেষ করে যশোর, নদীয়া, পাবনা, ঢাকা, খুলনা, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় নীল চাষ হতো। নীলকর ও জমিদাররা মিলে নীল চাষীদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত। মুনাফালোভী নীলকর সাহেবরা ছিল বাংলার কৃষকের জন্য এক সর্বনাশী দানবস্বরূপ আর নীলকুঠি গুলি ছিল এ দানব শায়তানদের ঘাঁটি। নীলকর

BanglaBook.org

সাহেবদের পৈশাচিক তাণ্ডব ও কৃষকের হাহাকার শোনা যায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত গানে।

"জমিনের শত্রু নীল,
কর্মের শত্রু চিল,
(তেমনি) জাতের শত্রু পাদরী হিল"

অমানুষিক অত্যাচার ও আর্থিক ক্ষতির কারণে সিপাহী বিদ্রোহের পরপরই ১৮৫৯ সালে বাংলার ৫০ লক্ষ নীল চাষী বিদ্রোহ করে উঠেছিলেন। তারা ঘোষণা করলেন তারা আর নীল চাষ করবেন না। নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা দাদন নিয়ে নিজেদের ক্রীতদাসে পরিণত করবেন না। এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল নদীয়া জেলা থেকে। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চৌগাছা গ্রামের দুই ভাই বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের মধ্যে সভা করতেন, তাদের সংগঠিত করতেন এবং নীল চাষ না করার জন্য কৃষকদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাতেন। নীলকর ও ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিছু বন্দুকও তারা জোগাড় করেছিলেন। তবে তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি। তারা গ্রামে গ্রামে লাঠিখেলার আয়োজন করলেন এবং হাজার হাজার লঠিয়াল তৈরি করলেন। বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে তারা বরিশাল থেকেও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লাঠিয়াল এনেছিলেন। চৌগাছা গ্রামটি হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি। নীলকরদের নির্দেশে তাদের বরকন্দাজরা এই গ্রামে আক্রমণ চালায়, বহু ঘরে আগুন লাগায়, নারীদের উপর দৈহিক অত্যাচার করে। বিদ্রোহীদের প্রস্তুতি তখনো সম্পন্ন হয়নি। তাই তারা এই প্রথমবারের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, যদিও তারা বীরের মতোই প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। এই যুদ্ধে দশজন কৃষক শহিদ হয়েছিলেন।

নদীয়া জেলার এই সংবাদ আশেপাশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠল যশোর, খুলনা, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর জেলার নীল চাষীগণ। নীলকর সাহেবদের আক্রমণ থেকে রক্ষা ও পাল্টা ব্যবস্থার জন্য তারা আরও সংহত হলেন। প্রতিটি গ্রামে বড়ো ও উঁচু গাছে ঘণ্টার ব্যবস্থা রাখা হলো। আক্রমণ আসলেই ঘণ্টা বাজানো হতো। শঙ্খধ্বনি দিয়ে পাশের গ্রামবাসীদেরও সতর্ক করে দেওয়া হতো। পাশের গ্রামগুলো থেকেও লাঠিয়াল যোদ্ধারা আসতেন তাদের সহায়তার জন্য।

BanglaBook.org

যশোর ও নদীয়া জেলাতে নীল বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই দুই জেলার সকল কুঠি বিদ্রোহীদের আক্রমণে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা পদাতিক সৈন্য ও রণতরী নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে এসেছিল। কিন্তু তাতেও চাষীদের দিয়ে নীল চাষ করানো সম্ভব হয়নি। নীল বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবেই নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

কাদের মোল্লার নেতৃত্বে খুলনা জেলার কৃষক লাঠিয়ালদের সঙ্গে নীলকর জমিদারদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল। এরমধ্যে মোল্লাহাটির বিদ্রোহ সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

১৮৬১ সালে নীলকর জমিদার মরেল সাহেবের ম্যানেজার হেলি সাহেব সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নেতা রহিম উল্লাহ্'র বাড়ি ঘেরাও করে তার পরিবারের সকলকে হত্যা করে। অন্যদিকে রহিম উল্লাহ্'র নেতৃত্বে সুন্দরবন অঞ্চলের সকল নীলকুঠি নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। পরে একদিন মধ্যরাতে হেলি সাহেব আড়াইশ পাইক বরকন্দাজ ও বন্দুক নিয়ে রহিম উল্লাহ্'র বাড়ি ঘেরাও করে। সারারাত ধরে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে রহিম উল্লার গুলি ফুরিয়ে গেলে ঘরের মেয়েরা গা থেকে রুপার কাঁকন খুলে দিয়েছিল যা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বন্দুকের গুলি তৈরি হয়েছিল। এই যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেই রহিম উল্লাহ্ শহীদ হয়েছিলেন। অন্যদিকে শত্রুপক্ষের একত্রিশজন বরকন্দাজও নিহত হয়েছিল।

এইভাবে নীল চাষীদের বিদ্রোহের কারণে নীল চাষ এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে সদ্য সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ে ভীত ইংরেজ শাসকরা চায়নি যে নীল বিদ্রোহ আরও সশস্ত্ররূপ ধারণ করুক। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বড়ো অংশ নীল চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তাদের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। তিনি তার পত্রিকায় লিখেছিলেন "বাঙলা দেশ তার কৃষককুল সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে, ... শক্তি নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক জ্ঞান নেই, এমনকি নেতৃত্ব নেই, তবুও বাংলার কৃষকেরা এমন একটি বিপ্লব সম্ভব করতে পেরেছে যাকে অন্যদেশের বিপ্লবের থেকে কি ব্যাপকতায়, কি গুরুত্বে কোনদিক থেকেই নিকৃষ্ট বলা চলে না।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে সদ্য শিক্ষিত যে বুদ্ধিজীবী

BanglaBook.org

শ্রেণীর (প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু) প্রধান অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার সমর্থক ছিলেন এবং তারা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তাদেরও একটা বড়ো অংশ নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। যশোরের শিশির কুমার ঘোষ নীল চাষীদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট, পত্রিকায় অনেকগুলো চিঠি প্রকাশ করেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকটিও এই সময় লিখিত হয়েছিল যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দীনবন্ধু মিত্র সরকারি কর্মচারী ছিলেন বিধায় নাটকটির লেখকের নাম উল্লেখ ছিল না। এই নাটক সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কোনও গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। নীলদর্পণ কে লিখিল তাহা জানিতে পারা গেল না; কিন্তু বাড়ীতে বাড়ীতে ময়রাণী লো সই; নীল জেগেছে কই? ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল।"

নীল দর্পণ নাটকটির ইংরেজি অনুবাদও হয়েছিল। জানা গেছে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই অনুবাদের কাজটি করেছিলেন। কিন্তু তিনিও কৌশলগত কারণে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। এই নীলকর সাহেবরা এই নাটকটি নিয়েও মামলা করেছিল। কোর্টে ইংরেজ পাদরী লং নাটকের অনুবাদক হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করেছিলেন। মামলায় লং-এর একমাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজে এই জরিমানার টাকা দিয়ে দেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও নীলকর সাহেবরা মামলা করেছিল এবং আর্থিকভাবে তাকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তার অবস্থান থেকে সরে আসেননি। মামলা চলাকালীন অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

নীল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে গ্রামে গ্রামে যেসকল গান রচিত হয়েছিল তার একটি ছিল নি ম্নরূপ।

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
কর্ল্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মোল
লংয়ের হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার"...

BanglaBook.org

নীল বিদ্রোহে ভীত হয়ে ইংরেজ প্রশাসন একটি কমিশন করতে বাধ্য হয় যা ইন্ডিগো কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশনের সামনে নীল চাষীরা সরাসরি ঘোষণা করেছিলেন যে তারা কোনো অবস্থাতেই নীল চাষ করবেন না। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে তিনি নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এবং তিনি তাদের মামলা মোকদ্দমায় সহায়তা করতেন। তিনি অবশ্য বলেন যে তিনি তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক পথে অভিযোগ করতেই পরামর্শ দিয়েছেন এবং কোনো বেআইনী কাজে সমর্থন জানাননি।

মামলা মোকদ্দমায় কৃষকের পক্ষে যে সকল মোক্তার ছিলেন অথবা যারা কৃষকদের আইনগতভাবে সাহায্য করতেন সরকার তাদেরও গ্রেপ্তার করত।

শেষ পর্যন্ত কমিশন রায় দিয়েছিল যেকোনো নীলকর জোর করে নীল চাষ করাতে পারবে না। নীলচাষ সম্পূর্ণভাবে কৃষকের ইচ্ছাধীন।

কিছুদিন পরই রাসায়নিক উপায়ে নীল প্রস্তুত করার প্রণালী উদ্ভাবিত হওয়ার পর নীল চাষ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৮৯ সাল পর্যন্ত যশোর জেলার বিজলিয়া কুঠিটি টিকে ছিল যার অধীনে ৪৮টি গ্রামের চাষীরা নীল চাষ করতেন। সেখানেও ইংরেজ ম্যানেজারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল গ্রামের চাষীরা বিদ্রোহ করেছিলেন। প্রাণভয়ে ইংরেজ সাহেব পালিয়ে গেলে এই শেষ কুঠিটিরও পতন ঘটে।

নীল বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে জনগণের সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এইবারই প্রথম কৃষকরা লড়াই করে বিজয় লাভ করেছিল। কৃষকদের এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আরেকবার তাদের নিজস্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ আট

ওয়াহাবি ও ফরাজী আন্দোলন তিতুমীরের বিদ্রোহ

সৈয়দ আহমদ ও ওয়াহাবি আন্দোলন

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওয়াহাবি আন্দোলন এক বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি। ওয়াহাবি একটি আরবী শব্দ যার মানে হলো পুনর্জাগরণ। ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ ছিল প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কার দূর করে ইসলাম ধর্মকে পুনর্জীবিত করা। আরবের আব্দুল ওয়াহাব এই আদর্শের প্রবর্তক ছিলেন। তার নামানুসারেই এই ওয়াহাবি আন্দোলন।

প্রথমে ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন থাকলেও পরবর্তীতে তা সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এবং এক পর্যায়ে তা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের রূপও নিয়েছিল। বিদেশি শত্রুদের উচ্ছেদ করে সকল প্রকার অত্যাচার মূলোৎপাটন ও ইসলামী ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ আহমদ ও তার শিষ্যগণ।

উত্তর পশ্চিম ভারতে গরিব মুসলমানরা দলে দলে ওয়াহাবি আন্দোলনে যোগদান করেন। এটা উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের কথা। তখন পাঞ্জাবে (বাংলার মতই) অধিকাংশ চাষী ছিল মুসলমান আর জমিদার জোতদাররা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিখ। নিষ্ঠুর সামন্ত শোষকদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ ধর্মযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। যার নেতৃত্বে ছিলেন ওয়াহাবিরা। ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবে ওয়াহাবি– শিখ ধর্মযুদ্ধ চলে। ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ স্বয়ং নিহত হন। তারপর

BanglaBook.org

কিছুদিন ওয়াহাবিদের মধ্যে হতাশা নেমে আসলেও এই আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম রূপে উত্তর ভারতজুড়ে দীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত থাকে।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর দুই শিষ্য পাটনার এনায়েৎ আলী ও বিলায়েৎ আলী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহা বিদ্রোহ শুরু হলে ওয়াহাবিরা একটু পরে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করেন এবং এই অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যাবার পরও তারা দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়ে যান। সরকার ওয়াহাবিদের গ্রেফতার করে এবং বিভিন্ন মামলা দায়ের করে। এগুলো হচ্ছে ১৮৬৪ সালের আম্বলা বিচার, ১৮৬৫ সালের পাটনা বিচার, ১৮৭০ সালের মালদার বিচার, ১৮৭০-৭১ সালের ওয়াহাবি বিচার। এই সকল বিচারে বহু ওয়াহবি নেতার প্রাণদণ্ড হয়েছিল। অন্যান্যদের দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

১৮৭২ সালে ভারতের বড়োলাট লর্ড মেয়ো আন্দামান জেল পরিদর্শন করতে গেলে সেখানে বন্দি ওয়াহাবি নেতা শের আলী তাকে হত্যা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানির মর্যাদা লাভ করেন। পরে তাঁর ফাঁসি হয়। তিনি শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ৭০'র দশকের পর ওয়াহাবি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেক বীর ত্রৈলক্য মহারাজের মতে, এই আন্দোলন আরও দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল।

তিতুমীরের বিদ্রোহ

ওয়াহাবি অন্দোলন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বঙ্গদেশে। এই প্রসঙ্গে (১) তিতুমীরের সশস্ত্র বিদ্রোহ (২) ফরাজী আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে দুইটি আন্দোলন স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে। ১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদ ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার করার জন্য কোলকাতায় আসলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার মুসলমান কোলকাতায় ভিড় করে এই বিদ্রোহী নেতার কথা শোনার জন্য। তার মধ্যে একজন ছিলেন সুঠামদেহী বিপুরী যুবক। নাম তার তিতুমীর। কোলকাতার নিকটস্থ গোবরডাঙ্গা গ্রামের এক গৃহস্থ কৃষকের ছেলে তিতুমীর। তার পুরো নাম ছিল মীর নাসির আলী।

BanglaBook.org

তিতুমীর প্রথম জীবনে কিছুদিন নদীয়ার এক জমিদারের অধীনে চাকরি করেন। পরে তা ছেড়ে দেন। কারণ গোলামী তার ভালো লাগেনি। এরপর সৈয়দ আহমদের সাঙ্গে দেখা হলে তিনি মহৎ আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগী হন। তখন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে কৃষকদের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। তিতুমীর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য কৃষকদের সংগঠিত করেন এবং লাঠি, বর্শা ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত করেন। কোলকাতা থেকে মাত্র একুশ মাইল দূরে নারকেলবাড়িয়া থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। ক্রমশ নদীয়া জেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

তখন যেহেতু জমিদার ছিল হিন্দু এবং ওয়াহাবিরা ছিলেন মুসলমান তাই ইংরেজ শাসকরা (যথা নদীয়া জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট) পর্যন্ত প্রথম দিকে এই বিদ্রোহকে গ্রামবাসীর মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলে মনে করেছিল। পরে এর কৃষক চরিত্র ধরা পড়ে। তিতুমীরের আন্দোলনের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান জমিদার এক জোট হলো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো নীলকর সাহেবরা এবং গোটা ইংরেজ প্রশাসন। তিতুমীরের নামে হুলিয়া বের হলো। তিতুমীর আত্মগোপনে গেলেন। এবং হিন্দু মুসলমান কৃষকরাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল।

তিতুমীরের বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য জমিদাররা পুলিশ লেলিয়ে দিল। তারা কৃষকদের বাড়ি ঘরে আক্রমণ চালালো, কৃষকের যা সামান্য সম্পদ ছিল তা ধ্বংস করল। তিতুমীরের বাহিনীও পাল্টা আক্রমণ করেছিল জমিদারদের উপর। জমিদারদের বাড়ি ও সম্পদ লুট হতে লাগল।

তিতুমীর বললেন, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অত্যাচারী জমিদার মাত্রই শত্রু। ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর ইংরেজ সেনাপতি আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল। তাদের ছিল বন্দুক। আর তিতুমীর বাহিনীর ছিল বিষাক্ত তীর ধনুক ঢাল তরবারি আর বর্শা। তাঁরা গোপনে থেকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল ইংরেজ বাহিনীর উপর। দেড় ঘণ্টার যুদ্ধে ইংরেজদের সকল সৈন্য নিহত হয়েছিল। আলেকজান্ডার পালিয়ে বেঁচেছিল।

এরপর ১৭ নভেম্বর নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে এল আরেক সৈন্যদল। তারাও পরাজিত হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সৈন্যদের নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর আবার এক হাজার সৈন্য ও কয়েকটা

BanglaBook.org

কামান নিয়ে তিতুমীরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলো ইংরেজ শাসকরা। এইবার প্রথমবারের মতো তিতুমীরের বাহিনী পরাজিত হলে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে তিতুমীর পালিয়ে গেলেন।

তিতুমীর এরপর আবার কৃষক বাহিনীকে সংগঠিত করলেন। তারা তেতুলিয়া নামক গ্রামে সমবেত হয়ে ঘাঁটি করলেন। প্রাথমিকভাবে তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচশ। ক্রমাগত আশেপাশের কৃষক যুবকরা এসে যোগদান করেন এবং সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিতুমীরের সৈন্যরা আশেপাশের বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে বাঁশের দুর্গ তৈরি করেন। গ্রামবাসী স্বেচ্ছায় বাঁশ সরবরাহ করেছিল। এটাই ছিল ইতিহাস বিখ্যাত তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা।

তিতুমীরের কৃষক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে এক হাজার সৈন্য, বন্দুক আর কামান নিয়ে তেড়ে আসছিল শত্রুপক্ষ অর্থৎ ইংরেজরা। পথিমধ্যে ইংরেজ বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হলো বিদ্রোহী বাহিনীর দ্বারা। বাঁশের কেল্লা থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসম সাহসী যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তিতুমীর ও তাঁর সহযোদ্ধা গোলাম মাসুম। তিতুমীরের বাহিনীর অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক আর বর্শা। অন্যদিকে শত্রুপক্ষ ইংরেজের ছিল কামান। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, "বর্বর, মদমত্ত ইংরেজরাও বাঙালি বীর তিতুর অদ্ভুত সাহস আর রণনৈপুণ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোন তুলনা নেই।"

আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। এক পর্যায়ে তিতুমীর কামানের গোলার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। অপর সেনাপতি গোলাম মাসুমও বন্দুকের গুলিতে আহত হন। তারপরও তিতুমীর প্রচুর রক্তক্ষরণকে উপেক্ষা করে দক্ষ সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিদ্রোহীদের তীর-বৃষ্টিতে ইংরেজ সৈন্যরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সহসা ঝড় শুরু হলো। বাঁশের কেল্লা ভেঙে পড়ে। প্রকান্ড এক বাঁশ এসে পড়ল তিতুমীরের মাথায়। তিনি অচেতন হয়ে পড়েন।

এই যুদ্ধে বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটে। ইংরেজরা আহত তিতুমীর ও তাঁর সেনাপতি গোলাম মাসুমকে (তিনিও আহত) ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর বর্বর ইংরেজরা উভয়কে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছিল। সেদিন বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটলেও বাঁশের কেল্লা আর তিতুমীর কিংবদন্তী হয়ে রইলেন। পরবর্তীতে যুগ যুগ ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

ফরাজী আন্দোলন

ওয়াহাবি আন্দোলনেরই আরেকটি ধারা বাংলাদেশে ফরাজি আন্দোলন নামে ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (বিশেষত ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সাল) ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলাদেশে এক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়ছিল। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৌলভী শরিয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। তিনি মাদারীপুর জেলার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কায় গমন করেছিলেন এবং সেখানে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখান থেকেই তিনি ওয়াহাবি মতাদর্শ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি ওয়াহাবি মতবাদ প্রচার ও ধর্ম সংস্কারের কাজে মন দেন। একই সঙ্গে বিদেশি ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে ইসলামী ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি 'ফরাজী' নামে এক সম্প্রদায় গড়ে তোলেন, যারা একই মতাদর্শে বিশ্বাসী। ফরাহিজ মানে আল্লাহর আদেশ। এই সম্প্রদায়টিকে তিনি বৃটিশ বিরোধী জঙ্গি চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন বটে, তবে সেই কাজ করে যেতে পারেননি। তার আগেই ১৮৪০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর ফরাজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তারই পুত্র মহম্মদ মহসিন উদ্দিন দুদু মিয়া। তিনি দুদু মিয়া নামেই অধিক পরিচিত। দুদু মিয়া পিতার ন্যায় নিজ গ্রামে বাহাদুরপুরে আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে এই সংগঠন ফরিদপুর, চব্বিশ পরগণা, যশোর, নদীয়া, খুলনা, বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

এই আন্দোলন জমিদার ও নীলকর সাহেব ও ইংরেজ শাসন বিরোধী সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতেন। কৃষকের মধ্যে দুদু মিয়ার প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তাঁর নির্দেশে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু মুসলমান কৃষক যেকোনো সময় জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

দুদু মিয়া বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন। তাঁর অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে খলিফা, সর্দার প্রভৃতি ছিলেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে প্রচার আন্দোলন ও কৃষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজ করতেন। তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা বলতেন, মানুষ মাত্রই সমান, ভগবান বা আল্লাহর জগতে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ থাকতে পারবে না।

BanglaBook.org

তাঁর নির্দেশে কয়েকটি জিলায় হিন্দু মুসলমান কৃষকরা জমিদারদের বেআইনী কর দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফরিদপুর, খুলনা, বিক্রমপুর, চব্বিশ পরগণায় বহু গ্রামে ফরাজী কৃষকরা ইংরেজ শাসনকে অমান্য করে নিজস্ব স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন। জনসাধারণের নিজস্ব সরকার, বিচারালয়, পুলিশ ও দেশীয় অস্ত্রে সুসজ্জিত ফৌজ ছিল।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ১৮৩৮ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে কয়েকবার জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষক জনগণ অস্ত্র ধারণ করেছিল। তাঁরা জমিদারের বাড়ি ও নীলকুঠি লুট করেছিল। এজন্য সরকার দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে মামলা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর এত জনপ্রিয়তা ছিল যে, কেউই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজি হয় নি। ফলে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে এই আশঙ্কায় ইংরেজ শাসকরা দুদু মিয়াকে বন্দি করে রেখেছিল।

১৮৬২ সালে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অবর্তমানে এই আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়ার মতো উপযুক্ত নেতৃত্ব ছিল না। ইংরেজ শাসক ও জমিদাররা ফরাজি ঘাঁটিগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

ফরাজী আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় রং থাকলেও মূলত তা ছিল জমিদার বিরোধী ও ইংরেজ শাসন বিরোধী কৃষকের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম একাধারে ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম, অপরদিকে তা ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম।

এই ভাবেই প্রায় দুইশত বৎসর ধরে হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত জঙ্গি সশস্ত্র সংগ্রামই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পটভূমি তৈরি করেছিল।

তিতুমীরের ও ফরাজী আন্দোলনের মহান সংগ্রাম আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে থাকবে। কিন্তু একই সঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উভয় আন্দোলনের মধ্যেই ধর্মীয় সমাজ সংস্কারের নামে বহু বছর ধরে চলে আসা লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করার প্রবণতা ছিল। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল সমাজে। যেমন ওয়াহাবি নেতা তিতুমীর প্রচার করেন যে আরবদেশের মুসলমানদের মতো ইসলামী ধরণের নাম রাখতে হবে, সন্তানের জন্য আকিকা করতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, গোঁফ ছোটো করে কাটতে হবে ইত্যাদি, তা না করলে পাপ হবে, আল্লাহ শাস্তি দেবেন। তবে তিনি দাবি করেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং অমুসলিমানদের

সঙ্গে ধর্মীয় ব্যবধানের কারণে অহেতুক বিবাদ করা আল্লাহ-রাসুল পছন্দ করেন না।

ফরায়জি আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছেদ, সাংস্কৃতিক উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুদের থেকে পার্থক্য সৃষ্টি এবং এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধ তৈরির প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। যেমন দাবি করা হয়েছিল ধুতি নাকি হিন্দুদের পোশাক। আগে নবান্নের সময় হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে উৎসব করত, কট্টর মুসলমানপন্থীরা বলল, এটা হারাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ নয়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ

(নিচের পরিচ্ছেদটি সামান্য সংশোধন ও সংযোজনসহ লেখকের লেখা *"রবীন্দ্রনাথ—শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে"* গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ থেকে নেয়া হয়েছে)

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে একটা জাগরণ দেখা গিয়েছিল। তাকে অনেক সময় রেনেসা বলা হয়ে থাকে। তবে রেনেসা কথাটি নিয়েও বিতর্ক আছে। যাই হোক, যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা সামাজিক জাগরণ যে দেখা দিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই জাগরণের ঐতিহাসিক তৎপর্য ছিল বিরাট। আমরা সেই জাগরণ ও তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল লুণ্ঠন ও শোষণ। কিন্তু শাসনের প্রয়োজনই তারা এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বের দুইটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার প্রবর্তন, (২) ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন। একদিকে জমিদারী ব্যবস্থার কারণে তৈরি হয়েছিল কোলকাতা কেন্দ্রীক এক উৎকট বাবু কালচার। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার কারণে এক নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় যারা এক নব জাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

ইংরেজ শাসন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ইংরেজ শাসনের প্রায় প্রথম দিক থেকেই। তার মধ্যে কয়েকটি বিদ্রোহ সশস্ত্র রূপ ধারণ করেছিল। প্রথম দিকের বিদ্রোহের মধ্যে চোয়ার বিদ্রোহ (১৭৯৯ সাল, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বীরভূম) এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (সমগ্র উত্তরবঙ্গজুড়ে বিস্তৃত এবং ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল চল্লিশ বৎসর ধরে স্থায়ী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (ময়মনসিংহের শেরপুরে, ১৮৩৩), তিতুমীরের

BanglaBook.org

সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৮৩১ সাল, কলকাতার নিকটে), ফরাজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল মার্কসের ভাষায়, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। মহাবিদ্রোহের পরবর্তী যুগে সশস্ত্র সংগ্রাম তেমন একটা না হলেও কৃষক অভ্যুত্থান একাধিক হয়েছে। তার মধ্যে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহাবিদ্রোহ, সশস্ত্র কৃষক ও প্রজার সংগ্রাম অথবা পরবর্তীতে কৃষক অভ্যুত্থানসমূহ ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম।

একদিকে গ্রাম বাংলা জুড়ে কৃষক ও নিঃস্ব মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, অপরদিকে কোলকাতাকেন্দ্রিক এক নতুন উৎপাদনবিমুখ উৎকট ধনিকগোষ্ঠীর উদ্ভব। গ্রামেও ছিল জমিদারের নিচে একদল সামন্তশ্রেণী পত্তনিদার, গাতিদার, তালুকদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী ক্ষুদে জমিদার। আর ছিল জমিদারদের নায়েব প্রমুখ কর্মচারী, যারা মধ্যবিত্ত হলেও সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আরও ছিল মহাজনশ্রেণী, সামন্তশ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। মোগল যুগেও সামন্তব্যবস্থা ছিল; কিন্তু অন্য ধরনের। বংশানুক্রমিক জমিদার ছিল না, ছিল রাজা বা সম্রাট কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর সংগ্রহকারক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক ও প্রজারা স্থায়ীভাবে জমির ওপর অধিকার হারিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে নতুন সামন্তশ্রেণী তৈরি হলো।

জমিদারদের বেশির ভাগ বাস করত কোলকাতায় এবং তারা বিশ্রী ধরনের বিলাসী জীবন যাপন করত। ঠিকমতো ও সময়মতো রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে তাদের অনেকে জমিদারী হারিয়েছিল। সেই জমিদারী কিনেছিল কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ধনিক গোষ্ঠী। কোম্পানীর এজেন্ট হিসেবে একদল নব্য ধনী তৈরি হয়েছিল, যাদেরকে বলা হতো মুৎসুদ্দি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ এমনই মুৎসুদ্দি ছিলেন। পঞ্চানন ঠাকুর থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) পর্যন্ত সকলেই কোম্পানীর অর্থনৈতিক এজেন্ট ছিলেন। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর জমিদারী ক্রয় করে জমিদার হয়ে বসেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি নীলের কারখানা, চিনির কল, রেশম ব্যবসা এই ধরনের শিল্প ও ব্যবসায়ী উদ্যোগও নিয়েছিলেন।

কোলকাতায় অবস্থিত সামন্ত ও মুৎসুদ্দিরা চরম ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন কাটাত। ইংরেজদের রাজধানী কোলকাতায় এই নব্য ধনিক গোষ্ঠী

BanglaBook.org

যে উৎকট ধরনের কালচার তৈরি করে, তা সাধারণত বাবু কালচার নামে পরিচিত। বাইজি নাচ, পতিতালয় গমন, মোরগ লড়াই ইত্যাদি ছিল সেই সময়ের বাবু কালচারের বৈশিষ্ট্য।

তবে একই সময় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল, যারা ছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। পেশাগতভাবে এরা ছিলেন সরকারের ও কোম্পানীর চাকুরে। তাছাড়া কিছু লোক ওকালতি, শিক্ষকতা, ছোটোখাটো ব্যবসা—এইসবও করতেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জমিদারদের এবং মুৎসুদ্দিদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত তারা সকলেই ইংরেজ শাসনের সহযোগিতা করেছেন। অন্যদিকে মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার কারণে মুসলমানরা প্রথম থেকেই ইংরেজের প্রতি বিরূপ ছিল। তারা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করেছিল। কিন্তু হিন্দু মধ্যবিত্তরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এগিয়ে রইল শুধু তাই-ই নয়, একই সঙ্গে তারা পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানেরও সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল। এইভাবে পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, যারা হিন্দু সমাজ জীবনে সংস্কার এনেছিলেন এবং প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কয়েকজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভারও জন্ম হয়েছিল, যারা সমাজ সংস্কৃতিকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং একই সঙ্গে বাংলা ভাষারও সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা গদ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও ঘটেছিল এক মহান উল্লম্ফন। সমাজ ও প্রগতির সেই ধারায় তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রপ্রতিভা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা বাঙালি বা ভারতীয় জনগণকে উন্নত করার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না ইংরেজ শাসকদের। স্বীয় প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তারা ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেছিল। ফলে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজ কুশাসনেরই একটি পরোক্ষ সুফল ছিল। এর আগে মোগল যুগে শিক্ষা বলতে ছিল টোল আর মাদ্রাসা। জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক দিয়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারেই ছিল।

১৮০০ সালে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে আসা কর্মচারীদের এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সামান্য পরিচিত করার প্রয়োজনে। কোলকাতা, শ্রীরামপুর, চুচুড়া প্রভৃতি স্থানে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮১৭

BanglaBook.org

সালে রাজা রামমোহন রায় ও তার সহকর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতায় হিন্দু কলেজ। মুসলমানদের অবশ্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার অধিকার ছিল না। প্রথম দিকে হিন্দুদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাদে অন্য বর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার ছিল না। পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু মাত্রই সকল ছাত্রের প্রবেশাধিকার হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা তখনো বাইরে রয়ে গেল। এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যও পড়ানো হতো।

ভারতবর্ষে কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যায়, তা নিয়ে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। যেমন ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা প্রচলনের পক্ষে। অন্যদিকে মেকেলে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার ফলে এই দেশের কিছু তরুণ পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস, উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও বস্তুবাদী দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। বেকনের দর্শন ও টমাস পেনের *এজ অব রিজন* বইটি এই আলোকপ্রাপ্ত তরুণরা আগ্রহভরে পড়তেন। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তাদের অন্যতম। এই সবই ছিল ইংরেজি শিক্ষার সুফল, যা সৃষ্টি করেছিল নবজাগরণ। তবে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের প্রয়োজনে একদল কেরানি তৈরি করা। ইংরেজি শিক্ষার প্রধান সমর্থক মেকেলের ভাষায়,

"আমাদের এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে, যারা হবে আমাদের এবং আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানকারী। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয়, আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।"

তবে সেই সময় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। রামমোহন শিক্ষা কোর্সে বেকন প্রমুখের দার্শনিক রচনা এবং গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান রাখার জন্য লর্ড আমহার্স্টের কাছে চিঠি লিখে সুপারিশ করেছিলেন (১৮২৩ সাল, ১১ই ডিসেম্বর)। বিদ্যাসাগর

BanglaBook.org

সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচিতে বার্কলের সাবেকী ভাববাদী দর্শনের বিরোধিতা করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকেই উনবিংশ শতাব্দীতে রেলওয়ের পাশাপাশি এসেছিল মুদ্রণযন্ত্র। প্রথমে ইংরেজিতে, পরে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালের দিকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতো ৪৭৪টি সংবাদপত্র। যে বৎসর মহান সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল, তার পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল দিক বিবেচনা করলে এবং মোগল যুগের সঙ্গে তুলনা করলে এটা অনস্বীকার্য যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। চিন্তা চেতনায় এসেছিল বুর্জোয়া উদারনৈতিক ভাবধারা, যদিও তখনো বাঙালি বা ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই নবজাগরণ অবশ্য কোলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নবগঠিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু সমাজে প্রগতিশীল সংস্কার এনেছিলেন।

যে সকল মহান পুরুষ উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তা চেতনায়, সাহিত্যে অথবা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে বিশাল অবদান রেখেছিলেন বয়জ্যেষ্ঠতা অনুসারে তাদের নাম নিচে উল্লেখিত হলো–

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)
দ্বারকানাথ ঠাকুর [রবীন্দ্রনাথের পিতামহ] (১৭৯৪-১৮৪৬)
হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও [Henri Louis Vivian Derozio] (১৮০৯-১৮৩১)
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [রবীন্দ্রনাথের পিতা] (১৮১৭-১৯০৫)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)
অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)
কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)
মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

BanglaBook.org

রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম আধুনিক ভারতীয়। এক ক্ষুদ্র জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী রামমোহন রায় ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় সুশিক্ষিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি কোনো রাজা ছিলেন না। রাজা ছিল উপাধি মাত্র। তিনি ইউরোপীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সেই সময় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রচার আন্দোলন শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে ইংরেজ সরকারকে দিয়ে সতীদাহ প্রথা বাতিল করাতে সক্ষম হন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল একটি খুবই বড়ো অবদান। মুসলমান শাসকরা সতীদাহ সমর্থন না করলেও তারা রাজ্য শাসনের স্বার্থে হিন্দুধর্মীয় আচারে হাত দিতে চায়নি। আওরঙ্গজেবের সময় ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ারের মতে, মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে হাত না দিয়ে অন্যভাবে এই প্রথা বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন। তার বিবরণে পাওয়া যায় যে, এই প্রথা হিন্দু রাজ্যে বেশি ছিল। ইংরেজ শাসকরাও এই বর্বর প্রথা রহিত করতে দ্বিধান্বিত ছিল। সেখানে লর্ড বেন্টিকের ভূমিকা এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রচার, হিন্দু শাস্ত্রনির্ভর যুক্তি ইত্যাদির কারণে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলো।

তিনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। অর্থাৎ তিনি সামন্ত প্রথাসমূহকে আঘাত করেছিলেন। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামন্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ছিলেন। তিনি ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ছিলেন। প্রথমত, তিনি হয়তো বিশ্বাস করতেন না যে, ব্রিটিশকে বিতাড়িত করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ইংরেজের মাধ্যমে যে পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান এ দেশে এসেছিল, তাকে কল্যাণকর মনে করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই ধরনের যুগস্রষ্টা মহাপুরুষদের মধ্যে এই রকম স্ববিরোধিতা দেখা যাবে। লিবারেল জমিদার রামমোহনকে বলা যেতে পারে ভারতের লিবারেল বুর্জোয়া ধারার প্রবর্তক। আমরা দেখব, পরবর্তীতেও ভারতের ইতিহাসে লিবারেল বুর্জোয়াদের প্রাধান্য থেকে গিয়েছিল এবং তাদের চিন্তা ও কাজকর্মে যে স্ববিরোধিতা ছিল, তার জন্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনকেও অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

রামমোহন রায় হিন্দুধর্মেরও প্রগতিশীল সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এমনকি পৌত্তলিকার বিরুদ্ধেও অবস্থান নিয়েছিলেন। সেজন্য

BanglaBook.org

তিনি রক্ষণশীল হিন্দু পন্ডিতদের তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েন। বেদান্ত ও উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করে তিনি ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন। সেই বৎসরই অনেক বেশি যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী ডিরোজিও স্থাপন করেছিলেন 'একাডেমিক সভা'। আর তার পরের বৎসর (১৮২৯) রক্ষণশীল হিন্দু নেতা রাধাকান্ত দেব প্রতিষ্ঠা করলেন 'ধর্মসভা'। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সামাজিক ও চেতনাগত ধারার মধ্যে যে লড়াই জমে উঠেছিল, তা বেশ লক্ষ্য করার মতো। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর সরাসরি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না করলেও তিনি রামমোহনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আর ১৮৪৩ সালে রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মীয়-পরিজনসহ 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম' বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের জোড়াসাঁকো ছিল ব্রাহ্মধর্মের কেন্দ্র।

রামমোহনের পরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বাহক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিলেন পর্তুগিজ পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ও তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। ডিরোজিও নাস্তিক ছিলেন। নাস্তিকতার অভিযোগে তাকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপকের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল (১৮৩১ সালে)। ডিরোজিওপন্থীরা বস্তুবাদী দর্শন প্রচার করতেন। তারা হিন্দুদের পূজাকে যেমন সমালোচনা করতেন, তেমনি খ্রিষ্টান পাদ্রিদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও বক্তব্য রাখতেন। তারা ইউরোপীয় পাদ্রিদের ইউরোপীয় ব্রাহ্মণ বলে ঠাট্টা করতেন। ডিরোজিওপন্থী হেয়ার স্কুলের শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পরকাল বলে কিছু নাই। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্ত্রী-পুরুষের সমতার পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলেছেন, আমি গঙ্গা মানি না। ডিরোজিওপন্থীরা দাস ব্যবসা, ভারতীয় কুলিদের দিয়ে বেগার খাটানো ইত্যাদিরও বিরোধিতা করতেন। ডিরোজিও ও ডিরোজিওপন্থীরা পরাধীনতার গ্লানি তুলে ধরেছেন, তবে সরাসরি স্বাধীনতার কথা বলেননি। অথবা গা বাঁচিয়ে সাবধানে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করতেন। শোনা যায়, ডিরোজিওপন্থী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নাকি সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে সেটাও প্রকাশ্যে নয়। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও সমালোচনা করেছিলেন। তবে তিনিই আবার পরে ইংরেজ শাসকদের দ্বারা 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তা হলে ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেও স্ববিরোধিতা দেখা যায়।

BanglaBook.org

যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীতে ডিরোজিওপন্থীরা ছিলেন সামাজিক চিন্তাভাবনা ও দার্শনিক দিক দিয়ে সবচেয়ে অগ্রসর। তারা ছিলেন তুলনামূলকভাবে অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি বামঘেঁষা। কিন্তু ডিরোজিওদের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তেমন একটা পড়েনি। বরং একদিকে উদারনৈতিক এবং প্রয়োজনে কিছুটা আপোসমুখী রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ঐতিহ্যের সঙ্গে রক্ষণশীলদের ও হিন্দু পুনর্জীবনবাদী মতবাদের দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত সংঘাতই ছিল গোটা উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দার্শনিক বিকাশধারার সাধারণ চিত্র।

রামমোহন ও ডিরোজিওর পরে যে মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন (১৮২৯)। আর তার ২৭ বছর পর ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের নিরলস সংগ্রাম ও তৎপরতার কারণে হিন্দুদের বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহৎ প্রাণের মানুষ ছিলেন। তিনি আইন পাস করিয়েই কর্তব্য সম্পন্ন করেন নাই। নিজের ছেলের সঙ্গে বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের অর্থ ব্যয় করে বহু বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসার ও নারী শিক্ষার বিষয়ে তার প্রচেষ্টা ছিল। বিদ্যাসাগর সম্ভবত নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু বাস্তববাদী হিসেবে তিনি নাস্তিকতার প্রচার করেননি। বরং শাস্ত্রে সুপন্ডিত বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তার বাড়িতে কখনও পুজো হয়নি। তার লেখা প্রার্থনা কবিতা বা শিশুদের জন্য রচিত বইয়ে কোথাও ভগবানের উল্লেখ পর্যন্ত নাই। হিন্দু পুনর্জীবনবাদী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। বিধবা বিবাহের পক্ষে যে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন সেই প্রসঙ্গ টেনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই পাড়া কপটতা।"

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করেন। এর আগে রামমোহন রায় বাংলায় গদ্য লিখেছেন। কিন্তু তা সাহিত্য হয়ে ওঠেনি এবং ঐ লেখায় কোনো যতিচিহ্ন ছিল না। বিদ্যাসাগরই প্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণও লিখেছিলেন। বাংলাভাষা সাহিত্যেও বিদ্যাসাগরের অবদান বিরাট।

BanglaBook.org

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক ছিলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মনে মনে নাস্তিক হলেও এবং কোনো ধর্মীয় আচরণ না করলেও প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম ত্যাগও করেননি। আবার প্রয়োজনে শাস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন অবশ্যই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান এবং এমন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, যার তুলনা বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। তিনি সামান্যতম দ্বিধা না করে একই সঙ্গে পৈত্রিক জমিদারী ও পৈত্রিক ধর্ম (হিন্দুধর্ম) ত্যাগ করেছিলেন। বিদেশি খ্রিষ্টান মহিলাকে বিয়ে করার প্রয়োজনে তিনি খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও সেই ধর্মেও যে তার আস্থা ছিল না, সেই ব্যাপারটিও গোপন তিনি রাখতেন না। তিনি শুধু প্রতিভাই নন, তিনি ছিলেন সাহসী ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সবরকম সামন্ত দোষ থেকে মুক্ত সামন্তপ্রভাব বলয় থেকে ছিটকে আসা উদারনৈতিক মধ্যবিত্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। পরাধীনতার জ্বালা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি তার মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। মাইকেলই আক্ষেপ করে বলেছেন, "পরাধীন, হা বিধতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে।"

তার অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য'। রামের বিপরীতে রাবণকে নায়ক বানিয়ে মহাকাব্য রচনা একটি বিরাট রকমের পদক্ষেপ বৈকি, যার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যও ছিল বিরাট। মাইকেলের অসামান্য কাব্য রচনা ছাড়াও অন্য ধরনের দুইটি রচনার কথা উল্লেখ করা যায়।

'একেই বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রো' (১৮৬০)। এই দুইটি ব্যঙ্গ রসাত্মক রচনায় মাইকেল তদানীন্তন কোলকাতার বাবু কালচার, সামন্তবাদী সংস্কৃতি ও প্রথাকে নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মাইকেলের এই রচনা (একেই বলে সভ্যতা) প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন–

প্যারীচাঁদ চিন্তিত 'জাত' নিয়ে, ওদিকে মাইকেলের যেহেতু 'জাত' নেই, বিজাতীয় যেহেতু তিনি, তাই তার উদ্বেগ জাত নয়, 'সভ্যতা' নিয়ে। একজনের মুখ যদি হয় সামন্তবাদের দিকে, তবে অন্যজনের মুখ পুঁজিবাদ মুখো। আর এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বোধ করি প্যারীচাঁদ যেখানে জমিদারদের প্রতি বিলক্ষণ পক্ষপাত

BanglaBook.org

প্রদর্শন করেন, মাইকেল সেখানে--তার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) স্মরণীয়–জমিদারদের দুর্দশার সংবাদে উল্লসিত হন।

[উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ]

সেই সময়ের আরেক ব্যক্তিত্ব অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার পৌঁছেছিলেন বস্তুবাদের বেশ কাছাকাছি। তাই শেষ জীবনে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলন ত্যাগ করে অজ্ঞেয়বাদী হয়ে ওঠেন। তিনি সকল প্রকার ধর্মীয় প্রার্থনাকে বাতিল করেছিলেন তার দ্বারা সৃষ্ট এক গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে। সমীকরণটি এই রকম :

পরিশ্রম = শস্য
প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
অতএব প্রার্থনা = শূন্য

তবে রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতোই সংস্কারপন্থী ছিলেন।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বেদান্ত উপনিষদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বস্তুবাদ থেকে বহুদূরে ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ খানিকটা রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মণদের পৈতা ত্যাগ করার বিরোধী ছিলেন। বস্তুবাদী ও উদারনৈতিক বিদ্যাসাগর তাই দেবেন্দ্রনাথের বহু মতকে পছন্দ করতেন না। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে যে চিন্তার মৌলিক পার্থক্য ছিল এ কথা দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,

"আমি কোথায় আর তিনি (অক্ষয়কুমার দত্ত) কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন যাহা বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ, আকাশ পাতাল প্রভেদ।"

দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যেই কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ দাঁড়িয়েছিল, যারা জাতিভেদ মানতেন না, পৈতা পরার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংশ্রব না রাখার কথা বলতেন। একদিক দিয়ে তারা প্রগতিশীল ছিলেন। কেশবচন্দ্র আবার স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে হলেও স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না। সেই যুগে ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে রাজপথে একাকী তো দূরের কথা, পুরুষের সঙ্গেও বের হতো না। দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত

BanglaBook.org

তত্ত্ববোধনী পত্রিকা লিখেছে, 'বাংলার স্ত্রী জাতির কলেজী উপাধি পাওয়াকে বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির নিদর্শন মনে করে না।" ১৮৬৮ সালেও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে মাত্র ৩০টির বেশি ছাত্রী পাওয়া যায়নি।

মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা তো আরও পরের কথা। বিংশ শতাব্দীতেই মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া প্রথম মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি প্রসঙ্গে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল মহান ও বিপ্লবী।

কেশবচন্দ্র শুধু যে স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন তাই-ই নয়, তিনি ছিলেন ব্রিটিশরাজের অনুগত। ব্রিটিশরাজ ও ভারত সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে অঙ্গীভূত করেছিলেন। নবীনরা এর বিরোধিতা করেছিলেন। এই নবীনদের নেতা ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি বরং ব্রিটিশবিরোধী অগ্নিমন্ত্রে তার শিষ্যদের দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে বিশ্বাসী হলেও গরিব শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রমজীবীদের জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি গানও রচনা করেছিলেন। (১৮৭৪ সালে *ভারতের শ্রমজীবী* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।)

বিদ্যাসাগর মাইকেলের পরবর্তী প্রজন্মে এলেন আরেক প্রতিভাবান পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস রচয়িতা, যাকে সঙ্গতভাবেই বলা হতো সাহিত্যসম্রাট। বঙ্কিমের জীবনে দুইটি অংশ আছে। পাশ্চাত্যের আলোকপ্রাপ্তির যুগের প্রভাব পড়েছিল বঙ্কিমের প্রথম জীবনে। তিনি এক ধরনের উদারনৈতিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনকি 'সোসালিজমে'র ধ্যান-ধারণাও তার মধ্যে দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। পরে আবার তিনিই লিখেছেন (*ধর্মতত্ত্ব* গ্রন্থে), "সাম্য কি সম্ভব? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যদান করিতে পারে?" এরপর তিনি প্রসব করানো ও স্তন্যদান করানোকেই স্ত্রী জাতির একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। একদা জমিদারদের তিনি বিদ্রুপবানে জর্জরিত করেছিলেন। তার রচনা *সাম্য* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তীকালে তিনি এই বই আর ছাপাননি, বইটির জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও। এমনকি এই রচনার অনেক কিছু ভুল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক বলে বহুল পরিচিত সেই বঙ্কিম কিন্তু এক সময় অসাম্প্রদায়িকতার প্রচার করেছিলেন। তিনিই লিখেছিলেন,

BanglaBook.org

"বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে।...বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।"

তবে এটাও সত্য যে, পরবর্তী জীবনে তিনি বিভিন্ন রচনায় ও উপন্যাসে মুসলিম বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব তুলে ধরেছেন। হিন্দু পুনর্জীবনবাদী দর্শনের তিনি ছিলেন প্রধান নায়ক। সরকারি আমলা ডেপুটি বঙ্কিম ব্রিটিশরাজের প্রশংসা করেছেন, জাতীয়তাবাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন প্রতিবেশী মুসলমানকে। তিনি জমিদারী প্রথারও সমর্থনে লিখেছেন। এক কথায় পরবর্তীকালে বঙ্কিমের ভূমিকা ছিল রক্ষণশীল, যা প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তা করেছে।

বঙ্কিমের সমসাময়িক আরও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেই হয়।

ডিরোজিওর মতোই স্বল্পায়ু কালীপ্রসন্ন সিংহ মাত্র তিরিশ বছরের জীবনে সামন্ত সমাজ ও কোলকাতাকেন্দ্রিক বাবু কালচারের তীব্র সমালোচনা করে উদার বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন। যদিও জন্ম তার জমিদার পরিবারে এবং কোলকাতার বাবু কালচারের পরিবেশের মধ্যে। কোলকাতার এই নব্য ধনীদের উৎকট কুৎসিত জীবনের ছবি এঁকেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (*হুতুম পেঁচার নকসা*)। যে সময় অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের ওই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়, যদিও তা প্রকাশ্য ছিল না। তিনি পৌত্তলিকতারও বিরোধী ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে দুইজন শ্রেণী বিষয় ভিত্তিক নাটক লিখেছেন। মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন *জমিদার দর্পণ* এবং দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন *নীলদর্পণ*। সেই সময় মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের কারণে পিছিয়ে ছিল। মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী পুরুষ। সেই সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই জমিদারী প্রথার পক্ষে ছিলেন। সেখানে মীর মশাররফ হোসেনের এই নাটক জমিদার শ্রেণীকে প্রচন্ড জোরে আঘাত করেছে। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার শ্রেণীকে আক্রমণ করেছেন। জমিদারদের অত্যাচারের পাশাপাশি ইংরেজ জজ, ইংরেজ ডাক্তার আর ইংরেজ ব্যারিস্টারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধর জমিদারদের জানোয়ার রূপে চিত্রিত করছে,

BanglaBook.org

"আচ্ছা মফস্বলে এক রকমের জানোয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে। শহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর।...শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ-জানোয়ার বড়ো শান্ত, বড়ো ধীর, বড়ো নম্র; হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, মনে দ্বিধা নেই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শকুর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি জানোয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে বাঘ হয়ে বসে।"

নাট্যকার আরও লিখেছেন, *"এই জানোয়ারেরা (অর্থাৎ জমিদাররা) আবার দুই দল, যেমন হিন্দু আর মুসলমান।"*

এমন সোজাসুজি, এমন সাহসের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে আর কেউ জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণী ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করেননি। এটা লক্ষণীয় যে, সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম ও কৃষক অভ্যুত্থানের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মহান ব্যক্তিদের অধিকাংশের বিরূপ মনোভাব থাকলেও সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে সংগঠিত নীলকরের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম তাদের অনেকেরই সমর্থন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এর একটি কারণ হয়তো এই যে, নীলকরদের অত্যাচারকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়েছে। নীলকর আর জমিদার এক নয়। নীলকরদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ছবি ফুটে উঠেছে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটকে। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, *জমিদার দর্পণ* ও *নীলদর্পণ* উভয় নাটকেই শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরাজের দয়াভিক্ষা কামনা করা হয়েছে। খুব সম্ভবত রাজরোষ এড়িয়ে চলার কৌশল হিসেবে এটা করা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র আবার সরকারের আমলা ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দুই নাটকের কোনোটিই পছন্দ করেননি। ১৮৭৩ সালে বঙ্কিম তার পত্রিকা *বঙ্গ দর্শনে নীল দর্পণের* সমাজচেতনাকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি পাবনার জমিদারবিরোধী কৃষক বিদ্রোহের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন এবং মীর মশাররফ হোসেনের *জমিদার দর্পণকে* 'জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়া নিষ্প্রয়োজন' বিবেচনায় নাটকটি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করছিলেন। এখানে বঙ্কিম কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মীর মোশাররফের বিরুদ্ধে যাননি, কারণ, ইতিপূর্বে এই বঙ্কিমই মীর মোশাররফের 'গৌরী সেতু' কাব্যের প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিম এখানে সামন্ত শ্রেণী চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন।

BanglaBook.org

নীলদর্পণ নাটকটি তখন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৭২ সালে স্থাপিত জাতীয় নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়েছিল *নীল দর্পণ*। *নীল দর্পণে*র বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল । নীল বিদ্রোহ এবং তার ওপর ভিত্তি করে রচিত *নীল দর্পণ* সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। লোকের মুখে মুখে ছিল 'বিদ্যাভূনী'র (ছদ্মনামে লেখা, কবির আসল নাম কখনও জানা যায়নি) স্বদেশী গান–

'নীল বাদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মলো, লঙ-এর হলো কারাগার
প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার।'

নীলদর্পণ নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু নিজের নাম গোপন রাখেন। ইংরেজি পাদ্রি লং নিজেকে অনুবাদক বলে ঘোষণা করেছিলেন। এজন্য নীলকর দ্বারা দায়েরকৃত মামলায় তার এক মাসের জেল হয়েছিল এবং এক হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেই জরিমানার টাকাটা দিয়ে দিয়েছিলেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক। তিনি নীল বিদ্রোহের সপক্ষে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন। নীলকর সাহেবরা তার বিরুদ্ধেও মামলা করেছিল। কিন্তু তার আগেই তার মৃত্যু হয়।

স্বল্পায়ু হরিশচন্দ্র ছিলেন সেই সময়ের হিসেবে এক ব্যতিক্রমী মানুষ। তিনি ছিলেন সাহসী পুরুষ এবং সাধারণ মানুষের পক্ষের লোক। তিনি যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তা-ও তার দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকার লেখা থেকে বোঝা যায়। তিনি বারবার বলেছেন যে, মিউটিনি শিক্ষা দিচ্ছে যে, ভারতীয়দের ব্যাপার মীমাংসার দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতেই ছেড়ে দেওয়া দরকার।

অথচ সেই সময় প্রায় সকল বুদ্ধিজীবীই সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করে ইংরেজ শাসনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কেউ কেউ একেবারে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও অসীম রাজভক্তি দেখিয়েছেন। যেমন কবি ঈশ্বরগুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করে লিখলেন :

"কেবলি মর্জি তেড়া কাজে ভেড়া মাথা যত
নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত।"

BanglaBook.org

ঈশ্বরগুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক নানা সাহেব ঝাঁসির রানি সম্পর্কেও বাজে মন্তব্য করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবে এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে যে নব সামাজিক জাগরণ দেখা গিয়েছিল, প্রথম থেকেই তার মধ্যে বেশ দুর্বলতা ছিল। যেমন–

১. ধর্ম সংস্কার হলেও ঈশ্বরমুখীনতা এবং প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ফিরে যাবার প্রবণতা ছিল।
২. এই সামাজিক আন্দোলনের বাইরে ছিল বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠী।
৩. এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল রক্ষণশীলতার সঙ্গে আপোস প্রবণতা।
৪. ইংরেজ শাসনের প্রতি দুর্বলতা।
৫. জমিদারী প্রথার প্রতি সমর্থন।
৬. এই সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতারা কৃষক অভ্যুত্থানের বিরোধী ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে প্রগতিশীল ধারার সূচনা হয়েছিল, একটা পর্যায়ে তা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিণতি লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রধান পুরুষ।

১৮৬৭ সালে 'হিন্দু মেলা' নামে একটি স্বদেশী ভাবোদ্দীপক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'হিন্দু' শব্দটি দ্বারাই বোঝা যায় যে, এই স্বদেশী ভাবধারা বা আন্দোলন কতটা খণ্ডিত ছিল। প্রধানত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতারা এর উদ্যোক্তা ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের লোকজনও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

হিন্দু পুনর্জাগরণের এই পর্বে যে মুসলমানের কোনো অংশ থাকবে না, এটা তো স্বাভাবিক। সেই সময় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনো কোনো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি সংগঠনের নাম থেকে হিন্দু শব্দটি বাদ দেবার পক্ষে ছিলেন। তার জবাবেই বোধকরি হিন্দু মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র বললেন (১৮৭২ সাল), আমরা বুঝতে পারছি না কেন কিছু ব্যক্তি হিন্দু নামে এত আপত্তি করছেন, হিন্দুরাই একটা জাতির রূপ

BanglaBook.org

নিয়েছে এবং তাদের গঠিত সমাজই জাতীয় সমাজ বা সভা অবশ্যই হতে পারে।" হিন্দু মেলার অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজকে সংস্কার করে সামনে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবার দেখা গেল পশ্চাৎমুখী প্রবণতা। যেমন, ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ হাইকোর্ট ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার পক্ষে স্বামীর সম্পত্তি লাভের রায় দিলে হিন্দু মেলার কর্তাব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। রাজনারায়ণ বসু হিন্দু নারীর সতীত্বের পক্ষে বিশাল গুণগান গাইলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হতাশা ব্যক্ত করে বললেন যে, সতীত্বের মতো একটা ভালো রীতিও এখন চলে যাবার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিধবার সম্পত্তি পাবার বিরুদ্ধে (সতীত্ব রক্ষার নামে) তারা আদালতে আপিল পর্যন্ত করেছিলেন।

তবে এই সময়েও ব্যতিক্রম আছে। তৎকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এমন মানুষও আছেন। যেমন আর্য দর্শনের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ভারতবর্ষ গড়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। হিন্দু পুনর্জাগরণী প্রবাহ যখন প্রবল তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৭৭ সালে লিখলেন,

"হিন্দু সমাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার ঠিকানা হয় না। ইহার বনিয়াদ অতি সংকীর্ণ মনুর সংহিতায় দেখিতে পাই।...ভারতের অর্ধেক মুস লমান হইয়াছে। ইংরেজরা সর্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে; হিন্দু সমাজের জাঁকটুকু ছাড়া আর কি বা আছে? এখনো কি না আমরা হিন্দু সমাজকে ভারত সমাজের সঙ্গে এক করিয়া ধরি। কী ভুল। এমন হিন্দু সমাজের যত শীঘ্র সম্ভব বিলোপ হয়, ততোই ভালো।"

[১৮৭৭ সালে বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'সমাজ পরিবর্তন কয়' শীর্ষক প্রবন্ধ]

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ দশ

সিপাহী অভ্যুত্থান ১৮৫৭
ফিরে দেখা: দেড়শ বছর পেছনে

এক

পুরানো ঢাকার নবাবপুর রোডের শেষ মাথায় বায়ে ঘুরলে লক্ষ্মী বাজার, সোজা গেলে বাংলা বাজার, সেখানে স্বল্প পরিসর যে জায়গাটি বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত, তা দেড়শ বছরের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিদ্রোহী সিপাহীদের ওখানে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। আগে ঐ পার্কটির নাম ছিল ভিক্টরিয়া পার্ক, বৃটেনের রানির নামানুসারে। বৃটিশ শাসকরা ঐ নাম দিয়েছিল। পরে নাম বদলিয়ে রাখা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক, শেষ মোগল সম্রাটের নামানুসারে, যাকে বিপ্লবী সিপাহীরা সারা ভারতের সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন। নতুন নামকরণটি তাই যথাযথ হয়েছিল।

বাংলাসহ ভারতের বহু স্থানেই বৃটিশ শাসকদের চরম বর্বরতা ও প্রতিহিংসার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ১৮৫৭ সালে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশ বছর পর ভারতীয় সিপহীরা বিদ্রোহ করেছিলেন দখলদার বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে। প্রথমদিকে অনেকটা বিজয়ী হয়েও, শেষে পরাজয় বরণ করেছিলেন। পরাজয় সত্ত্বেও ভারতীয় সিপাহী ও জনগণের এই যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ তা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। পাশাপাশি বৃটিশ শাসকদের নৃশংস বর্বরতার চিত্রও তুলে ধরেছে। অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতা ও বর্বরতার ঘটনা এর আগে ও পরেও অনেক আছে। একইভাবে জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসও ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে অনেক আছে। এক কথায় বৃটিশ শাসনের

BanglaBook.org

দুইশ বছরের ইতিহাস হলো একদিকে জনগণের সহসী সংগ্রামের ঘটনায় ভরপুর, অন্যদিকে এই ইতিহাস হলো সঘোষিত সভ্য ইংরেজদের চরম অসভ্যতা, বর্বরতা ও নৃসংশতার ইতিহাস।

পলাশীর যুদ্ধ থেকে আমাদের পরাধীনতার যুগ শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই 'বণিকের মানদণ্ড' পরিণত হয়েছিল 'শাসকের রাজদণ্ডে'। প্রথমে বাংলা এসেছিল ইংরেজদের দখলে। তারপর ক্রমে ক্রমে সারা ভারত তাদের দখলে চলে যায়। ১৮৫৭ সালেও মোগল সম্রাট ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে। শেষ মোগল সম্রাট– বাহাদুর শাহ। তবে তাকে সম্রাট না বলাই ভালো। তার শাসন ক্ষমতা দিল্লীর লাল কেল্লার বাইরে খুব একটা কার্যকর ছিল না। কার্যত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রায় পুরো ভারতটাই দখল করে নিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এই শাসনভার সরাসরি বৃটেনের রাজকীয় সরকার নিজ হাতে তুলে নিয়েছিল।

পলাশীর মাঠে সিরাজউদ্দৌলা'র পরাজয়ের তাৎপর্য সেদিন ভারতবাসী বুঝতে পারেনি। এবং সেই কারণেই ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে যুদ্ধে বিজয় এত সহজ হয়েছিল। ভারতবর্ষ সুপ্রচীনকাল থেকেই বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আক্রমণকারীরা হয় লুট করে চলে গেছে (যেমন গজনীর সুলতান মাহমুদ বা নাদির শাহ) অথবা আক্রমণকারী নিজেরাই ভারতবাসী হয়ে গেছে। এইভাবে বাইরের থেকে এসেছে আর্যরা, পরে এসেছে তুর্কী, পাঠান ও মোগলরা। তারা সকলেই ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতকে পরাধীন দেশ বানিয়ে শাসন করেছে একমাত্র ইংরেজরাই। তাই ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম।

একথা ঠিক যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেনি। তাই পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা বা ক্লাইভের জয়-পরাজয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি বাংলার মানুষ, এমনকি এই পক্ষ বা অপর পক্ষের সৈন্যদলও। সামন্ত যুগে সৈন্যরা কোনো না কোনো রাজার মার্সিনারী হিসেবেই যুদ্ধ করতো। এটা অবশ্য দৃশ্যপটের একদিক। অন্যদিকে ইংরেজ শাসকরা শাসন ও লুণ্ঠন চালাতে গিয়ে প্রতি পদে পদে প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী একশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের ঘটনায় ভরপুর। বিশেষ করে বাংলায়, যেখানে প্রথম ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই সবচেয়ে বেশি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সশস্ত্র। আর এই সকল বিদ্রোহ ছিল

BanglaBook.org

হিন্দু মুসলমানের মিলিত লড়াই। কোনো কোনো সশস্ত্র বিদ্রোহ বৎসরের পর বৎসর ধরেও চলেছে। বাংলায় তো বটেই, সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ উত্তর ভারতে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, মহারাষ্ট্রে, উড়িষ্যায় বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র কমবেশি হয়েছে। এই সকল বিদ্রোহ ছিল কৃষকের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। তার মধ্যে বৃটিশ হটানোর দিকটিও একভাবে ছিল। তবু তখনও পর্যন্ত এই সকল কৃষক সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা যায় না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল সত্যিকার অর্থে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। কার্ল মার্কসও সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছিলেন। এমনকি কার্ল মার্কস এই বিদ্রোহকে "একটি সামরিক বিদ্রোহ নয়, বরং একটি জাতীয় বিদ্রোহ" রূপে দেখেছিলেন।

তদানিন্তন ভারত, বৃটিশ শাসন ও সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মার্কসের ভাবনা খুবই প্রাসঙ্গিক। যা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকদের খুবই গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। আমরা একটু পরে মার্কসের ভারত ভাবনা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করব। তার আগে ১৮৫৭ সালের মহান সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরা যাক।

দুই

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের একশ বছরে ভারতের জনগণের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী ক্ষোভ জমা হতে থাকে। সেই ক্ষোভ কোম্পানীর সেনা বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহের প্রস্তুতিও চলছিল। তবে যে ধরণের পরিকল্পিত প্রস্তুতির দরকার তা ছিল না। কিছুটা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই বিদ্রোহের জন্ম যা দ্রুত বিভিন্ন সেনানিবাসে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণও স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাতে সাড়া দিয়েছিল। প্রথমে বিদ্রোহ শুরু হয় বাংলা থেকে, কোলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুর থেকে। সিপাহী মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে এই মহা বিদ্রোহের সূচনা হয় (২৯শে মার্চ ১৮৫৭ সাল)। বাংলায় ঢাকা, (২২শে নভেম্বর ১৮৫৭ সাল), ফরিদপুর, পাবনা, চট্টগ্রাম (১৮ই নভেম্বর ১৮৫৭ সাল, হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে), সিলেট ও অন্যান্য অঞ্চলে সিপাহী অভ্যুত্থান হয়েছিল। সিপাহীদের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক ছিলেন।

BanglaBook.org

কোম্পানীর সেনাবাহিনীর মধ্যে অফিসাররা বৃটিশ হলেও সিপাহীদের মধ্যে ভারতীয়রাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কোম্পানীর সেনাবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বাহিনীটি ছিল বাংলায়। তার সদস্য ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার। তার মধ্যে এক লক্ষ চল্লিশ হাজারই ছিল ভারতীয়। বস্তুত বৃটিশরা ভারতীয়দের সাহায্যেই ভারতকে পরাধীন রাখতে পেরেছিল। সেই ভারতীয় সিপাহীরা যখন বিদ্রোহ করল তখন আর সাগর পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। বস্তুত সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় ধরে রাখতে পারেনি।

শোনা যায়, এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এক ধরণের ধর্মীয় অনুভূতি থেকে। ইংরেজ শাসকরা এনফিল্ড রাইফেল নামে এক ধরণের রাইফেলের প্রচলন করে, যার কার্তুজ দাত দিয়ে ছিড়ে বন্দুকে পুরতে হতো। রটনা হয়েছিল যে, ঐ কার্তুজে শুকর ও গরুর চর্বি মেশানো আছে। এতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন। এবং এর থেকেই বিদ্রোহের সূত্রপাত। বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক সূত্রপাতের জন্য হয়তো এটাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল আরও গভীরে। আগেই বলেছি সিপাহীদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা ও বৃটিশ বিরোধী ঘৃণা কাজ করছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ সর্বভারতীয় জাতীয় চরিত্র লাভ করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি উল্লেখ করা যাক।

১১ই মে ১৮৫৭ মিরাট সেনানিবাসের ভারতীয় সৈন্যরা বৃটিশ আফিসারদের হত্যা করে দিল্লীর দিকে রওনা হন। দিল্লী গ্যারিসনের ভারতীয় সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যোগদান করেন। দিল্লী বিদ্রোহীদের দখলে চলে আসে। দিল্লীর মোগল বাদশা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বাধ্য করা হয় বিদ্রোহীদের পক্ষে অবস্থান নিতে এবং বৃদ্ধ বাদশাকে সারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। বাহাদুর শাহকে সারা ভারতের ঐক্যের ও স্বাধীনতার প্রতীক রূপে ধরা হয়েছিল। এতে বৃটিশ বিরোধী হিন্দু মুসলমান জনতা ও সিপাহীদের ঐক্যমত ছিল। দিল্লির মুসলমান উলেমারা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ বলে ফতেয়া দিয়েছিলেন।

সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে উত্তর ভারতের আলিগড় (২১শে মে), বেরিলি (৩১শে মে), লক্ষ্ণৌ (৩১শে মে) এবং কানপুর (৪ঠা জুন) বৃটিশ শাসন মুক্ত হয়।

BanglaBook.org

প্রত্যেকটি মুক্ত শহরে এক ধরণের প্রশাসন চালু করা হয়। বেরিলিতে প্রশাসনিক প্রধান হয়েছিলেন লিয়াকত আলী। পটনায় অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পীর আলী।

দিল্লীতে সিপাহীদের ছয়জন ও নগরীবাসীর চারজন নিয়ে একটি কমিটি (জলসা) গঠন করা হয়েছিল, যারা প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন।

এই মহা বিদ্রোহে যারা প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন নানা সাহেব, তাতিয়া তোপি, আজিমুল্লাহ খান, আহম্মদ উল্লাহ, ঝাসির রানি লক্ষীবাই প্রমুখ। তারা আমাদের জাতীয় বীর এবং আজও তাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন ঘটে। বৃটিশরা বিভিন্ন স্থান থেকে গোরা সৈন্য এবং বৃটিশ অনুগত ভারতীয় সৈন্য জড়ো করে দিল্লীর উপর আক্রমণ চালায়। দিল্লীর স্বাধীনতা যোদ্ধা ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আশেপাশের গ্রামবাসীরাও। তবু দিল্লীর পতন রোধ করা যায়নি । পাঁচদিন যুদ্ধের পর দিল্লীর পতন হয়। বাহাদুর শাহকে বন্দী করে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর দুই পুত্রকে তখনি হত্যা করা হয়। দিল্লী বিজয়ের পর সেখানে ইংরেজরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তার বিভৎসতার কথা বোম্বের বৃটিশ গভর্নর এলফিনস্টোন পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দিল্লীর পতন হলেও লক্ষ্ণৌ, কানপুর ইত্যাদি শহর তখনও দেশপ্রেমিক সিপাহীদের দখলে ছিল। অন্তত এই দুই শহর দখল পাল্টা দখলের জন্য ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকবার তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। এই সকল যুদ্ধে তাতিয়া তোপির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়ারের রাজা বৃটিশের পক্ষে থাকলেও তার সৈন্যরা তাতিয়া তোপির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং কানপুরে বৃটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

১৮৫৮ সালের ১১ই মার্চ লক্ষ্ণৌর পতন ঘটে। ১৮৫৮ সালের মে মাসে বেরিলির পতন ঘটে। বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাটিগুলির পতন ঘটার পর যুদ্ধের পরিস্থিতি শত্রুপক্ষ অর্থাৎ ইংরেজের অনুকূলে চলে যায়।

এই মহাবিদ্রোহে এক তরুণী রাজকন্যা, ঝাসির রানি লক্ষীবাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ঝাসিতে রাজত্ব করছিলেন লক্ষীবাই। ঝাসির জনগণ বৃটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের প্রয়াস গ্রহণ করেন এবং কয়েকজন বৃটিশকে হত্যা করেন। এই অজুহাতে বৃটিশ সেনাপতি ঝাসি দখলের জন্য ঘেরাও করলে লক্ষীবাই স্বীয় দুর্গ রক্ষার্থে সামরিক

BanglaBook.org

কামান্ড গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে তাতিয়া তোপির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঝাসির রানি যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন। তাতিয়া তোপি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ধরা পড়েন এবং ১৮৫৯ সালের ১৮ এপ্রিল ফাসীর মঞ্চে জীবনদান করেন।

১৮৫৮ এর মাঝামাঝির দিকেই বিদ্রোহের পরাজয় ঘটেছিল। তারপরও বেশ কিছুদন পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ চলেছিল। কিন্তু তা বিকাশ লাভ করেনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তীতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

তিন

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধই শুধু ছিল না, ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম সশস্ত্র গণ বিদ্রোহ। কেন্দ্রের শাসনের বিরুদ্ধে বিশেষ অঞ্চলের রাজা বা সামন্তপ্রভূদের বিদ্রোহের ঘটনা বৃটিশ পূর্ববর্তী ইতিহাসে বেশ দেখা যায়, যেমন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠিদের (শিবাজীর নেতৃত্বে) বিদ্রোহ ইত্যাদি। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে যে ধরণের গণ বিদ্রোহ, বিরাট আকারের কৃষক অভ্যুত্থানের (যথা জার্মানীতে কৃষক যুদ্ধ) ঘটনা দেখা যায় ভারতবর্ষে তা দেখা যায় না। হেগেল সেজন্য বলেছিলেন, "হিন্দুদের কোন ইতিহাস নাই"। অথবা "একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক শর্তে বিস্তৃত হবার মতো বৃদ্ধিও এদের নাই"। মার্কস তাঁর ভারত সংক্রান্ত গবেষণায় হেগেলের মতো করে না হলেও বৃটিশ পূর্ববর্তী যুগের নিশ্চল সমাজের কথা বলেছেন। কিন্তু মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এরফান হাবিব মনে করেন যে, মার্কস বর্ণিত ইতিহাসের চালিকাশক্তি শ্রেণী সংগ্রাম ভারতের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য ছিল এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে শোষিত শ্রমজীবীর অনেক সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা তিনি তুলে ধরেছেন। তবু একথা সত্য যে, জাতীয় ভিত্তিক মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এমনকি ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের উৎসাহী সমর্থক হয়েও মার্কস স্বীকার করেছেন, "ভারতবর্ষীয় এই বিদ্রোহে ইউরোপীয় বিপ্লবের বৈশিষ্টগুলি পাবার আশা করা নিরর্থক।"

তবু ঐতিহাসিক বিচারে ১৮৫৭ এর গণ বিদ্রোহ একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অনেকে এটাকে গণ বিদ্রোহ বলতে রাজী নন। তারা কেবল ক্ষুদ্র সামন্তদের বা রাজন্যবর্গের বিদ্রোহের বেশি কিছু বলতে রাজী নন। আমার মতে, এই রকম ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। এবং মার্কস

BanglaBook.org

সঠিকভাবেই এটাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। একথা ঠিক যে, বিদ্রোহ বা সশস্ত্র যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিলেন প্রধানত সামন্তরা। যে সকল জমিদার বা সামন্তপ্রভূদের বৃটিশরাজ সম্পত্তিচ্যুত করেছিল, তারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। একথা সত্য। কিন্তু একই সঙ্গে গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত সিপাহীরা যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন, তা-ও সত্য। বিদ্রোহের সেনানায়কদের অনেকে আবার বেশ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, যেমন আজিমুল্লাহ খান (তিনি ইতিপূর্বে দুইবার ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন, সে যুগে ইউরোপ ভ্রমণকারী ভারতীয়দের সংখ্যা খুব কম ছিল)। অথবা এলাহাবাদে যিনি অভ্যুত্থানের এবং বিদ্রোহীদের প্রশাসনের নেতা ছিলেন, তিনি হচ্ছেন মৌলভী লিয়াকত আলী, একজন স্কুল শিক্ষক ও ওহাবি মতাবলম্বী।

বিদ্রোহীরা বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে যে প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে নতুনও বটে। কোন একক রাজা নয়, বরং একটা কমিটি বা কাউন্সিলের হতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। যেমন দিল্লীতে সিপাহী ও নাগরিক প্রতিনিধি নিয়ে প্রশাসনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল।

এছাড়াও তাতিয়া তোপী, নানা সাহেব, ঝাসির রাণীর মতো ব্যক্তিদের নেতৃত্বের গুণাবলী, সামরিক দক্ষতা ও দেশপ্রেম তাদের চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

এই মহা বিদ্রোহের আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট হলো হিন্দু মুসলমান ঐক্য। ১৮৫৭ এর আগেও বাংলায় যেসব সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে সেখানেও হিন্দু মুসলমানের ঐক্য লক্ষ্য করতে পারি।

তবে দুর্বলতা তো ছিলই। অন্যথায় এই মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলো কেন। মাত্র স্বল্পসংখ্যক সাদা চামড়ার সৈন্য কিভাবে এতবড় ভারতবর্ষকে দুইশত বৎসর পরাধীন করে রাখতে পেরেছিল, তাও ভাববার বিষয়। তা ভারতীয় সমাজের মৌলিক দুর্বলতাই প্রকাশ করে।

মহাবিদ্রোহের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। কোন সমন্বিত স্ট্রাটেজিও ছিল না। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র থেকে অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। যদিও স্বাধীন ভারতের শাসক কে হবেন, তা বিদ্রোহীরা নির্ধারিত করতে পেরেছিলন (শেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহ) এবং বিদ্রোহীরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন (সে যুগে গণতন্ত্রের

BanglaBook.org

ধারণা ভারতীয় সমাজে অনুপস্থিত ছিল), তবু বলতে হয় যে, সম্মিলিত লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল না।

দিল্লীর পতনটি খুব দ্রুত হয়েছিল। মাত্র চারমাসের মধ্যেই পতন হয়েছিল। বৃটিশরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সামরিক শক্তি জমায়েত করেছিল, এমনকি চীনের পথে যাওয়া একদল বৃটিশ সৈন্যের পথ ঘুরিয়ে দিল্লীতে আনা হয়েছিল। তবু সৈন্য সংখ্যা বিদ্রোহীদের পক্ষে বেশি ছিল। তাছাড়া জনগণ তো ছিলই। তারপরও দিল্লীর পতনের মূল কারণ নেতৃত্বের দুর্বলতা। সিপাহী ও নাগরিকদের প্রতিনিধি নিয়ে যে কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল তা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। সম্রাট বাহাদুর শাহ কেবল নামেই নেতা ছিলেন। অর্থ সংকট, খাদ্য সংকট , এমনকি অস্ত্র সংকটও ছিল। সেই সময়ের পরিস্থিতির উপর মার্কস লিখেছেন, "... অভ্যুত্থানকারী সিপাহীদের নানা ধরনের মিশ্রিত দলটি, যারা নিজেদের অফিসারদের হত্যা করেছে, শৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, অথচ এমন কাউকে বের করতে পারেনি যার উপর সর্বোচ্চ কমান্ড ন্যাস্ত করা যায়। সেই রকম সংস্থাটির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা কম।"

একথা ঠিক যে, সামগ্রিকভাবে সামন্তরাই ছিলেন নেতৃত্বে। তারা কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। দিল্লী বিজয়ের পর বিদ্রোহীরা যে ঘোষণা দেন, তাতে ব্যবসায়ী ও মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে নানা রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও খাজনা কমানোর কোনো অঙ্গিকার ছিল না। এটা নেতৃত্বের মাথায় ছিল না।

এই মহাবিদ্রোহে কৃষক ও কারিগরদের সমর্থন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ থাকলেও, বিদ্রোহের ডাকটি কিন্তু কৃষকদের থেকে আসেনি। কার্ল মার্কস অবশ্য বিষয়টিকে খুব অস্বাভাবিক মনে করেননি। তিনি ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, "ফরাসি রাজতন্ত্রের উপর প্রথম আঘাতটি কৃষকদের থেকে আসেনি, এসেছিল অভিজাত শ্রেণী থেকেই। ইংরেজদের হাতে নির্যাতিত, অসম্মানিত, নগ্ন শরীরে বেত খাওয়া রায়তরা এই বিদ্রোহ করেননি, (একই রকমভাবে) বিদ্রোহ করেছিল তাদের উর্দিপরা, তাদেরই প্রতিপালিত, পুষ্ট সমর্থিত, প্রশ্রয় পাওয়া একদল সিপাহী।"

BanglaBook.org

সিপাহীদের খুব বেশি আধুনিক অস্ত্র ছিল না। মার্কস এটাকেও চিহ্নিত করেছিলেন, "... বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের অভাব ছিল আর এগুলো ছাড়া বর্তমানে একটা সেনা বাহিনীরও কোনো ভবিষ্যত নাই।"

কোম্পানীর রাজত্বের রাজধানী ছিল কোলকাতা। কোলকাতা ছিল ইংরেজদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি। কোলকাতা কখনও সিপাহীরা দখল করতে পারেনি। পাশাপাশি কোলকাতায় তখন যে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে মনে সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে থাকলেও প্রকাশ্যে সকলেই ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ধরণের জাতীয় সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিতে পারে হয় শ্রমিক শ্রেণী, না হয় বুর্জোয়া শ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী তখনো জন্ম নেয়নি, নিলেও একবারে ভ্রুণ বা শৈশব অবস্থায়। অন্যদিকে উদারনৈতিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের একগুচ্ছ ব্যক্তির সমাহার ঘটেছিল প্রধাণত বাংলায়। তারা সমাজ সংস্কারে ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় বিরাট আবদান রাখলেও রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। তাদের একটি অংশ বৃটিশ শাসনকে আশীর্বাদ বলেও মনে করতেন। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকাশ তখনো হয়নি।

এছাড়া কোনো কোনো দেশীয় রাজা হয় ইংরেজ পক্ষে ছিল অথবা নিরপেক্ষ থেকেছে।

সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর বৃটিশ রাজ তাদের কৌশলে কিছু পরিবর্তন আনে। তারা দেখেছিল যে, এই বিদ্রোহে অনেক ভারতীয় রাজা, সামন্ত অংশগ্রহণ করেছিল। বৃটিশ শাসকরা তাদের পলিসিতে যে ভুল ছিল তা বুঝতে পারে। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর বৃটেনের রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার কোম্পানীর কাছ থেকে তুলে নেবার পর যে ঘোষণা দেন, সেখানে ভারতীয় সামন্তদের সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বলা হয়, যে সকল রাজা জমিদার ইত্যাদি সামন্তপ্রভু বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে (অবশ্য যারা সরাসরি বৃটিশ নাগরিকদের হত্যা করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না)। তিনি বলেন যে, কেবল পদচ্যুত রাজারাই নয়, 'জায়গীরদার' ও 'ইমানদারদেরকেও' ভুল পদক্ষেপের কারণে ক্ষুব্ধ করে তোলা হয়েছিল। বৃটিশ শাসকরা উপনিবেশিক শাসনের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন। ইংরেজ শাসকরা পরবর্তীতে সাবধানী হয়েছিল এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সামন্তদের পক্ষে রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল।

BanglaBook.org

তাই বলে সাধারণ জনগণকে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করার জন্য ইংরেজ শাসকরা ক্ষমা করেনি। বরং অভ্যুত্থানে কে কতটা অংশগ্রহণ করেছে সেই সব বাছবিচার খুব একটা না করে ইংরেজ শাসকরা যে ধরণের বর্বর লোমহর্ষক নিপীড়ন চালিয়েছিল, তাতে আর যাই হোক ঐ ইংরেজদের সভ্য বলা যায় না। কোনো কোনো জায়গায় রাস্তার দুধারে গাছে গাছে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে সিপাহী ও সাধারণ নাগরিকদের। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের গাছের ডালে ডালে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল দেশপ্রেমিক সিপাহী ও নাগরিকদের।

সেই সময় ইউরোপে খুব কম লোকই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু ঘৃণা মিশ্রিত ভাষায় কঠোর নিন্দা করেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। এছাড়াও আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায় যারা সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রতি সহানুভতিশীল ছিলেন। বৃটিশ চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতা আর্নেস্ট জোনস সিপাহী অভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বৃটিশ বর্বরতার নিন্দা জানিয়েছিলেন রাশিয়ার চার্নিয়েশেভিস্কি, জার্মনীর পত্রিকা Illustriarte Zeitung প্রমুখ। বৃটিশ শাসকরা আজও তাদের কৃতকর্মের জন্য ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চায়নি। অর্থাৎ সেই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এখনও রয়ে গেছে এবং এ জন্য পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এবং ইতিহাসের কাছে অপরাধী বলেই গণ্য হয়েছে।

চার

আমরা যারা মার্কসের ভারত ভাবনার সঙ্গে পরিচিত তারা জানি যে, ভারতে বৃটিশ শাসন প্রসঙ্গে মার্কস দুটি দিক দেখেছিলেন। একদিকে বৃটিশ শাসকদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসলীলা, অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন। সেজন্য মার্কস ছিলেন বৃটিশ শাসনের কঠোর সমালোচক এবং ভারতের স্বাধীনতার ঘোর সমর্থক। ভারত প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন, "স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গী বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত।" সেদিনের ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু মার্কস আবার বৃটিশ শাসনের অন্য একটি দিকও দেখেছেন। বৃটিশ শাসন অবচেতনভাবে ভারতে এক বিপ্লবের কাজও করে ফেলেছে। গ্রামগোষ্ঠী সামজ ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত এশীয় ধরণের স্বৈরাচার ছিল ভারতের বৈশিষ্ট। এই সমাজ ছিল নিশ্চল। পুজিবাদের স্বার্থে বৃটিশ শাসকরা একে ভেঙে দেয়। মার্কসের

BanglaBook.org

ভাষায়, "ইংল্যান্ড হিন্দুস্তানে সামজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে এবং সেই স্বার্থ সাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিষ্যত তৈরি করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংল্যান্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংল্যান্ড ছিল ইতিহাসের অসচেতন অস্ত্র।"

মার্কস খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে রয়েছে পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার একটা প্রচেষ্টা। বৃটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে ভারতে পুনর্জাগরণের সেই সম্ভবনা মার্কস দেখেছিলেন, যার দ্বারা ভারত বৃটিশকেও তাড়াতে পারবে এবং প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। সেই সম্ভাবনা কি সেদিনের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ছিল? না, তেমনটি ছিল না সিপাহী অভ্যুত্থানে। তবু জনগণের বিদ্রোহের প্রতি মার্কসের যে সহজাত সহানুভূতি তার থেকেই তিনি মনে প্রাণে কামনা করছিলেন যাতে বিদ্রোহ বিজয়ী হয় এবং ইংরেজ শাসনের পরাজয় ঘটে। যখন বৃটেনের কাগজে লেখা হচ্ছে, ইংরেজরা দিল্লী পুনর্দখল করেছে, বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটেছে, মার্কস তখন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায়। বৃটেনের কাগজে যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচার ও হত্যার খবর প্রকাশ হচ্ছে, তখন মার্কস বলেছেন, এটা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আবার বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজদের বর্বরতাকে মার্কস কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন।

মার্কস যে কল্পনা বিলাসী নন এবং প্রত্যেকটি বাস্তব গণসংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছেন, তার আরেকবার প্রমাণ মিললো ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বৃটিশের মাধ্যমে ভারতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ভারত যুক্ত হয়েছে বিশ্ব বাজারের সঙ্গে আর একই সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গেও। এতে নতুন বিপ্লবী ভারতের জন্ম হবে। এমনটাই ভেবেছিলেন মার্কস। কিন্তু সেজন্য অপেক্ষা না করেই যে স্বাধীনতার যুদ্ধে শুরু হয়েছিল বিপ্লবী মার্কস তার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।

মার্কস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের মধ্যেও এখনও প্রবণতা আছে সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ না বলে এটাকে নেহায়েত সামান্তপ্রভূদের বিদ্রোহ বলে কিছুটা খাটো করে দেখার। না, আমরা সেভাবে দেখতে পারি না। সিপাহী বিদ্রোহের দেড়শ বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমরা যেন গর্ববোধ করতে পারি, আমাদের ইতিহাসের মহান সংগ্রামের অধ্যায়টিকে স্মরণ করে।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ এগারো

স্বদেশী আন্দোলন, কংগ্রেস ও গান্ধীর আন্দোলন

(একথা সত্য যে, ইংরেজ কোম্পানী যখন বাংলা ও পরবর্তীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল দখল করেছিল তখনও ভারতবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়নি। এবং সেই কারণেই সামান্য সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য নিয়ে তারা এত বড়ো দেশকে দখল করতে এবং দখলে রাখতে পেরেছিল। তবে একই সঙ্গে একথা সত্য যে প্রথম থেকেই কোম্পানী বা বৃটিশ রাজের শাসন প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।)

কৃষক জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম

একেবারে প্রথম থেকেই কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের কৃষকের ও জনগণের সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সশস্ত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–

- ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
- শান্তিপুরের তাঁতিদের বিদ্রোহ
- মেদনীপুরে মালঙ্গী বা লবণচাষীদের বিদ্রোহ
- রংপুর-দিনাজপুরে কৃষক প্রজাদের সশস্ত্র সংগ্রাম
- বাঁকুড়ায় প্রজা বিদ্রোহ
- চোয়াড় বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এই বিদ্রোহগুলো সংগঠিত হয়েছিল। এগুলো ছিল প্রধানত কৃষক প্রজাদের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম এবং অধিকাংশই ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে আরও সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

- সাঁওতাল বিদ্রোহ

BanglaBook.org

- ওয়াহাবি আন্দোলন– ফরাজী আন্দোলন– তিতুমীরের বিদ্রোহ
- মেদনীপুর ও বাঁকুড়ায় গঙ্গানারায়নের নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফা চোয়াড় বিদ্রোহ
- পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (ময়মনসিংহের শেরপুরে)

এই সংগ্রামগুলো ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সংগ্রাম।

সংগ্রামগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন এবং নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় কৃষক পরিবারের সন্তানরা। এই সকল সংগ্রাম অনেক বীরত্ব সত্ত্বেও সফল হতে পারেনি।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহ নামে ইতিহাস বিখ্যাত। কার্ল মার্কস এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ ও নীলচাষীদের বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল সেগুলো ছিল প্রধানতঃ জমিদারদের বিরুদ্ধে এবং নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহগুলো আগের মতো সশস্ত্র ছিল না। তবে আগের মতোই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম ছিল। এই সকল সংগ্রামের লক্ষ্যের মধ্যে স্বাধীনতা বা বৃটিশ রাজ উৎখাতের বিষয় ছিল না, যা এর আগের সংগ্রামগুলোর অধিকাংশের মধ্যে সরাসরি বা প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে যে সকল বড়ো বড়ো কৃষক সংগ্রাম হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল–

- নীল বিদ্রোহ
- জমিদার প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
- পাবনার কৃষক বিদ্রোহ

BanglaBook.org

বিংশ শতাব্দীতে পরাধীন ভারতে সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা

বিংশ শতাব্দীতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিন্নমাত্রা লাভ করেছিল। আমরা এখানে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করবো। ভারতের শাসকগোষ্ঠী এমনভাবে ইতিহাসকে উপস্থাপন

করে তাতে যেন মনে হয়, এককভাবে গান্ধী ও কংগ্রেসের কারণেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সংগ্রামের ইতিহাসকে তারা নগণ্য করে তোলেন। এছাড়াও বিংশ শতাব্দীতেও যে সকল মহান সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল (নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে, অনুশীলন যুগান্তর প্রমুখ সশস্ত্র বিপ্লবীদের নেতৃত্বে, চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান, ১৯৪৬ এর নৌ বিদ্রোহ ইত্যাদি) সেই সকল সংগ্রামের অবদানকেও তারা অস্বীকার করেন। এমনকি তারা এটাও বলতে চান যে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা এনেছিল। এটি সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং ইতিহাস বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। এ ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সকল শ্রমিক কৃষকের বড়ো বড়ো সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল সেগুলো কেবল শ্রেণী সংগ্রামই ছিল না তার মধ্যে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির উপাদানও ছিল।

বিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতে যে কয়টি সংগ্রামের ধারা ছিল তা নিম্নরূপ

১. *গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণআন্দোলন*
২. *সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা*
৩. *কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রাম*
৪. *মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ধারা (এটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারা যা বৃটিশ বিরোধী তো ছিলই না, বরং ছিল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারা। তবু চল্লিশের দশকে এই ধারাটি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, যার পরিণামে দেশবিভাগ এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।)*

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে কংগ্রেসের ভূমিকাই মুখ্য বলে ভারতের কংগ্রেস নেতারা দাবি করেন, সেই কংগ্রেসের জন্ম বৃটিশ শাসকদের উদ্যোগে, তদানিন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের নির্দেশে বৃটিশ আমলা হিউমের উদ্যোগে। ১৮৮৭ সালে বোম্বে শহরে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ শাসকরা ভীত হয়ে ওঠে। আবার কবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দেখা দেবে। তাই জমিদার, ভারতীয় ধনী ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এমন সংস্থা এবং এমন কর্মপন্থা তৈরি করা হোক যা বৃটিশ রাজের সঙ্গে আপোস

BanglaBook.org

করে চলবে। আবেদন নিবেদনের মধ্যেই যেন তাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথমদিকে ছিলও তাই। বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জমিদার পুঁজিপতি চাকরীজীবীর জন্য কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ ছিল। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, নবীনরা এই ধরণের নিষ্ফল প্রস্তাব পাশ ও প্রার্থনার মধ্যে আটকে থাকতে চাননি। তারা সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন, যদিও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিটি এসেছিল আরও পরে। এই সংগ্রামী নবীনদের বলা হতো চরমপন্থী। তাদের নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক (মহারাষ্ট্র), লালা লাজপত রাই (পাঞ্জাব), বিপিনচন্দ্র পাল (বাংলা), অরবিন্দ ঘোষ (বাংলা)। অরবিন্দ ঘোষই ছিলেন বাংলায় সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রথম সংগঠক (যাদেরকে বৃটিশরা বলতো সন্ত্রাসবাদী)। বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের এই চরমপন্থী নেতাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল।

সেই সময় স্বদেশি কথাটা চালু হয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্র ছিল বিদেশি কাপড় বর্জন। মহারাষ্ট্রের গঙ্গাধর তিলকই প্রথম ইংল্যান্ডের বস্ত্র বর্জনের ডাক দেন। আবার ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্র থেকেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। পুনাতে র‍্যান্ড আয়ার্ঘ নামে এক জন অত্যাচারী ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন মহারষ্ট্রের সন্তান চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়। তিলক তাদের প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখে কারাদণ্ড ভোগ করেন। জনগণ তাকে লোকমান্য উপাধিকে ভূষিত করেছিল। ১৮৯৮ সালে তিলক গ্রেফতার হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মামলা পরিচালনার জন্য জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তিলকের গ্রেফতার এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন তাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ বলা যেতে পারে, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি হাজির করা হয়েছিল।

১৮০৮ সালে তিলক পুনরায় গ্রেফতার হলে বোম্বে শহরের লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করেন। হরতালে ছয়দিন বোম্বে শহর অচল হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে শ্রমিকশ্রেণীর এই স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের সংবাদ লেনিনের কাছে পৌঁছেছিল। তিনি এটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে স্বদেশি আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে। ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলা

BanglaBook.org

প্রদেশেকে দুইটি প্রদেশে ভাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেভাবে বৃটিশ বিরোধী হয়ে উঠেছিল তাতেই ভীত হয়ে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত ও দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হলো এবং রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হলো ১৯০৫ সালে। প্রবল গণ আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত ছিল। ইতিহাসে বঙ্গদেশ দ্বিতীয়বার দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে– পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ (কোলকাতা যার রাজধানী) গেল ভারতে আর পূর্ব বঙ্গ (ঢাকা যার রাজধানী) যুক্ত হলো পাকিস্তানে। সেই পূর্ববঙ্গই আজ বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ রোধ করা সম্ভব হলেও রাজধানী আর কোলকাতায় ফিরে এল না। তখন থেকে দিল্লীই হলো সারা ভারতের রাজধানী। ইতিপূর্বে মোগল ও সুলতান আমলে দিল্লী রাজধানী ছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ছিল পরাধীন আমলে প্রথম ব্যাপক গণআন্দোলন। এই সময় স্বদেশি কথাটা খুব জোরের সঙ্গেই উঠে এসেছিল। বিদেশি কাপড় বর্জন, বিলাতী কাপড়ে আগুন লাগানো ইত্যাদি ছিল আন্দোলনের ফর্ম।

একই সময় (১৯০৬ সালে) বৃটিশ আনুকুল্যে মুসলীম লীগ গঠিত হয়েছিল যারা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন। তবে মুসলমানদের একটা অংশ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পক্ষেও ছিল। ১৯০৬ সালে মৌলবী মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে 'দি মুসলমান' পত্রিকা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীও বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেই দেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। 'সত্যাগ্রহ' ছিল তাঁর আন্দোলনের কৌশল। 'সত্যাগ্রহ' হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে, অহিংসা পদ্ধতিতে প্রতিবাদের একটি ফর্ম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধী বিহারে ও গুজরাটে– কয়েকটি জায়গায় নিপীড়িত কৃষকদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। কিছু দিনের

BanglaBook.org

মধ্যেই গান্ধী কংগ্রেসের ও ভারতের সর্বপ্রধান নেতায় পরিণত হন। তিনি আন্দোলনকে ব্যাপক জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে 'রওলাট আইন' নামে একটি দমনমূলক আইন পাস হলে গান্ধী সারা দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল সারা ভারতে প্রথম হরতাল পালিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর বৃটিশ সেনাবাহিনী বিনা উসকানীতে বিনা কারণে গুলি চালিয়ে যে বর্বরতার নজির স্থাপন করেছিল তা বৃটিশ রাজের জন্য স্থায়ী কলঙ্কের চিহ্ন রেখে গেছে। এই ঘটনায় কংগ্রেস নেতারা ভীত হয়ে ওঠেন। গান্ধীজি ১৮ এপ্রিল (১৯১৯) সাময়িকভাবে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিলেন। সংগ্রাম ও আপোসমুখী গান্ধীর এই যে দ্বিবিধ নীতি, এই ঘটনার দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গান্ধীজির রাজনীতিতে এই ধরনের বৈপরীত্যের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তবে জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের দেওয়া নাইটহুড ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন

১৯২০ সালের দিকে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একই সময় শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী (দুই ভাই) এর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কের খলিফা ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলে ইংরেজরা তুরস্কের সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে কয়েক টুকরো করে দেয়। এতেই ভারতের মুসলমানরা বৃটিশের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং সেখান থেকে খেলাফত আন্দোলনের সৃষ্টি। গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দান করলেন। ফলে ১৯২০ সালে অসহযোগ ও খিলাফত দুইটি ধারা একমঞ্চে মিলিত হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য তৈরি হয়েছিল। তবে খেলাফত আন্দোলনটির মধ্যে বৃটিশ বিরোধী উপাদান থাকলেও তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল।

ভারতের মুসলমানদের একাংশ তুরস্কের সম্রাটকেই সারা মুসলিম জাহানের খালিফা বিবেচনা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম ঘোষণা করে । মুসলমানদের একাংশের মধ্যে খিলাফত আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালে সারা ভারত খিলাফত সম্মেলনে

BanglaBook.org

ঘোষণা করা হলো– মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা বা এই কাজে সাহায্য করা চলবে না। আরও বলা হলো, তুরস্কের খিলাফত ফিরিয়ে না দিলে তারা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দান করলেন। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এক যোগে চলেছিল এবং হিন্দু মুসলমানের ঐক্য রচিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজের অনুগত মুসলিম লীগ খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে ছিল না। অন্যদিকে মহম্মদ আলী জিন্না তখনও কংগ্রেস করতেন। তিনি সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খিলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদান থাকলেও এই আন্দোলন ছিল চরিত্রগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। প্রথমত, প্যান ইসলামিক আদর্শগত ভিত্তির উপর এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক ও সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্যান ইসলামিক মতবাদ অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনকারীরা তুরস্কের সম্রাটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তুরস্কেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল বুর্জোয়া নেতা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে এবং খিলাফত (রাজতন্ত্র) উৎখাত হয়েছিল। ফলে তুরস্কের সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা মানে হচ্ছে পশ্চাৎপদতা। তৃতীয়ত, আন্দোলনকারীরা পুরাতন তুরস্কের সাম্রাজ্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কের অধীনে ছিল বিভিন্ন আরব ও অন্যান্য জাতির রাজ্য। তুরস্কের রাজাকে সারা মুসলিম বিশ্বের খলিফা ঘোষণা করা মানে হলো তুরস্কের অধীনস্থ জাতিসমূহের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। গান্ধীজি বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে কাজে লাগিয়েছেন। তার পরিণাম ভালো হয় নি। অন্যদিকে জিন্না সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন, যদিও পরবর্তীতে তিনিই সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতির হাতিয়ার করেছিলেন।

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১)

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ–

- সরকারি পদবী ত্যাগ
- সরকারি দরবার পরিহার
- সরকারি স্কুল কলেজ বয়কট
- বৃটিশ আদালত বর্জন

BanglaBook.org

- মেসোপটেমিয়া রণাঙ্গনে পাঠাবার জন্য যে সৈন্য রিক্রুট করা হচ্ছিল তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন
- কাউন্সিল বর্জন
- বিলাতী জিনিস বর্জন

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এক পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলনে এবং খাজনা ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। পরীক্ষামূলকভাবে এই আন্দোলন প্রথমে গুজরাটে ও অন্ধ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। আন্দোলন অবশ্য গান্ধীর অহিংস নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সময় বোম্বেতে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান, মালাবারে মোপালাদের বিদ্রোহ, উত্তর প্রদেশ ও বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। ঠিক এমন সময় চৌরিচারি নামক এক জায়গায় বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে দিলে ২১ জন কনস্টেবল ও একজন সাব ইনসপেক্টর জীবন্ত দগ্ধ হন। এই ঘটনাকে অজুহাত করে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। ফলে আন্দোলনও থেমে গেল, দেশব্যাপী হতাশাও তৈরি হলো।

গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ আন্দোলন

১৯৩০ সালে গান্ধীজি আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। লবন আইন ভঙ্গ করে গান্ধীজি যে অন্দোলন শুরু করেছিলেন তা লবন আন্দোলন নামে বিখ্যাত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতে লবণ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ ছিল। গান্ধীজি সেই আইনটি অমান্য করে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগের পর লবণ আন্দোলন বা লবণ সত্যাগ্রহ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠিত বৃটিশবিরোধী গণআন্দোলন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এর পরপরই ১২ই মার্চ গান্ধীর নেতৃত্বে ডান্ডি পদযাত্রা বা লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। গান্ধীজি আহমেদাবাদের কাছে সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি পদযাত্রা শুরু করে ২৬ দিনে ২৪০ মাইল পথ হেঁটে ৬ এপ্রিল ডান্ডি গ্রামে এসে পৌঁছান এবং সেখানে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন। গান্ধীজি'র বাছাই করা মাত্র ৭৮ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে শুরু হলেও এই অভিযানে ক্রমাগত মানুষ বাড়তেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক মানুষে পরিণত হয়। এই অভিযানে অসংখ্য মহিলাও যোগদান করেছিলেন।

BanglaBook.org

১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ৬টার সময় গান্ধীজি লবণ আইন ভেঙ্গে প্রথম লবণ প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য অনুগামী ও কংগ্রেস কর্মী ভারতের বিভিন্ন জায়গায় লবণ আইন ভেঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এই আন্দোলনে চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্যসেনসহ অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবার সারাদেশ আন্দোলনের জোয়ারে জেগে উঠল। গান্ধীজি গ্রেফতার হলেন। কোলকাতা, বোম্বাই, পুনায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হলো। কোলকাতা ও বোম্বাইয়ে পরিস্থিতি ছিল অভ্যুত্থানের মতো। প্রায় সর্বত্রই পুলিশ ও প্রশাসন বেপোরয়াভাবে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। এই সকল আন্দোলনে শ্রমিকরা যোগদান করেছিলেন সক্রিয়ভাবে। শোলাপুরে ধর্মঘটী শ্রমিকরা শহর দখল করে কয়েকদিন পর্যন্ত সেখান থেকে বৃটিশ শাসনের বিলুপ্তি ঘটায়। সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ারের জনগণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শহরটিকে প্রায় স্বাধীন করে রেখেছিল। বৃটিশ প্রশাসন তাদেরকে দমন করার জন্য গাড়োয়াল রাইফেলসের হিন্দু সিপাহীদের পাঠিয়েছিল নিরস্ত্র মুসলমান জনতার উপর গুলি চালানোর জন্য। কিন্তু হিন্দু সিপাহীরা বিদ্রোহী মুসলমানদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে এবং বৃটিশের হুকুম অমান্য করে। বাংলার মেদিনীপুরে লবণ আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল এবং বৃটিশের অত্যাচারও সেখানে বর্বরতম রূপ গ্রহণ করেছিল। সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য মেদিনীপুরে বিপ্লবীরা ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৩০ সালে মে মাসে গান্ধীজি গ্রেফতার হলেন। তখন কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হলো। লবণ সত্যাগ্রহ প্রায় এক বৎসর চলেছিল। পরে গান্ধী মুক্তি লাভ করেন।

আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে তৎকালীন ইংরেজ ভাইসরয় গান্ধীজি'র সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। দুজনের মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভাইসরয় আরউইন লবণ কর প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন এবং সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই সুযোগে বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় দফা কারাদণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। বহু কংগ্রেস কর্মী জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। গান্ধীজি আইরিনের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। তবে কথা থাকে যে, যারা সশস্ত্র পথ গ্রহণ

BanglaBook.org

করেছেন তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে না। অহিংস আন্দোলনের নেতা গান্ধী তাতে সম্মত হন। এই চুক্তির পরপরই ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি কার্যকরি করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, তারা কেউই মানুষ হত্যা করেননি। দিল্লীর কেন্দ্রীয় পরিষদে বোমা ফাটিয়ে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন। তাতে কোন লোক মরেনি। মারার ইচ্ছাও ছিল না ভগৎ সিংদের। গান্ধীজি এই ফাঁসির নিন্দা পর্যন্ত করেননি। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যেই গান্ধীর সমালোচনা শুরু হয় এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে কী হবে তা নিয়ে আশংকা দেখা দিয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে র‍্যাডিকাল নেতা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীর বৈঠক ও চুক্তি হয়েছিল যার ফলে তখনকার মত কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকটের নিরসন হয়েছিল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি বৃটিশ নেতা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি চরম প্রতিক্রিয়াশীল চার্চিল মেনে নিতে পারেননি। কারণ তার মতে শাসক বৃটিশ রাজ ও ভারতীয় প্রজাদের একই মর্যাদা দিয়ে চুক্তি করা হয়েছিল। তিনি তখন গান্ধীকে 'অর্ধ উলঙ্গ ফকির' বলে অভিহিত করেছিলেন।

গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলন

পরাধীন ভারতে গান্ধীর সর্বশেষ আন্দোলন ছিল 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস "বৃটিশ ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দেয়। তখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এদিকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে চলেছে। সেই সময় অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা (নেহেরু, আজাদ, প্যাটেলসহ) বৃটিশের কাছ থেকে দরকষাকষি করে পুরো স্বাধীনতা না হোক ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের মতো খানিকটা "স্বরাজ" আদায় করে নিতে আগ্রহী ছিলেন। নেহেরু সরাসরি সুভাষ বসুর বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের লাইন ছিল জনগণকে সমবেত করে বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং কিছুটা সুবিধা আদায় করা, কিন্তু লক্ষ রাখা যাতে গণআন্দোলনে সশস্ত্র ঝোঁক তৈরি না হয় অথবা শ্রমিক কৃষকের অভ্যুত্থানের মতো অবস্থা তৈরি না হয়। এই ব্যাপারে গান্ধী সবচেয়ে বেশি সজাগ ছিলেন। জনগণের উপর তাঁর বিশাল প্রভাব ছিল। তাই তিনি জনগণকে আন্দোলনে নামাতেও পারতেন আবার রাশ টেনেও ধরতে পারতেন।

BanglaBook.org

'ভারত ছাড়' আন্দোলন কিন্তু অহিংসা নীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। বস্তুত গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতারা ভারত ছাড় ডাক দিয়েই জেলে চলে গেলেন। অবশ্য জেলে যাবার আগে গান্ধী বলেছিলেন, "পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতে আমি রাজি নই, ডু অর ডাই।" তাঁর এই ধরনের বক্তব্য জনগণকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে আত্মগোপনে থেকে সংগঠিত করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাম মনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যারা কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন। কংগ্রেসের মূল নেতাদের আন্দোলনের কোন পরিকল্প নাই ছিল না। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টিও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

এই আন্দোলন 'আগস্ট বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। আগেই বলা হয়েছে যে, এই আন্দোলন কিন্তু গান্ধীর অহিংস নীতির মধ্যে আটকা পড়ে থাকেনি। খুবই জঙ্গি ও কোথাও কোথাও সশস্ত্ররূপ ধারণ করেছিল। বাংলা (মেদনীপুর), বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কোথাও কোথাও প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল। এই অবস্থা কয়েকমাস স্থায়ী হয়েছিল। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছিল।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ বারো

সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম (তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ)

বাংলা তথা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা প্রায় প্রথম থেকেই ছিল। আমরা ইতিপূর্বে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সশস্ত্র সংগ্রামের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছি। কৃষক ও গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন ধরণের সশস্ত্র তৎপরতা ছিল। আর ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহ তো ছিল প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আন্দোলন কখনও কখনও গণ আন্দোলন তৈরি করলেও তা বারবার বুর্জোয়া নেতৃত্বের আপোসমুখী কৌশলের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে গান্ধীজির অহিংস নীতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত জোর দেবার কারণে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যহীনভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে বার বার স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করা হলেও তা কখনই গৃহীত হয়নি। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসেই প্রথম বারের মতো স্বাধীনতার দাবি প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়েছিল।

এমনকি স্বদেশি আন্দোলন যাকে বলা হয়, তার মধ্যে জঙ্গিত্ব, বিদেশি কাপড় বর্জনের মতো ঘটনা থাকলেও এবং কখনও কখনও স্বরাজ বা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের কথা বলা হলেও পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি।

কংগ্রেসের চরমপন্থীদের নীতিও ভারতের বিশেষ করে বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা চেয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। ইতালির গ্যারিবলডি, আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়ান, রাশিয়ার জার বিরোধী নারদনিক ও নিহিলিস্টদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা বাংলার তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল। গড়ে উঠতে থাকে গোপন সশস্ত্র সংগঠন যাদের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

BanglaBook.org

এই ধরণের প্রথম গুপ্ত সংগঠন গড়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রে। ১৯০৫ সালের দিকেই বাংলায় গোপন সশস্ত্র গ্রুপগুলো গড়ে ওঠে। একেবারে শুরুতে যিনি বিপ্লবী পথে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি হলেন অরবিন্দ ঘোষ। গোপন সশস্ত্র দলের মধ্যে দুইটি প্রধান দল ছিল– অনুশীলন ও যুগান্তর। বাংলার প্রায় প্রতিটা জিলায় এদের সংগঠন ছিল। কী পরিমাণ তরুণরা এই সকল সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার কিছু নমুনা দেয়া যাক। ১৯০৭ সালে 'অনুশীলন সমিতি'র শুধু ঢাকা কেন্দ্রের অধীনে ৫০০ টি শাখা ছিল।

'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকাও ছিল। বস্তুতঃ যুগান্তর দলের মুখপত্র। ১৯০৭ সালে যুগান্তরের প্রচার সংখ্যা ছিল সাত হাজার। 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' এই দুইটি পত্রিকা ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মুখপত্র।

এদেরকে ইংরেজ শাসকরা বলতেন সন্ত্রাসবাদী। তাদের কাজের ধরণ ছিল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ। তবু সন্ত্রাসী কথাটা ভালো নয়। সেজন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফফর আহমদ তাদেরকে বলেছেন 'সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী'।

তাদের কাজের ধারা প্রথম দিকে ছিল প্রশাসনের মধ্যে অবস্থিত চিহ্নিত দুশমনদের খুন করা। কিংসফোর্ড নামের এক ইংরেজ বিচারক খুবই খারাপ লোক ছিল। সেই ব্যক্তি বাংলার দেশপ্রেমিকদের বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়েছিল। তাকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯০৬ সালে। দায়িত্ব পড়েছিল দুই তরুণের উপর– ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। তারা বিহারের মোজাফ্ফরপুরে গিয়েছিলেন এই বর্বর জজকে খুন করার জন্য। কিন্তু ভুলক্রমে খুন হলো অন্য এক ইংরেজ– কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা। এটাই ছিল প্রথম স্বদেশি খুন। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগেই নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের নব পর্যায়ের তারাই হলেন প্রথম শহিদ। এরপর চলতে থাকে একের পর এক স্বদেশী খুন অর্থাৎ রাজ কর্মকর্তা, পুলিশ ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের খুন। একই সঙ্গে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলতে থাকেন একের পর এক বিপ্লবী তরুণ। তাঁদের উদ্দেশ্যেই গান লিখেছিলেন মোহিনী চৌধুরী (সুর দিয়েছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্র দে)

"মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হলো বলি
লেখা আছে অশ্রুজলে।"

ক্ষুদিরামের ফাঁসি সারা দেশে বৃটিশ বিরোধী তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি ক্ষুদিরামের মহান আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করেই লেখা– যা খুবই জনপ্রিয় ছিল বাংলার ঘরে

BanglaBook.org

ঘরে। গানটির রচয়িতা কে তা বহুকাল জানা যায়নি। তবে ১৯৭০ সালের এক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে জনৈক পিতম্বর দাস এর রচয়িতা।

সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বলে খ্যাত দলগুলো কেবল ব্যক্তিগত খুনই করেননি, তারা অর্থ সংগ্রহের জন্য ধনীর বাড়িতে ডাকতি করতেন (যা স্বদেশি ডাকাতি নামে পরিচিত), বোমা বানাতেন (যে জন্য অনেকগুলো মামলা দিয়েছিল বৃটিশ শাসকরা), অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতেন এবং গোপনে পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিলি করতেন। ডাকাতি ইত্যাদি কাজকে জনগণ কিন্তু খারাপ চোখে দেখতো না। স্বদেশি ডাকাতিকে শ্রদ্ধাভরেই দেখা হতো।

তারা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বৃটিশের শত্রুদেশের সঙ্গে প্রধানত জার্মানীর সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। জার্মানী থেকে অস্ত্র আসার কথা ছিল উড়িষ্যার সমুদ্র তীরে। সেই অস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে শত্রু সৈন্যের (অর্থাৎ বৃটিশ সৈন্যের) ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (যিনি বাঘা যতীন নামে পরিচিত ছিলেন) এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী। অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি শহিদ হয়েছিলেন বুড়িবালামের নদীর তীরে।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসের অরেকটি স্মরণীয় ঘটনা হলো, ১৯৩১ সালে মহান বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং চট্টগ্রামকে কয়েকদিনের জন্য স্বাধীন রাখা। পরে অন্যান্য জায়গা থেকে বৃটিশ সৈন্যরা এসে বিপ্লবীদের পরাজিত করে। চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে এক অসম যুদ্ধে অনেক বীর যোদ্ধা শহিদ হয়েছিলেন। সূর্য সেন এরপর চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে পলাতক থেকে সংগ্রামের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এক পর্যায়ে জনৈক বিশ্বাসঘাতকের কারণে ধরা পড়েন। পরে সেই বিশ্বাসঘাতককেও বিপ্লবীরা হত্যা করেছিলেন। সূর্য সেনের (এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের) ফাঁসি হয় ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি।

চট্টগ্রামের আরেক বীরকন্যা প্রীতিলতা সূর্য সেনের নির্দেশে ইংরেজদের ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে জীবন হারিয়েছিলেন ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের ইতিহাস আরও অনেক বড়ো। বাংলার বাইরেও সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতা ছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবের গদর পার্টির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

এক পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবীদের মনে স্বাধীনতার পথ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগতে থাকে। তাদের অনেকেই অনুভব করেন যে, ব্যক্তিগত সন্ত্রাস নয়,

BanglaBook.org

বরং রুশ বিপ্লবের মতো গণ বিপ্লবই হলো প্রকৃত পথ। বাংলার বিপ্লবীদের অধিকাংশই পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের ইতিহাসে আরেকটি নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তিনি হলেন ভগৎ সিং। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তার ফাঁসি হয়েছিল। মৃত্যুর আগে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রুশ বিপ্লবের মতো গণবিপ্লব ও সমাজতন্ত্রই হচ্ছে মুক্তির পথ। ফাঁসির অপেক্ষায় থাকা ভগৎ সিং জেলখানায় বসেই মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ

১৮৫৭ এর মহান সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়াও ছোটোখাটো অসংখ্য বিদ্রোহ হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। সেই সকল ঘটনার রেকর্ড খুব বেশি নেই। বিশেষভাবে আলোচিতও হয় না। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেতা কমরেড রবিন সেনের আত্মজীবনী মূলক 'পাঁচ অধ্যায়'-গ্রন্থে সেনাবাহিনীতে ছোটো বড়ো বিভিন্ন ধরণের বিদ্রোহের চমৎকার বর্ণনা আছে। লেখকের অভিজ্ঞতার মধ্যেই ছিল এই সকল বিদ্রোহ।

ভারতীয় সেনাবহিনীতে একসঙ্গে বিদ্রোহ সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে। এই বিদ্রোহের প্রধান পরিকল্পনাকারী ছিলেন মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। পরিকল্পনা মোটামোটি ঠিক মতোই ছিল। অভ্যুত্থানের তারিখও নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতকের কারণে অভ্যুত্থান আর হতে পারেনি। তার আগেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এ্যাকশন নিয়ে নেয়। বিভিন্ন স্থানে বৃটিশের ভাষায় ষড়যন্ত্রে (আমাদের ভাষায় মুক্তি সংগ্রাম) লিপ্ত থাকার অভিযোগে অনেক সৈনিককে গুলি করে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতে কিছু না হলেও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সেনানিবাসে সেনা অভ্যুত্থান হয়েছিল। কয়েকদিনের জন্য সিঙ্গাপুর বৃটিশ শাসনমুক্ত ছিল। পরে সিঙ্গাপুরে যুদ্ধজাহাজ এনে বৃটিশরা শহরটি পুনর্দখল করে। এরপর দলে দলে ভারতীয় সৈনিক ও নাগরিকদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় তা বৃটিশদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতারই পরিচয় বহন করে।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু যে এই অভ্যুত্থানের প্রধান সংগঠক ও পরিকল্পনাকারী ছিলেন তা-ও বৃটিশ সরকারের জানা হয়ে যায়। রাসবিহারী

BanglaBook.org

বসু পলাতক জীবন শুরু করেন। এক পর্যায়ে বৃটিশের চোখে ধুলো দিয়ে জাপানে পালিয়ে যান। জাপানেও প্রথমদিকে বেশ অসুবিধার মধ্যেই ছিলেন। পরে জাপানের এক বিপ্লবীর কন্যাকে বিয়ে করে জাপানী নাগরিকত্ব লাভ করেন। আরও পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন, পরবর্তীতে যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন আরেক মহান বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্র বসু।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। একপক্ষে ছিল বৃটিশ ও ফ্রান্স এবং অপরপক্ষে ছিল জার্মানী, ইতালি, জাপান। এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য রূপ। কলোনীর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে সাম্রজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ। প্রথমদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোনো পক্ষে যোগ দেয়নি, বরং দুই পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ করে ভালো ব্যবসা করেছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল বরাবরই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদী শক্তি হিটলারের জার্মানীর বিরুদ্ধে মৈত্রীচুক্তি করার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সকে বারবার আবেদন জানিয়ে আসলেও তারা তা করতে আগ্রহী ছিল না, বরং তারা চাচ্ছিল জার্মানী যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে সমাজতান্ত্রিক দুর্গ ভেঙে দেয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাধ্য হলো জার্মানীর সঙ্গে 'পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না' এমন চুক্তি করতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জানতো যে, ফ্যাসিস্ট জার্মানী যেকোনো সময় আক্রমণ করতে পারে। এমনকি বৃটেনের কাছ থেকেও আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এজন্য কিছুটা সময়ের দরকার ছিল। বৃটেন ও ফ্রান্স মৈত্রী চুক্তিতে রাজি না হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাধ্য হয়েছিল জার্মানীর সঙ্গে এমন চুক্তি করতে ১৯৩৯ সালে। এরপরই শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এক পর্যায়ে পার্ল হার্বারে জাপানীরা মার্কিন ঘাটিতে বোমা বর্ষণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জার্মানী-জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। ১৯৪১ সালে হিটলার চুক্তি লঙ্ঘন করে আচমকা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। এইভাবে যুদ্ধে দুইটি পক্ষ তৈরি হলো। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে জার্মানী, ইতালি, জাপান।

BanglaBook.org

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষকে বৃটেনের পক্ষে রাখার জন্য বৃটিশ রাজনীতিবিদরা নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। অন্যদিকে একমাত্র সুভাষ বসু বাদে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করতেই আগ্রহী ছিলেন তবে তারা বলেন যে, শৃঙ্খলিত দেশ কীভাবে যুদ্ধে সহায়তা করতে পারে? অন্যদিকে সুভাষ বসু ও আরও কিছু বামপন্থী দল মনে করেছিলেন, এটাই সময় ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার।

কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতা করার নীতি গ্রহণ করেছিল। তাদের স্লোগান ছিল "একটি ভাইও দেব না, একটি পাইও দেব না"। ('পাই' হচ্ছে ভারতীয় মুদ্রার ক্ষুদ্রতম অংশ)। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য ট্যাক্স দেব না এবং যুদ্ধে ভারতীয়রা সৈন্য হিসেবেও যোগ দেবে না। কিন্তু হিটলার যখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলো, তখন যুদ্ধের চরিত্রও বদলে গেল। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বরূপে যুদ্ধ শুরু হলেও এই পর্যায়ে তা জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। কারণ দুনিয়ার শোষিত মানুষ ও পরাধীন জাতিসমুহের মুক্তির দুর্গ সমাজতান্ত্রিক দেশই আক্রান্ত হয়েছে। তখনকার পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করাই ছিল সকল মুক্তিকামী মানুষের কর্তব্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সেই জনযুদ্ধের লাইন নিয়েছিল।

এবার সুভাষ বসু প্রসঙ্গে আসা যাক। সুভাষ বসু তখন কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন। স্বয়ং গান্ধীসহ কংগ্রেসের সকল নেতৃত্ব অত্যন্ত জঘন্য যে কাজটি করেছিলেন তা হলো, সুভাষ বসুকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা। একদিকে কংগ্রেস নেতারা যখন শাসক ইংরেজের সঙ্গে দেনদরবার নিয়ে ব্যস্ত, অপরদিকে তখন একমাত্র সুভাষ বসুই সংগ্রামী লাইন গ্রহণ করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাকে গৃহবন্দি করা হয়। বিপুল সংখ্যক গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারির মধ্যে ছিলেন তিনি। কিন্তু নেতাজি সুভাষ বসু অন্তরীণ অবস্থা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ভারতের সীমানা অতিক্রম করে প্রথমে আফগানিস্তান যান। সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে দিয়ে জার্মানীতে পৌছান। তখনও পর্যন্ত সোভিয়েত-জার্মানী মৈত্রী চুক্তি বলবৎ ছিল।

নেতাজি সুভাষ বসু জার্মানীতে বসে রেডিওতে বৃটিশ বিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য বস্তুতঃ তিনি প্রথমে সোভিয়েত

BanglaBook.org

ইউনিয়নের সাহায্য চেয়েছিলেন। তদানিন্তন বিশ্বপরিস্থিতিতে সোভিয়েতের পক্ষে সেই সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে নেতাজিকে সোভিয়েত ভূমির উপর দিয়ে মস্কো হয়ে বার্লিনে যাবার সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল সোভিয়েত সরকার। হিটলারের আশ্রয়ে থাকলেও হিটলার নেতাজিকে দিয়ে সোভিয়েত বিরোধী কোন বক্তব্য দেয়াতে পারেননি। বরং হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করলে নেতাজি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

নেতাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জার্মানীতে বসে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বেশি কিছু করা যাবে না। তিনি জাপানে যাবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় জাপানে যাবেন কীভাবে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই রাসবিহারী বসু জাপানে অবস্থান করছেন এবং তিনি জাপ সরকারের বিশ্বস্থতা অর্জন করেছেন। তিনি জাপ সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। বৃটিশ বাহিনীর পক্ষ হয়ে যে সকল ভারতীয় সামরিক অফিসার ও সৈনিক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে জাপানের হাতে বন্দি হয়েছেন, রাসবিহারী বসু বললেন, তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হোক। তারাই এখন জাপানের সহায়তায় ভারতীয়দের প্রধান শত্রু দখলদার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। জাপান তাতে সম্মত হয়েছিল। এভাবে জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় সৈনিকদের দিয়ে গঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

রাসবিহারী বসু নেতাজি সুভাষ বসুকে আমন্ত্রণ জানালেন এই ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু কীভাবে নেতাজি পৌঁছাবেন জাপানে? একটাই পথ ছিল– সাবমেরিনে করে উত্তর সাগর, ইংলিশ চ্যানেল, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে পৌঁছানো যেতে পারে। তাই করা হলো। এটা ছিল এক দুঃসহসী অভিযান। বিপ্লবীরা প্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে ভয় পান না। নেতাজি এই পথে প্রথমে সিঙ্গাপুর ও পরে জাপান পৌঁছেছিলেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

জাপানের সহায়তায় তিনি পূর্ব ফ্রন্টে ইংরেজদের পরাজিত করে ভারতের মনিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামরিক কারণেই পিছিয়ে আসতে হয়। এদিকে জাপানে এটম বোমা পড়ে ১৯৪৫ সালের ৬ (হিরোশিমা) ও ৯ (নাগাসাকি) আগস্ট। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পন করেছিল। ১৭ই আগস্ট নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ বিমানে করে কোথায় যাত্রা করেছিলেন তা ঠিক জানা যায় না।

BanglaBook.org

এরপর তিনি নিখোঁজ হয়ে গেলেন। এই মহান বিপ্লবীর জীবনের শেষ অংশটুকু রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে।

যুদ্ধে জাপান পরাজয় বরণ করে ও আত্মসমর্পন করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য নেতা ও সৈনিকদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বন্দি করে বিচার শুরু করে দিল্লীর রেড ফোর্টে।

এই বিচারের বিরুদ্ধে সারা দেশে চরম বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। যে কংগ্রেস নেতাজির বিরোধিতা করেছিল তারাও তখন জনগণের চাপে বিচারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে, সুভাষ যদি ভারতে আসেন, তবে তিনি মুক্ত তরবারি হাতে তাঁকে প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি বুঝে তারা সুর পাল্টালেন। জাতীয় কংগ্রেস বিচারের নিন্দা করলেন। এমনকি অভিযুক্তদের সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস একটি কমিটিও গঠন করেছিল। কিন্তু এই ইস্যুকে নিয়ে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে উঠুক তা তারা চাননি। তবে গণ আন্দোলন সব সময় নেতাদের ইচ্ছাধীন থাকে না। এবারও ছিল না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে গণ উত্তাল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকরা বৃটিশের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রদ্রোহিতার 'অপরাধে' তাদের বিচার শুরু করে। কিন্তু জনগণের চোখে তারা ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক। এই বিচার প্রক্রিয়া জনগণের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। জনগণের মনোভাব বুঝে কংগ্রেসও বিচারের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এমনকি বৃটিশের অনুগত মুসলিম লীগও মুসলমান জনগণের চাপের কারণে বিচারের প্রতিবাদ জানায়। তবে কংগ্রেস বলে যে, আন্দোলন হবে অহিংস। এবং মুসলিম লীগও বলে যে, আন্দোলন পরিচালিত হবে নিয়মতান্ত্রিক পথে। কিন্তু জনগণের মনোভাব ছিল অন্যরকম। তারা বৃটিশ শাসকদের দেওয়া কোনো বাধা নিষেধ মানতে রাজি ছিল না।

১৯৪৫ সালের ২২শে নভেম্বর বিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে কোলকাতায় এক বিশাল মিছিল বের হয়েছিল যাতে শ্রমিক, ছাত্র, নিম্নমধ্যবিত্ত ও অফিস কর্মচারীরা যোগ দিয়েছিলেন। কোলকাতা পৌরসভার শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। কয়েকদিন ধরে পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ট্রাম বাস বন্ধ ছিল। বাংলার ইংরেজ গভর্নর পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সেনাবাহিনী তলব করেন।

BanglaBook.org

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন রশিদ আলীকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ১৯৪৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোলকাতায় টানা গণ প্রতিরোধ চলতে থাকে। তা প্রচণ্ড গণপ্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নিয়েছিল। কোলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ মিলিটারি গুলি করে। বিক্ষুব্ধ জনতা মিলিটারি পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কোলকাতাগামী ট্রেনে জনগণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিল।

এই গণ প্রতিরোধ সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই আন্দোলনে সর্বমোট ৪৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল।

জনগণের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে হরতাল ডাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সম্মত হয়নি। তবে কংগ্রেসের মতামতকে উপেক্ষা করেই জনগণ সারা শহরে হরতাল পালন করেছিল। রশীদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় যে গণ আন্দোলন হয়েছিল তাকে ভিত্তি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'চিহ্ন' নামে একটি অসাধারণ উপন্যাস।

এই আন্দোলন প্রধানত কোলকাতাতে হলেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য শহরেও– দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, এলাহাবাদ, মাদ্রাজে। বোম্বাইয়ের শ্রমিকরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

নৌ-সেনা বিদ্রোহ

১৯৪৬ সালে বোম্বাই শহরে নৌসেনাদের বিদ্রোহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ঘটনা।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে বোম্বাই শহরে প্রথমে ঘটনা ঘটেছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীতে। বিমান বাহিনীর ভারতীয় অফিসাররা ধর্মঘট করেছিলেন। একজন বৃটিশ অফিসার কর্তৃক একজন ভারতীয় পাইলটকে অপমান করার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট। বলা বাহুল্য, সেনাবাহিনীতে ধর্মঘট কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ বিমান বাহিনী থেকে নৌ বাহিনীতে প্রসারিত হয়েছিল। নাবিকদের নানা ধরণের আর্থিক দাবীদাওয়ার (খারাপ

BanglaBook.org

খাবার দেওয়া হতো, এটাও বিক্ষোভের একটি কারণ ছিল) পাশাপাশি বৃটিশ অফিসারদের জাতি বিদ্বেষমূলক আচরণও নৌ সেনাদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। আরম্ভ হলো ধর্মঘট যা দ্রুত বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল।

১৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) প্রথমে বোম্বাইয়ে অবস্থিত 'তলোয়ার' জাহাজে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। পরদিন সকালের মধ্যেই সমুদ্রে অবস্থিত ২টি জাহাজে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করেছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশি ছিল।

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট দিয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা। স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হয়েছিল। তারা অহিংস পথে সংগ্রাম পরিচালনা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটীদের উপর হিংস্র আক্রমণ চালায়। তারা সেনা ব্যারাকের উপর গুলি চালায়। সাতঘন্টা ধরে দুপক্ষে যুদ্ধ চলে। এভাবে স্ট্রাইক বিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল।

করাচী, দিল্লী, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম, কোলকাতায় নৌ বাহিনীর ভারতীয় সদস্যরা ধর্মঘটে যোগদান করেন। করাচীতে অবস্থানরত 'হিন্দুস্তান' জাহাজের ধর্মঘটী নৌ সেনাদের উপর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গুলি চালালে সেখানেও যুদ্ধ হয়। তবে ২৫ মিনিটের যুদ্ধে ভারতীয়রা পরাজিত হন। তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। বিদ্রোহীদের সমর্থনে করাচিতে হরতাল পালিত হয়েছিল। পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয়েছিল।

স্ট্রাইক কমিটির পক্ষ থেকে যে সকল দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তা ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উপাদানে ভরা, পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক। ইন্দোনেশিয়া থেকে সকল ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে– এটাও দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি কলোনী ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া) ও ডাচ (ওলন্দাজ) কলোনী ইন্দোনেশিয়া জাপানের দখলে চলে গিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে জাপান পরাজিত হলে এই দেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে (ভিয়েতনামে হো চি মিনের নেতৃত্বে এবং ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্নের নেতৃত্বে)। বৃটিশ, ফরাসি, ডাচ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এই স্বাধীনতাকে মেনে না নিয়ে পুনরায় কলোনী দখলের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই সকল দেশে সৈন্য প্রেরণ করে। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কংগ্রেসও 'দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া' দিবস পালন করার (২৫শে অক্টোবর ১৯৪৫) সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমনকি মুসলিম লীগও বাধ্য হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের এই কাজকে সমালোচনা করতে।

BanglaBook.org

ইন্দোনেশিয়াতে সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য বোঝাই যে জাহাজ পাঠানো হচ্ছিল, তাতে মাল তুলতে অস্বীকার করেছিলেন বোম্বাই ও কোলকাতার ডাক শ্রমিকরা।

ধর্মঘটী নাবিকদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে ছিল–

- ধর্মঘটীদের গ্রেফতার ও দণ্ডাদেশ দেয়া চলবে না।
- বৃটিশ সেনাদের সমান ভারতীয়দের ভাতা ও খাদ্য দিতে হবে।
- ইন্দোনেশিয়া থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।
- আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার বন্ধ করতে হবে।
- তলোয়ার জাহাজের যে বৃটিশ অফিসার ভারতীয়দের অপমান করেছিল, তাকে বরখাস্ত করতে হবে।

নৌ বিদ্রোহীরা বৃটিশ রাজকীয় পতাকা জাহাজ থেকে নামিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়িয়েছিলেন। তারা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টি বোম্বে শহরে হরতালের ডাক দিয়েছিল। বোম্বাইয়ের কারখানা সমূহের দুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে শহরে বিশাল শোভাযাত্রা করেছিলেন। শহরে বৃটিশ মিলিটারী ও পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সকল সংঘর্ষে ২৭০ জন নিহত হন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নৌ বিদ্রোহীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। গান্ধী, নেহেরু, আজাদ, প্যাটেল সকলেই এই বিদ্রোহের সমালোচনা করেছিলেন। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পনের উপদেশ দেন। অবশেষে সর্দার প্যাটেলের উপদেশ অনুযায়ী বিদ্রোহী নাবিকরা আত্মসমর্পন করেন। তবে তাঁরা বলেন, 'আমরা আত্মসমর্পন করছি, তবে বৃটেনের কাছে নয়, ভারতের কাছে।'

এভাবে মহান নৌ বিদ্রোহের করুণ পরিণতি ঘটলেও তা ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে থেকে যাবে। সেদিনও নৌ বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও তা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দারুণভাবে এগিয়ে নিয়েছিল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এটাও বুঝতে পেরেছিল যে তাদের রাজত্বের দিন শেষ হয়ে আসছে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আপোষ করে দ্রুত ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে যে সকল ঘটনা কাজ করেছিল তার মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ ও নৌ বিদ্রোহ অন্যতম বলে বিবেচিত হবে।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ তেরো

কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক কৃষকের সংগ্রাম

আদিপর্বের শ্রমিক আন্দোলন

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দুইটি পূর্বশর্ত আছে। ১. পুঁজিবাদের অভ্যুদয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ২. বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা এই দেশের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছিল এবং স্বতঃস্ফূর্ত ও তীব্র শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়। পুঁজিবাদীদের মধ্যে বৃটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতি উভয়ই ছিল যদিও তখন ভারতীয় পুঁজিপতিদের মাত্র বিকাশ শুরু হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কাপড় মিল, জুট মিল, রেলওয়ে এই সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি ছিল খুবই কম। শ্রমদিবস ছিল ষোলো-সতেরো ঘণ্টা পর্যন্ত। বাসস্থান, চিকিৎসা এই ধরণের সুবিধার তো প্রশ্নই ওঠে না (অনেকটা আমাদের দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের মতো অথবা এঙ্গেলসের লেখা 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' গ্রন্থে বর্ণিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংলন্ডের শ্রমিকদের মতো)। এই অবস্থার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণী কেবল বিক্ষোভই প্রকাশ করেনি, কাজ বন্ধ রাখা, ধীরগতিতে কাজ করা (Go Slow), দলবদ্ধভাবে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা এই ধরণের কৌশলও অবলম্বন করেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক স্তর বলা যেতে পারে। প্রথম সংগঠিত ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৭৭ সালে নাগপুরের টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ আরও বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বৃটিশ পুঁজিপতিরা ভারতীয় পুঁজিপতিদের কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তার

BanglaBook.org

ক্ষতিকর প্রভার জনগণের বিশেষ করে শ্রমিক কৃষকের উপর দারুণভাবে পড়েছিল। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় শ্রমিকদের প্রথম জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন AITUC (নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) ১৯২০ সালে। এর সভাপতি নির্বচিত হয়েছিলেন লালা লাজপত রাই। এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনটি কংগ্রেসের সংস্কারবাদী উদারপন্থীদের দ্বারা গঠিত হলেও তা ক্রমাগত র‍্যাডিকাল শ্রমিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল যেখানে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টপন্থীদের একটা ভালো অবস্থান ছিল। ১৯২৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত এই সংগঠনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। AITUC গঠনের অল্প দিনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। বোম্বে, মাদ্রাজ (চেন্নাই), কানপুর, কোলকাতা, নাগপুর এবং আহমেদাবাদে। এই সময় বাংলায় চটকল শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট হয়েছিল। ধর্মঘট পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছিল বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশন। প্রায় একই সময়ে খড়গপুর, লিলুয়া এবং দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘস্থায়ী রেলশ্রমিক ধর্মঘটও দেখা গিয়েছিল। AITUC'র মধ্যে কমিউনিস্টরাই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আবার এর অন্তর্ভুক্ত অগ্রণী শ্রমিকরা কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। ১৯২৬ সালে সারা ভারতে দুইশ ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল যার মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। এই ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ৫৭টি ইউনিয়ন AITUC'র সঙ্গে যুক্ত ছিল যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার। কমিউনিস্টরা এই সংগঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে কমিউনিস্টদের কাজ করার ব্যাপারটি এত সহজ ছিল না। বৃটিশ শাসক ও মিল মালিকদের নির্যাতন মোকাবেলা করেই তারা জেল জুলুম ও জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলন করতে গিয়ে কত নিরীহ শ্রমিক এবং কমিউনিস্ট কর্মী গুলিতে নিহত ও কারারুদ্ধ হয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে সংখ্যাটি বিরাট হবে।

মূলত কমিউনিস্টদের প্রভাবের কারণেই ১৯২৪ সালে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈজিক লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা হলো—

BanglaBook.org

১. বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভরতবর্ষের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি

২. পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

AITUC'র এই কর্মসূচি তখনকার কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে একেবারেই ভিন্ন।

কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতারা এই সংগঠনকে সংস্কারবাদী আপোষমুখী কর্মসূচির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে যেন সমঝোতা থাকে এবং শোষণ থাকলেও তা যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে ও শ্রমিকরা তা যেন মেনে নেয়। কংগ্রেসের কট্টর প্রতিক্রিয়াশীলরা AITUC'র বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগ মুহূর্তে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের ৩ ও ৪ মে কংগ্রেস পরিচালিত হিন্দুস্তান মজদুর সেবক সংঘ দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করে। সেই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন এবং কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে শ্রমিক সংগঠন করার আহ্বান জানান। একই সভায় বোম্বের কংগ্রেসী মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ বললেন, 'তাই, আজকের সর্বাপেক্ষা জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে মূলগতভাবে কমিউনিস্টবিরোধী যে শ্রমিকরা ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে আছেন তাদের সমন্বয় সাধন করবার জন্য একটা সাংগঠনিক ব্যবস্থা করা।'

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার এবং আন্তর্জাতিকের ভূমিকা

রুশ বিপ্লবের প্রভাব সারা বিশ্বে যেমন পড়েছিল তেমনই ভারতেও পড়েছিল। এই দেশের অনেক শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী মানুষ রুশ বিপ্লবের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একসময় যারা তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র পথ গ্রহণ করেছিলেন তাদের সামনেও রুশ বিপ্লব একটা মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। তারা দলে দলে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করতে শুরু করেন। এটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছিল। বিপ্লবী ভগৎ সিংও ফাঁসির আসামী অবস্থায় গোপনে লেনিনের লেখা ও মার্কসবাদী

BanglaBook.org

সাহিত্য পাঠ করে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। একটা সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী দল (যাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলা হতো) হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক আর্মি কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বহু নেতা ও কর্মী পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় করাচির সেনানিবাসে অবস্থানকালে কবি নজরুল ইসলাম লাল ফৌজের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। আরও জানা যায়, মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত বৃটিশ বাহিনীর অনেক ভারতীয় সৈন্য লাল ফৌজের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। ভারতবর্ষে অনেক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিক আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা অনেক অগ্রণী চিন্তার নেতা কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলার কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ এবং বোম্বের শ্রীপাদ অমৃত দাঙ্গে। কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহন করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটো ছোটো কমিউস্টি গ্রুপ তৈরি হতে থাকে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত কোন কেন্দ্রীয় কাঠামো তৈরি হয়নি। যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার জন্য উদ্যোগ ছিল। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মতে কররেড মুজাফ্ফর আহমেদ হচ্ছেন ভারতরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।

রুশ বিপ্লবের আগেও বিদেশে অবস্থানরত কোনো কোনো বিপ্লবী মার্কসবাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা ভারতে প্রচারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিদেশে অবস্থানরত গদর পার্টি (প্রধানত পাঞ্জাবীদের মধ্যে) যার হেড কোয়ার্টার ছিল আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে, তারাও এক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন।

এমনকি রুশ বিপ্লবের আগেই দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্টুডগার্ড কংগ্রেসে (১৯০৭) প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কেউ কেউ অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের সাথে লেনিনেরও কথা হয়েছিল।

তবে প্রধানত বিদেশে অবস্থানরত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জী লেনিন প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভারতে গোপন পথে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারে ভূমিকা রাখেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে অবনী মুখার্জী যোগদান করেছিলেন।

ভারতের মার্কসবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রেখেছিলেন এম এন রায়। যদিও তিনি একদা সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,

BanglaBook.org

পরবর্তীতে তিনি মেক্সিকোতে পালিয়ে যান এবং মেক্সিকোতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনিও উপস্থিত ছিলেন, তবে ভারতের নয় মেক্সিকোর পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে। কংগ্রেসে তিনি ভারতের বিপ্লব প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে লেনিনের সঙ্গে তার মতদ্বৈধতা তৈরি হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়ার যে ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে (যা লেনিনের কলোনীয়াল থিসিসের অন্তর্ভুক্ত) তা এম এন রায় অস্বীকার করে একটি অতি বাম লাইন তুলে ধরার চেষ্টা করেন। অবশ্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই কংগ্রেস এম এন রায়ের বক্তব্য গ্রহণ করেনি, বরং লেনিনের কলেনিয়াল থিসিস গৃহীত হয়েছিল। যাই হোক, পরবর্তীতে তিনি মস্কোতে অবস্থান করতে থাকেন এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্বাহী (এক্সিকিউটিভ) কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতে মার্কসবাদ প্রচার এবং পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আরও পরে ১৯২৯ সালে তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি মার্কসবাদ পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প হিসেবে ভারতবর্ষে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন যা কোন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেনি। এইভাবে একজন গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবীর অধঃপতন ঘটেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির জন্মকাহিনি

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে উঠতে থাকে। তবে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন মানুষ ও কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো সরকারি অত্যাচারের মুখে পড়ে। প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রচার করা বা সংগঠিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কমিউনিস্টরা আত্মগোপনেই তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারতীয় কমিউনিস্টদের কৌশল হিসেবে 'শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' নামে পার্টি গঠনের পরামর্শ দেয়, যে পার্টি হবে সামন্ত বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি মঞ্চ। 'শ্রমিক এবং কৃষক পার্টি' শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদেরকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জমায়েত করবে। তবে আত্মগোপনে কমিউনিস্ট পার্টিও থাকবে যা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং

BanglaBook.org

মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শকে ধারণ করবে। শ্রমিক ও কৃষক পার্টি (Workers and Peasants' Party) প্রথমে গঠিত হয় বঙ্গ প্রদেশে প্রধানত কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের উদ্যোগে ১৯২৫ সালে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়াও বোম্বে, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবেও এই পার্টি গঠিত হয়েছিল। শ্রমিক এবং কৃষকের পার্টি (Workers and Peasants' Party) শ্রমিক এবং কৃষকের স্বার্থে সংগ্রাম করেছিল। তারা জমিদারি ব্যবস্থার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। তবে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতের প্রধান কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেফতার হলে এবং কমিউনিস্টদের উপর নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছালে শ্রমিক ও কৃষক পার্টিও আর তৎপরতা অব্যাহত রাখতে পারেনি। এবং ১৯৩০ সালের আগেই তা কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কমিউনিস্ট পার্টি নামে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল দুবার দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ভারতে খেলাফত আন্দোলন শুরু হলে অনেক মুসলিম তুরস্কের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তাদের একটি অংশ যাওয়ার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশিয় অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে ৩০ জন ব্যক্তি তাসখন্দে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ২১ জন University of Toiliers of East এই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন এবং মার্কসবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ১৯২০ সালে এম এন রায়ের উদ্যোগে এক গ্রুপ সদ্য দীক্ষিত ভারতীয় মার্কসবাদীদের নিয়ে (যাদের অধিকাংশই ছিলেন মুহাজির) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ শফিক। এই পার্টির নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে ফেরার পথে প্রায় সকলেই গ্রেফতার হন এবং তাদের বিরুদ্ধে পেশোয়ারে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় এবং তারা দীর্ঘ কারাবাস ভোগ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তাসখন্দে গঠিত এই পার্টির প্রতিষ্ঠাকালকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করে। বস্তুত এই পার্টি ভারতবর্ষে কোন কাজই করতে পারেনি। এদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) অন্য একটি ঘটনাকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠকাল হিসেবে গণ্য করে থাকে। ১৯২৫ সালে জনৈক সাংবাদিক হঠাৎ করে কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতে

BanglaBook.org

অবস্থিত গোপন কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর সঙ্গে এই সম্মেলনের কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবু তাদের অনেকে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলন আহ্বানকারীদের মধ্যে ছিলেন বামপন্থী কংগ্রেস নেতা হসরত মোহানী যিনি অক্টোবর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনিই প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২১ সাল) পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছিলেন (গান্ধীজি এই প্রস্তাবকে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে নিন্দা করেছিলেন)। যাই হোক, কানপুরে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টিও কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

প্রকৃতপক্ষে একটি কার্যকরি কেন্দ্রীভূত সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল আরও পরে। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা মুক্তি লাভ করার পরেই। তাসখন্দ বা কানপুর পার্টির কোনো পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচিও ছিল না। মিরাট মামলার আসামীদের মুক্তির পরই ১৯৩৩ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি রচিত হয়েছিল যা ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল এবং পার্টি কমিন্টার্নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা

বৃটিশ রাজ প্রথম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভীত ছিল এবং চরম দমননীতি প্রয়োগ করেছিল। কমিউনিস্ট মাত্রই অপরাধী এবং তাদের জন্য কারাগার ও অন্যান্য ধরনের নির্যাতন প্রাপ্য ছিল। তারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করতে থাকে।

১. পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২২-২৪)
২. কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) এবং
৩. মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯)

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা সাড়ে চার বছর ধরে চলে। এই মামলার আসামীদের মধ্যে তিনজন আসামী বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন ফিলিপ স্প্রাট, বেঞ্জামিন এফ ব্র্যাডলি, এইচএল হাচিনসন। কমরেড মুজাফফর আহমেদ, এসএ ডাঙ্গে, পি সি যোশি'র মতো কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। এছাড়া কয়েকজন ছিলেন যারা সরাসরি কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা

BanglaBook.org

ছিলেন। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অভিযুক্তরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে দাবি করেন এবং তাঁদের মতাদর্শ কোর্টের সামনে প্রচার করেন। ১৮ জন কমিউনিস্ট আসামী তাঁদের জবানবন্দীতে বিশ্ব পরিস্থিতি, জাতীয় পরিস্থিতি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতা এবং স্বাধীন ভারতের জন্য জাতীয় বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও রণনীতি, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও কৃষি বিপ্লবের কৌশল তুলে ধরেন। তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য গোপন না করে বলেন যে তাঁদের বিপ্লব হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি এবং সামন্ত ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অবসান। তাঁরা কোর্টের মঞ্চকে কমিউনিস্ট আদর্শ ও তাঁদের কর্মসূচি প্রচারের জন্য সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

এই মামলা সারা বিশ্বেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন, ফরাসি লেখক রোমা রোলা, ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেরল্ড লাস্কি'র মতো মনিষীরাও মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের পক্ষে এবং বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। ভারতবর্ষে এই ধরনের আন্তর্জাতিক সংহতি তার আগে কখনই দেখা যায়নি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন তো বটেই, তাছাড়াও বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং অনেক বিশ্ব মনিষী এবং ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও আসামীদের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তারা মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহও করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণী, মধ্যবিত্ত এবং অনেক অকমিউনিস্ট দেশপ্রেমিক মানুষও অর্থ-প্রদান করেছিলেন। তারা আসামীদের নৈতিক মনোবল, সাহস এবং বিপ্লবের বাণী দ্বারা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আসামীদের মামলা পরিচালনা, খাদ্য ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মতিলাল নেহেরু এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তারই পুত্র জওহরলাল নেহেরু। অবশ্য পরবর্তীতে জওহরলাল নেহেরু সম্ভবত কমিউনিস্টদের একটু খাটো করার জন্য বলেছিলেন যে কমিউনিস্টদের পক্ষে আইনগত লড়াইয়ের জন্য মানুষ নাকি অর্থ সাহায্য করতে খুব আগ্রহী নয়। এই মামলার রায়ে মুজাফফর আহমেদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অন্যান্যদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। পরে পরিস্থিতির চাপে আসামীরা মুক্তিলাভ করেছিলেন। অবশ্য মিরাট ষড়যন্ত্রের আগে এবং পরে বৃটিশ আমলের প্রায় বেশি ভাগ সময়েই পার্টিকে গোপনে অথবা অর্ধ গোপনে কাজ করতে

BanglaBook.org

হয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বরাবরই কমিউনিস্ট ভীতি কাজ করত। ১৯২৯ সালে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড আরউইন লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলিতে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, 'কমিউনিস্ট মতবাদের প্রসার আমাদের জন্য বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' একই বৎসর 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' লিখেছিল, 'গত দুই বৎসর ধরে দেখা যাচ্ছে যে শিল্প শ্রমিকরা শয়তান কমিউনিস্ট সংগঠকদের হাতে চলে যাচ্ছে।'

১৯৩৭ সালের বৃটিশ ইন্ডিয়ার এ্যাক্ট অনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আইনসভার বির্নাচন হয়েছিল এবং বিভিন্ন প্রদেশে সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন স্বদেশী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ছিল। সেই সময় কোন কোন প্রদেশে কমিউনিস্টরা প্রকাশ কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কমিউনিস্টরা আবার আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। পার্টি বেআইনী হয়। ১৯৪২ সালে পার্টি ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলে তাঁরা প্রকাশ্য কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছিল। শেরে বাংলা ফজলুল হক উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তাঁর কাগজে মুজাফফর আহমেদ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম কৃষক শ্রমিকের পক্ষে লিখতে পারতেন। তিনি খুবই জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ঋণ সালিশী বোর্ড করে অনেক গরিব কৃষককে মহাজনদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ফজলুল হকও কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এবং কখনওই সরাসরি বৃটিশ বিরোধীও ছিলেন না। সেই সময় বাংলার দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার পাটকলের শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলে ফজলুল হক কমিউনিস্টদের দোষারোপ করেছিলেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন 'এই ঘটনা ভারতকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবে।' এই মন্ত্রীসভায় জমিদারদের প্রাধান্য ছিল। ফজলুল হক আন্দামান বন্দি ও রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। সেই মন্ত্রীসভার জনৈক মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলী জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং রাজবন্দির মুক্তির দাবীতে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন (পরবর্তীতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংস্লিষ্ট হয়েছিলেন)।

নির্যাতন সহ্য করে এবং অসামন্য আত্মত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টি মেহনতি মানুষের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। তবে তারা জাতীয় নেতৃত্ব

BanglaBook.org

গ্রহণ করতে পারেননি। আমরা এখন পার্টির বিরাট সংগ্রামী ঐতিহ্য সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় যে ভুলগুলো করেছিল তা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

রাজনীতিতে নতুন বিপ্লবী ধারা

১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট পার্টি Platform of Action নামে একটি রাজনৈতিক দলিল উপস্থিত করে। ভারতের ইতিহাসে সেটাই ছিল প্রথম সুসংহত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি। কংগ্রেস পুরনো পার্টি হলেও কখনওই কোনো পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত কর্মসূচি দিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক পার্থক্যটি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত কংগ্রেস প্রথম দিকে বৃটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছিল। পরবর্তীতে তারা স্বরাজ শব্দটি ব্যবহার করলেও তার অর্থটি অপরিষ্কার ছিল। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি কংগ্রেস অনেক পরেই উত্থাপন করেছিল। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস এবং গান্ধী বৃটিশের সহযোগিতা করেছিলেন। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে বৃটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কংগ্রেস বৃটিশ রাজাকে অভিনন্দিত করেছিল। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি এবং পার্টি গঠনের পূর্বেও যেসকল কমিউনিস্ট গ্রুপ কাজ করছিলেন তারা সকলেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন। দ্বিতীয়ত কমিউনিস্ট পার্টি কেবল সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের কর্মসূচিই গ্রহণ করেনি তাদের কর্মসূচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতবাদের মধ্যেই ছিল সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্যের অবসান। যেমন নারী পুরুষের সমান অধিকার, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, অস্পৃশ্যতাকে বেআইনী করা, ধর্মীয়-জাতিগত-ভাষাগত বৈষম্যের উচ্ছেদ, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান– এই বিষয়গুলোও কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির ও কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ছিল। মার্কসীয় মতবাদের মধ্যেই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানের বিষয়টি রয়েছে।

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতারা সামজিক বৈষম্য দূরীকরণের কোন উদ্যোগ নেননি। যদিও গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে আন্তরিক ছিলেন, তবুও একথা সত্য যে তিনি অনেক বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণা লালন করতেন। তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার করলেও হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ তাঁর মতে এই

BanglaBook.org

জাতিভেদ প্রথা ব্যবস্থাটি হিন্দুধর্মের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই নিয়ে ভারতের সংবিধানের প্রণেতা এবং রাজনৈতিক নেতা ডক্টর আমবেদকারের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী নেতা যিনি বৃটিশ বিরোধী সাহসী অবস্থানের জন্য বারবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন এবং যার মুক্তির দাবিতে শ্রমিকরা ধর্মঘট পর্যন্ত করেছিলেন সেই বাল গঙ্গাধর তিলকও প্রকাশ্যে বর্ণপ্রথার (Caste System) সমর্থক ছিলেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্যটি ছিল মৌলিক। কংগ্রেস কখনওই ভারতীয় মালিকানাধীন মিল কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটকে ভালো চোখে দেখেনি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশের ফলেই শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছিল। বিশের দশকের যে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল কংগ্রেস নেতারা তাকে উপেক্ষা ও ভীতির চোখেই দেখত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২৮ সালে ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক দীর্ঘমেয়াদী ধর্মঘটে নেমেছিল। পরের বৎসর ধর্মঘটীর সংখ্যা আরও ৩২ হাজার বৃদ্ধি পায়। এই সকল সংগ্রামে কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকলেও কংগ্রেস নেতারা দূরেই ছিলেন। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার পর শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৩৩ এবং '৩৪ সালে কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সারা ভারতে টেক্সটাইল শ্রমিকদের ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনকে বহদূর অগ্রসর করে নিয়েছিল। কংগ্রেস নেতারা হয় উপেক্ষা করেছেন অথবা সুকৌশলে বিরোধীতা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবির মধ্যে রাজবন্দিদের মুক্তি, বিশেষ করে আন্দামান ও অন্যত্র বন্দি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের (তথাকথিত সন্ত্রাসীদের) মুক্তির দাবীটিও ছিল। কংগ্রেস নেতারা অহিংসার অজুহাত ধরে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের প্রতি কখনওই সহানুভূতি প্রকাশ করেননি।

১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কিষাণ সভা গঠিত হয়েছিল। মাত্র দুই বৎসর পর দেখা গেল তার সদস্য সংখ্যা ৫ লক্ষেরও বেশি হয়ে গেছে। ১৯৩৮ সালের দিকে কিষাণ সভার নেতৃত্বে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল খাজনা কমানো, বেআইনী খাজনা বন্ধ করা, জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা ইত্যাদি। বিভিন্ন স্থানে বংশানুক্রমিকভাবে প্রজারা জমিদারদের জন্য বেগার খাটতে বাধ্য হত। এর বিরুদ্ধেও কিষাণ সভা সংগ্রাম করে

BanglaBook.org

এসেছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে আংশিক জয়লাভও করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং কিষাণ সভা দাবি তুলেছিল জামিদারি প্রথা পরিপূর্ণরূপে উচ্ছেদ করতে হবে। কংগ্রেস কখনওই জামিদারদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। তিরিশের দশকে কিষান সভার নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিরাট মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত হয়েছিল যেখানে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সংগ্রামী কৃষক সমবেত হতেন। এই সকল লড়াইয়ের সঙ্গে কংগ্রেস বা গান্ধীবাদী আন্দোলনের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না।

কংগ্রেসের সবচেয়ে র‍্যাডিকাল নেতা ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। কখনও কখনও তিনি সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আগে জমিদার ও কৃষকের সংঘর্ষ, আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংগ্রামকে তিনি ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। তবে সুভাষ চন্দ্র বসুর বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র এবং তার আন্তরিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে না। কংগ্রেসের আরেক নেতা জওহরলাল নেহেরু সমাজতন্ত্রের কথা খুব জোরেসোরেই বলতেন। তবে তার সেই সমাজতন্ত্রের স্লোগানটি কৌশলী ছিল বলেই মনে হয়। কারন তিনি সমাজতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিতেন তা ছিল যথেষ্ট অস্বচ্ছ ও গোঁজামিলে পরিপূর্ণ।

বিশ্বযুদ্ধ থেকে দেশবিভাগ-কমিউস্টি পার্টির ভূমিকা

১৯৩৯ সালে ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ শুরু হলো। সেটাই বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধের বাইরে ছিল। এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে কলোনী দখল ও লুটের ভাগ নিয়ে মারামারি। কমিউনিস্ট পার্টি স্লোগান তুলল 'একটি পাইও না, একটি ভাইও না' ('পাই' অর্থ সেই সময়ের ভারতীয় মুদ্রার ক্ষুদ্রতম অংশ)। অর্থাৎ তারা এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বৃটিশকে কোনোভাবে সহযোগিতা করবে না। পার্টি জনগনকে যুদ্ধের জন্য কর দিতে নিষেধ করেছিল। 'একটি ভাইও' না অর্থাৎ বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কোন ভারতীয় যোগদান করবে না। যুদ্ধবিরোধী এই সাহসী অবস্থানের জন্য পার্টির উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। সেই সময় কংগ্রেস নেতারা শর্ত সাপেক্ষে (যদি বৃটিশ রাজ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ধরনের কিছু কনসেশন দিতে রাজি হয়) যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। ১৯৪২ সালের

BanglaBook.org

আগস্ট মাসে গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের আগ পর্যন্ত কংগ্রেসের অবস্থান ছিল অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্থ।

একমাত্র সুভাষ চন্দ্র বসুই যুদ্ধের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা হয়েছে। সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে উঠেছিল। ১৯২৯ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষ চন্দ্র বসুর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। কংগ্রেসের অন্য বড়ো নেতারা তাতে সম্মত ছিলেন না অথবা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতে পারেননি।

১৯৪১ সালে অকস্মাৎ 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' লঙ্ঘন করে কোনো অজুহাত ছাড়াই হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসে। একই বৎসর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত মার্কিন সেনাঘাটিতে জাপান বোমা বর্ষণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্র শক্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র (মিত্রশক্তি) অপর দিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানী, ইতালি ও জাপান (অক্ষশক্তি)। দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ার পর যুদ্ধের চরিত্র পাল্টে গেল। সবচেয়ে আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় পরাধীন জাতির মুক্তির সম্ভাবনা এবং গণতন্ত্র আর থাকবে না। কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে সঠিকভাবেই জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল। তাদের সামনে ফ্যাসিবাদ প্রধান শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তারা বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করতে হাত বাড়ান। এই পরিস্থিতিতে পার্টি আইনী স্বীকৃতি পেয়েছিল। প্রকাশ্যে কাজের সুযোগকে গ্রহণ করে পার্টি সেই সময় যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

পরিস্থিতিটি বেশ জাটিল। একদিকে ১৯৪২ সালে গান্ধী ও কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন যার বিরোধিতা করছে কমিউনিস্ট পার্টি। অন্যদিকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধকেও কংগ্রেস নেতারা সমর্থন করছেন না। নেহেরুসহ যে নেতারা সুভাষ বসুকে ফ্যাসিস্ট দালাল বলে আখ্যায়িত করে মুক্ত তরবারী হাতে রুখে দাঁড়ানোর সদম্ভ ঘোষণা করেছিলেন তারা এবার কমিউনিস্ট পার্টিকে বৃটিশের দালাল বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেন। কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের তত্ত্বটি সঠিক হলেও তারা যে ভাষায় এবং যেভাবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে জাপান ও

BanglaBook.org

ফ্যাসিস্টের দালাল বলে নিন্দা করেছিলেন সেটিও যথাযথ ছিল না। সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ বলছেন যে সুভাষ বসু জাপানের সহযোগিতা নিলেও সবসময় স্বাধীন মনোভাব রক্ষা করে চলেছিলেন। এখন সিপিআই, সিপিআই (এম), সিপিআই (এমএল) ইত্যাদি বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপগুলো স্বীকার করছে যে সুভাষ বসুকে ফ্যাসিস্টরূপে চিত্রিত করা একটি বড়ো ধরণের ভুল ছিল।

যুদ্ধের সময় বাংলার প্রাদেশিক সরকার ছিল মুসলিম লীগের। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাজিম উদ্দীন এবং সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যারা বৃটিশকে সহযোগিতা করার জন্য খাদ্য মজুদের ব্যবস্থা করেন। এদিকে ভারতের পূর্ব প্রান্তে জাপানীরা এসে গেছে। বৃটিশ পোড়া মাটির নীতি গ্রহণ করে এবং তাতে নাজিম উদ্দীন-সোহরাওয়ার্দী পূর্ণ সহায়তা করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হুকুম দিয়ে মানুষের ঘরবাড়ি তল্লাসী করে ধান-চাল, যানবাহন গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে আনার ব্যবস্থা করলেন। যুদ্ধের জন্য খাদ্য মজুদ করা হলো। পাশাপাশি অসৎ ব্যবসায়ীরাও খাদ্য মজুদ করে চালের দাম বাড়িয়ে দিল। দেখা দিল মানুষ সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং নাজিম উদ্দীন-সোহরাওয়ার্দীর লীগ সরকারও দায়ী ছিল। এই দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল ৩৫ লক্ষ মানুষ। বিরাট সংখ্যক কৃষক জমিহারা হয়েছিল এবং বর্গাচাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অবস্থাটি পরবর্তীতে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল যার নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। দুর্ভিক্ষের সময় কমিউনিস্ট পার্টি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে রিলিফের কাজ করেছিল। তাতে পার্টির সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলার দায়িত্বজ্ঞানহীন ও গণবিরোধী মুসলিম লীগ সরকার দুর্ভিক্ষে মানুষকে সহায়তা করার জন্য সামান্যতম উদ্যোগ নেয়নি।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি

যুদ্ধ শেষ হবার পর এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও শুরু হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় আইন সভা নির্বাচন হয়। মুসলীম লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সেই বৎসর ১৬ই আগষ্ট জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন (ডাইরেক্ট একশন)। সেদিন কোলকাতায় মুসলিম লীগ সশস্ত্র শোভাযাত্রা বের করেছিল। অন্যদিকে হিন্দু

BanglaBook.org

সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাবাজরাও পাল্টা প্রস্তুতি নেয়। ১৬ই আগস্ট শুরু হলো ইতিহাসের ভয়াবহ কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যার জন্য সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকার এবং হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দায়ী ছিল। মাত্র চার দিনের মধ্যেই দাঙ্গায় চার সহস্রাধিক মানুষ খুন হয়েছিল। এই দাঙ্গা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দাঙ্গা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরই সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট নেতা মনসুর হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভায় তেভাগা আন্দোলন শুরু করার জন্য আধিয়ার-বর্গাচাষীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে সে বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষাণ সভার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। পরবর্তী ফসল কাটার মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু মুসলমান কৃষকের যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন যা গ্রাম বাংলাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। একই সঙ্গে তা গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে রুখে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অক্টোবর মাসে নোয়াখালীর কয়েকটি থানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে। মৃত্যুভয়ে অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে চেষ্ট করে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জয়ন্ত ভট্টাচার্য 'বাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের ধারা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন– (পৃ ২৬)

'নোয়াখালী জেলার সীমান্তে কুমিল্লা জেলার হাসনাবাদ ছিল কৃষক আন্দোলনের মজবুত ঘাঁটি। ১৩ই অক্টোবর হাসনাবাদের ২ মাইল দূর বাইশগাঁ, মুরালী, কমলপুর, মণিপুর, নোয়াতলা প্রভৃতি গ্রামে চলছিল ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, লুট, অগ্নিসংযোগ। হাসনাবাদের কৃষক নেতা কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, এবাদুল্লাহ, গোপাল চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে কৃষক স্বেচ্ছাসেবকরা নোয়াখালীর দাঙ্গায় গৃহহারা ৩ হাজার মানুষকে আশ্রয় দিয়ে তাঁদের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্বের নতুন দৃষ্টান্ত দেখালেন। গ্রাম ঘিরে পাহারা দিয়ে রাখলেন কৃষক কর্মীরা। হাসনাবাদের দৃষ্টান্ত তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো।' এই কৃষক নেতা ও কর্মীরা সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও কর্মী।

BanglaBook.org

কমিউনিস্ট পার্টির ভুল ও বিচ্যুতি:

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রমিক কৃষকের মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট অবদান, আত্মত্যাগ ও সাফল্য সত্ত্বেও এই কথা অস্বীকার করা যাবে না যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্টি বড়ো রকমের ভুল করেছিল।

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হলে পার্টি যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের লাইন গ্রহণ করেছিল তা সঠিক ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর জাতীয় সরকার গঠনের জন্য রাজনৈতিক চাপও রাখা উচিৎ ছিল যা তারা করেননি। তাছাড়া আভ্যন্তরীন শ্রেণী সংগ্রাম এবং বৃটিশ প্রশাসনের গণবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম অব্যাহত রাখা উচিৎ ছিল। এই দিকটিও উপেক্ষিত হয়েছিল।

২. 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে তারা সরাসরি যেভাবে বিরোধিতা করেছিলেন তাও বড়ো রকমের ভুল ছিল। তারা নেতাজি সুভাষ বসুকে জাপানের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য সমালোচনা করলেও করতে পারতেন, কিন্তু স্বাধীনতার বীর সেনানী নেতাজি সুভাষ বসু, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিকে তারা যেভাবে ফ্যাসিস্ট এজেন্ট বলে গালি দিয়েছিলেন তা কেবল ভুলই ছিল না, এজন্য তারা জনগণ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নও হয়েছিলেন।

৩. স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয়ের পর যখন বোঝা গেল যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে, তখন অন্তত বৃটিশবিরোধী সংগ্রামকে জোরদার করা উচিত ছিল।

৪. যুদ্ধ পরবর্তীকালে যখন গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে কমিউনিস্টদের বড়ো ধরনের অবদান ছিল। কিন্তু সেই সময়ও কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় ঐক্য রক্ষার নামে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের ঐক্যের জন্য যে স্লোগান তুলেছিল তা ছিল চরম ভুল। পার্টি বলেছিল, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের উপর নির্ভর করছে জাতীয় ঐক্য এবং জাতির ভবিষ্যৎ। এটাকে এক ধরণের লেজুরবৃত্তি বলা যায়।

৫. পাকিস্তান ইস্যুতেও কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা ভাবনা প্রথম দিকে ভুল ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সবসময় নিপীড়িত জাতির পক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু ধর্ম ভিত্তিতে মুসলিম সমাজকে একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা ছিল অবৈজ্ঞানিক। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ড. অধিকারী পার্টির

BanglaBook.org

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে পাকিস্তান এবং জাতীয় ঐক্যের উপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে স্বতন্ত্র জাতি হিসবে গণ্য করে তাদেরকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, এমনকি বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার দেবার প্রস্তাব তোলা হয়। অধিকারীর রিপোর্টটির মর্মবস্তু গৃহীত হয়েছিল। অধিকারী বলেন, 'পাকিস্তান প্রস্তাব দাঁড়িয়ে আছে সদ্য জাগ্রত মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার উপর'।

অবশ্য অল্প পরেই ১৯৪৬ সালেই পার্টি তার ভুল সংশোধন করে এবং পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

৬. যুদ্ধশেষ হওয়ার পরও এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের পরও পার্টি আরেক ধরণের ভুল করেছিল। Forward to Freedom শীর্ষক কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদ এখন 'জনতার শিবিরে বন্দি'তে (Prisoners of People's Camp) পরিণত হয়েছে। তাই ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিজয় খুব স্বাভাবিকভাবেই এবং সহজেই ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবে। যদিও যুদ্ধ পরবর্তী গনজাগরণে পার্টির বিরাট ভূমিকা ছিল তবুও এই ধরণের ভ্রান্ত চিন্তা কার্যক্ষেত্রে শিথিলতা এনে দেয় এবং উদ্যোগী ভূমিকা নিতে বাধা সৃষ্টি করে। অবশ্য এর পরপরই ১৯৪৬ সালের আগস্টে পার্টি তার ভুল সংশোধন করে এবং 'চূড়ান্ত আঘাত হানা'র (Final Assualt) জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৭. স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পার্টি আরেক ধরণের ভুল করে বসেছিল। কোলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (২৮শে ফেব্রুয়ারি-৫ মার্চ ১৯৪৮ সাল) কমরেড বি.টি রণদীভে'র নেতৃত্বে পার্টি নতুন করে সংগ্রামের ডাক দেয় এবং স্লোগান তোলে, 'ইয়া আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, সাচ আজাদী ছিনকে লও'। এই স্লোগানের মর্মবস্তু সঠিক ছিল। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোষে যে স্বাধীনতা এসেছিল তা জনগণের মুক্তি আনবে না। কিন্তু কৌশলগত কারণে এই স্লোগান ছিল চরম হঠকারীতা। কারণ তখনও ভারতে কংগ্রেস এবং পাকিস্তানে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ছিল বিশাল। দুইশ বৎসর পরে ইংরেজদের চলে যাওয়ার ঘটনাটিকেও এত খাটো করে দেখা ঠিক হয়নি। এই স্লোগানের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের

BanglaBook.org

(বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের) বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল যা সারা দেশের ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে। পূর্ব পাকিস্তানে পার্টি নিষিদ্ধ না হলেও কার্যত বেআইনী ছিল। কমিউনিস্টদের আন্দেলন এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলকেও পাকিস্তান সরকার ভারতের ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করে। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের উপর ব্যাপক ও নিষ্ঠুর নির্যাতন নেমে আসে। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা মুসলিম লীগের আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য কয়েক বৎসর পরই, বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের সময় এদেশের জনগণ ক্রমশ উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, 'ইয়া আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'। পূর্ব বাংলার মানুষ এক শৃঙ্খল থেকে আরেক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। ১৯৭১ এর মুক্তি সংগ্রামের বীজ রোপিত হতে থাকে।

চূড়ান্ত আঘাত হানো

ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও যুদ্ধ পরবর্তীকালে 'চূড়ান্ত আঘাত হানো' স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার জন্য কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর ফলে মাত্র কিছুদিন আগে যে কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক কমিউনিস্ট পার্টিকে বৃটিশের দালাল বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিল সেই কমিউনিস্ট পার্টি এখন জনগণের সামনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, দৃঢ়চিত্ত, বিপ্লবী চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হলো। এখানে উল্লেখ্য যে বোম্বেতে নৌ বিদ্রোহে নৌ সেনারা কংগ্রেস-মুসলিম লীগের পাশাপাশি কমিউস্টি পার্টির পতাকাও উড়িয়েছিলেন। নৌ সেনাদের সঙ্গে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তাদের সমর্থনে কমিউনিস্ট পার্টি বোম্বেতে হরতাল ডাকে এবং তারা লক্ষ মানুষকে সমবেত করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। বেগার খাটুনী নিষিদ্ধ করা, অন্যায় ও অতিরিক্ত খাজনা হ্রাস করা, কৃষক নির্যাতন বন্ধ করা এই সকল দাবিতে একটার পর একটা কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। বহুক্ষেত্রে তারা পূর্ণ অথবা আংশিক সাফল্য অর্জন করেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিও সোচ্চার হতে থাকে গ্রাম বাংলাজুড়ে। কয়েকটি বড়ো বড়ো কৃষক আন্দোলন আমাদের ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে। তেলেঙ্গনার সশস্ত্র সংগ্রাম, বাংলার ঐতহাসিক তেভাগা আন্দোলন,

BanglaBook.org

কাকদ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ, সিলেটের নানকার সংগ্রাম, এগুলো আমাদের কৃষক সংগ্রামের সুমহান ঐতিহ্যের অন্তর্গত। (পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সংগ্রামগুলো সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে)। যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে (১৯৪৫-৪৭) বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘটের পর ধর্মঘট হতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্ব একে কমিউনিস্ট উস্কানী বলে আখ্যায়িত করে তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধীতার ভূমিকায় নামে। এখানে উল্লেখ্য, শ্রমিকরা কেবল অর্থনৈতিক দাবি নয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক দাবিও উত্থাপন করেছিলেন। এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সারা ভারতব্যাপী ডাক-তার শ্রমিকদের ধর্মঘট। ১৯৪৬ সালের ২১শে জুলাই বাংলার ও আসামের ডাক ও তার কর্মচারীগণ ধর্মঘট শুরু করলে তা শীঘ্রই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধর্মঘটের সমর্থনে সারা বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলাদেশ, আসাম প্রভৃতি জায়গায় গোটা প্রদেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। ২৯শে জুলাই সারা কোলকাতা শহর অচল হয়ে যায়। কোলকাতায় যে সভা হয়েছিল তাতে মানুষের স্রোত যেন আছড়ে পড়েছিল। ঐ ধর্মঘটের অন্যতম অংশগ্রহণকারী কে জি বসুর মতে কোলকাতায় এত বড়ো শ্রমিক সমাবেশ আগে কখনও দেখা যায়নি। 'রাস্তার দুধারে উৎসাহিত জনতার সারি, অনেক সৈনিকও সেখানে উপস্থিত'। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতারা সেখানে বক্তৃতা করেন। ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন ছাত্র সংস্থাও এগিয়ে এসেছিল।

কিন্তু সেই সময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সমর্থনসূচক বক্তব্যও আসেনি। জনগণের চাপে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী গোপীনাথ বরদৌলী ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য আবেদন জানিয়ে তখনকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহেরু ও ভারত সরকারের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। নেহেরু একটি বিবৃতি দেন। তাতে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা থাকলেও ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটকে সমর্থনও করেননি এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়ার কথাও বলেননি। ইতিমধ্যে সরকার শ্রমিকদের ধোকা দেয়ার জন্য আংশিক দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তখন কংগ্রেস নেতা আবুল কালাম আজাদসহ কয়েকজন নেতা জনসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব রেখেছিলেন। এই ছিল কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ চৌদ্দ

বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি মহান কৃষক সংগ্রাম

চল্লিশের দশকে বিশেষ করে পার্টি কর্তৃক ঘোষিত 'চূড়ান্ত আঘাত হানা'র যুগে অর্থাৎ ১৯৪৫-'৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়াগায় শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি ছোটো-বড়ো কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। বেগার খাটনি প্রথা বাতিল, অতিরিক্ত খাজনা দেওয়া বন্ধ করা, জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা, বর্গাচাষীদের জন্য ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ দাবি করা, মহাজনী সুদ বন্ধ করা– এই সকল দাবি উঠতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগ্রামী কৃষকরা আংশিক সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি সর্বত্র ধ্বনিত হতে থাকে এবং তা জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। যদিও প্রধান দুই দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তখন এই দাবি সমর্থন করেনি। আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি বড়ো ধরণের ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। (কাকদ্বীপের মহান কৃষক বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে থাকলেও এই গ্রন্থে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে না। কারণ কাকদ্বীপের লড়াইটি প্রধানত হয়েছিল ৪৭ পরবর্তী যুগে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। ইতিহাসের এই পর্বটি আমাদের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়।)

তেলেঙ্গনার বিদ্রোহ

তেলেঙ্গনা রাজ্যটি নিজাম শাসিত হায়দরাবাদের অংশ ছিল। নিজামের হায়দরাবাদ ছিল বৃটিশের একটি দেশীয় রাজ্য যা নিষ্ঠুর সামন্ত ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অসংখ্য করের চাপে কৃষকের প্রায় সমস্ত ফসলই কেড়ে নিত সামন্ত প্রভুরা যাদের প্রধান ছিলেন স্বয়ং নিজাম অর্থাৎ

BanglaBook.org

হায়দরাবাদের রাজা। কৃষকের জমির উপর অধিকার ছিল না বললেই চলে। ক্ষেতমজুরদের পরিশ্রম করতে হত ১৪ ঘণ্টা বা তারও বেশি। বর্গাচাষীদের ও অন্যান্য প্রজাদের নিজাম এবং জায়গিরদার জমিদারদের জমিতে বেগার খাটতে হতো। কোনো সভ্য আইন সেদেশে ছিল না। নিজামের একদল গুণ্ডা বাহিনী যাদেরকে রাজাকার বলা হতো তারা এবং নিজামের পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী কৃষক প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত এবং সম্পদ লুটপাট করত।

তেলেঙ্গনার কৃষকরা ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল। সেই সময় সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়নি। তার অল্প আগে স্টেট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা ছিল ধনী কৃষক ও ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে। স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনকে তারা কাজে লাগাতে চেয়েছিল নিজামের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এবং কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য। গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দাবির প্রতি তাদের কোনো সমর্থন ছিল না। নিজাম সেটুকুও সহ্য করতে রাজি ছিলেন না। স্টেট কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হলো। তারপর তাদের আর কোনো ভূমিকা ছিল না।

নিজাম নিজে ছিলেন উর্দুভাষী মুসলমান এবং অধিকাংশ প্রজা ছিলেন ভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দু। হায়দরাবাদের সরকারি ভাষা ছিল উর্দু। বড়ো বড়ো জমিদারি ও সরকারি পদগুলো ছিল মুসলমানদের হাতে। নাগরিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। তবে দেখা গেছে নিজাম বিরোধী কৃষক সংগ্রামের সময় হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানী কোনো কাজে আসেনি।

এক পর্যায়ে তেলেগু (অর্থাৎ হায়দরাবাদ অঞ্চলের) জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার ও শিক্ষা সংস্কারের দাবি নিয়ে তৈরি হয়েছিল অন্ধ্র মহাসভা (সঙঘম)। তেলেগু ভাষী ধনী কৃষক ও জমিদারাই এর নেতা ছিলেন। পরবর্তীতে অন্ধ্র মহাসভা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন কিষাণ সভার অংশে পরিণত হয়েছিল। অন্ধ্র রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় হায়দরাবাদের কমিউনিস্ট পার্টিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক পর্যায়ে অন্ধ্র মহাসভার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব সরে পড়তে থাকে এবং কমিউনিস্ট পার্টি সঙঘমের প্রকৃত নেতা ও প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে নতুন করে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। প্রথম দিকে সঙঘমের দাবির মধ্যে

BanglaBook.org

ছিল জোর করে কাজ করানো যাকে বলা হত ভেট্টি– তার অবসান, জমিদারদের অত্যাচার ও সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনীর নির্যাতন এবং বেআইনী খাজনা বন্ধ করা ইত্যাদি। সর্বপরি যে দাবিটি সামনে এসেছিল তা হলো হায়দরাবাদে নিজামের শাসনের অবসান চাই। প্রথম দিকে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে আন্দোলন শুরু হলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা কয়েক হাজার গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্ঘম কেবল সংগ্রামই করেনি তারা গ্রামগুলোর সামাজিক নেতৃত্বও গ্রহণ করেছিল। গ্রামীণ জনগণের বিরোধ মীমাংসা, সালিশ ইত্যাদির কাজও তারা করতেন। গ্রামীণ জনগণের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার পরপরই এই সংগ্রাম আরও উন্নততর স্তরে উন্নীত হয়। জমিদারকে দেয় খাজনা ও শস্য বন্ধ হয়ে যায়, বেগার খাটনী বন্ধ হয়ে যায়। জমিদারদের দ্বারা মজুদকৃত শস্য ভাণ্ডার লুট করে সঙঘম গরিব কৃষক প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে। জমিদারদের ও মহাজনদের সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন।

সংগ্রামের এক পর্যায়ে কৃষকরা নিজেদেরকে সশস্ত্র করেন এবং গেরিলা স্কোয়াড তৈরি হতে থাকে। গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে সুসংগঠিত গেরিলা বাহিনী তৈরি হয়। সংগ্রামের এক পর্যায়ে ৩ হাজার গ্রাম (যার লোক সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ যা হায়দরাবাদের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং আয়তন ছিল ১৬ হাজার বর্গমাইল) সম্পূর্ণ মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয় যেখানে নিজামের শাসনকে ধ্বংস করে গ্রাম রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মধ্যেই হায়দরাবাদ রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগে অর্থাৎ তেলেঙ্গনার চার ভাগের তিন ভাগেই নিজামের শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং গড়ে উঠেছিল ক্ষেতমজুর ও কৃষকের কর্তৃত্বাধীন এক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ২ হাজারের বেশি গেরিলা স্কোয়াড গঠিত হয়েছিল। তাছাড়াও ১০ হাজার গণ মিলিশিয়া এই মুক্ত অঞ্চল রক্ষায় সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত অন্ধ্র মহাসভার সভ্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২ লক্ষেরও বেশি। জমিদারদের প্রায় দশ লক্ষ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছিল। মহাজনী সুদের ব্যবসা এবং বেগার খাটানোর নীতি বিপ্লবীরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কৃষক বিপ্লবীদের দ্বারা নতুনভাবে মজুরি নির্ধারিত হয়েছিল।

এই সংগ্রামের প্রধান নেতা ছিলেন পি সুন্দরাইয়া (সিপিআইএম'এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক), রাজেশ্বর রাও (সিপিআই-এর একদা সাধারণ

BanglaBook.org

সম্পাদক), বাসব পুন্নাইয়া (একদা সিপিআইএম'এর কেন্দ্রীয় নেতা) প্রমুখ। তারা সশস্ত্র সংগ্রামে সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পিসি যোশী বিদ্রোহীদের দ্বারা অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার বিরোধীতা করেন। তবে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে (অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হবার পরে) কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় যোশীর নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং অবিলম্বে তেলেঙ্গনার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এবং জমি দখল ও গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে জমি বিলি করার জন্য হায়দরাবাদের কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অবশ্য তেলেঙ্গনার কৃষক ও স্থানীয় কমিউনিস্টরা নিজামের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য পূরণচাঁদ যোশীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন। নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশের পর এই সংগ্রাম নতুন শক্তি লাভ করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির একটা বড়ো অংশ এই সংগ্রামকে ভারতের 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করে সশস্ত্র সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য প্রেরণা দিতে থাকেন। নতুন করে সংগ্রামের ধ্বনি উঠল—

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দরাবাদ রাজ্য আর নিজামশাহী ধ্বংস কর; জনগণতান্ত্রিক 'বিশাল অন্ধ্র' প্রতিষ্ঠিত কর।

সকল জমিদারদের জমি-জমা দখল কর, আর সেই জমি গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি কর।

কৃষকের সমস্ত ঋণ অগ্রাহ্য কর।

গ্রামের সমস্ত দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেল, গ্রামের সরকারি কর্মচারীদের পদত্যাগ করতে বাধ্য কর, প্রতি গ্রামে জমিদার আর তার দালালদের বাদে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকের ভোটে 'গ্রাম পঞ্চায়েত' নির্বচিত কর।

নিজামের সৈন্যবাহিনী, পুলিশ আর রাজাকার গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রতি গ্রামে ভলান্টিয়ার দল গড়ে তোল।

নিয়মিত গেরিলা দল তৈরি কর।

বিপ্লবীদের হাতে নিজামের নিশ্চিত পরাজয় জেনে স্বাধীন ভারতের নতুন সরকার নিজেই ভীত হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেহেরু-প্যাটেলের সরকারের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী অন্ধ্রে প্রবেশ করল। তেলেঙ্গনা ও অন্ধ্র প্রদেশ ভারতের ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত

BanglaBook.org

হলো। নিজামের শাসনের অবসান ঘটল। তবে বিপ্লবীদের দাবি, সামন্ত ব্যবস্থার অবসান কোনোটাই পূরণ হয়নি। তাই সশস্ত্র সংগ্রামও অব্যাহত থাকে। কিন্তু ভারত সরকারের বর্বর হিংস্র আক্রমণের মুখে এই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না। ভারত সরকার চিরুনী অপারেশন চালিয়ে সংগ্রামী বিপ্লবী ও কমিউনিস্টদের হত্যা করে। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একদা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত হরে কিষাণ সিং সুরজিত বলেছেন "পরবর্তীকালে এটা হিসাব করে দেখা গেছে যে ভারত সরকার কাশ্মীরে যত সৈন্য ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিয়োজিত করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সৈন্য ও সম্পদ নিয়োজিত হয়েছিল তেলেঙ্গনায়। তেলেঙ্গনার সংগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর। ইতিমধ্যে ৪ হাজার বিপ্লবী কর্মী নিহত হয়েছেন। ১০ হাজারের বেশি বিভিন্ন মেয়াদে জেল খেটেছেন। ৫০ হাজারের বেশি বিপ্লবীকে পুলিশ ও সেনা ক্যাম্পে নির্যাতন করা হয়েছিল।"

দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিপ্লবীরা পরাজিত হলেন। কিন্তু তেলেঙ্গনার সংগ্রাম ভারতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে এখনো জ্বলজ্বল করছে।

তেলেঙ্গনার সংগ্রামের তাৎপর্য বিরাট। তেলেঙ্গনার লড়াইয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষক। মাঝারি কৃষকের যুবকরাও শতে শতে যোগদান করে জীবনদান করেছিলেন। দেখা যায় ধনী কৃষকরা ১৯৪৬ সালের দিকে এই সংগ্রামে যোগদান করলেও সংগ্রাম যখন সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করে এবং গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে জমি বণ্টন শুরু হয় তখন তারা ক্রমাগত সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যায়। তবে তারা সংগ্রামের বিরোধিতাও করেনি, পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতাও করেনি। আরও লক্ষ্যণীয় যে তেলেঙ্গনার বিপ্লবে হায়দরাবাদের ছাত্র সম্প্রদায় এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের অনেকেই দলে দলে অন্ধ্র মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে নেহেরুর সৈন্য ও পুলিশ যখন কৃষকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন গোটা হায়দরাবাদ রাজ্যে ছাত্র সমাজ যে সংগ্রামের ধ্বনি তুলেছিল তাতে হায়দরাবাদ শুধু নয় নেহেরু সরকারও কেঁপে উঠেছিল।

তেলেঙ্গনার সংগ্রাম একটা নতুন পথ দেখিয়েছিল। তেলেঙ্গনার সংগ্রাম অন্ধ্র অঞ্চলের তেলেগু ভাষাভাষীদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। কাছাকাছি অন্যান্য রাজ্যেও প্রভাব পড়েছিল। সেদিন কমিউনিস্টরা

BanglaBook.org

তেলেঙ্গনার এই সংগ্রামকে ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে গ্রহণ করেছিলেন। অন্ধ্রের পার্টি তেলেঙ্গনা ও অন্ধ্রের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই আদর্শগত আলোচনাই 'অন্ধ্র পার্টির চিঠি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের বিপ্লব সম্বন্ধে মাও সে তুং-এর লাইন ও চীন বিপ্লবের আদর্শকে তুলে ধরা হয়। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে এই চিঠি অন্ধ্রের পার্টি মধ্যে প্রচারিত হয়। এই চিঠিতে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্র কমিটি ঘোষণা করেছিল, "মাও সে তুং-এর নয়া গণতন্ত্রই ভবিষ্যৎ ভরতের পথ নির্দেশ করে।" তারা দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের রণ কৌশল তুলে ধরেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে পরবর্তীতে ভারতবর্ষের কোনো কমিউনিস্ট পার্টিই এ পথ অনুসরণ করেনি। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবরে রণনীতি গ্রহণ করলেও দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেনি।

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন ছিল আধিয়ার বা বর্গাচাষীদের ফসলের দুই তৃতীয়াংশ অধিকার আদায়ের আন্দোলন। বৃটিশ আমলে জোতদারের অধীনে বর্গাচাষীরা যে চাষ করত সেখানে ফসলের ভাগাভাগির নিয়মটি ছিল এরকম–

চাষের খরচ গরু, লাঙল, বীজ ইত্যাদি চাষের উপকরণ সবই বর্গাদারকে বহন করতে হবে। শুধু জমির মালিকানার বলে জোতদার ফসলের অর্ধেক পাবে। শুধু তাই নয়, প্রথাটি এমন ছিল যে ফসল কাটার পর বর্গাদার পুরো ফসল প্রথমে জোতদারের গোলায় নিয়ে যাবে এবং সেখানেই ভাগাভাগি তবে। তাছাড়া খড়, ইত্যাদি সেগুলো জোতদারের পাওনা হবে। উপরন্তু নানা অজুহাত ও কৌশলে জোতদাররা অর্ধেকের বেশি ফসল আদায় করে নিত। এছাড়া জোতদাররা যখন খুশি বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। জমি চাষ করার স্থায়ী অধিকারও বর্গাদারের ছিল না। এছাড়াও জোতদাররা তাদের সামাজিক প্রভাবের বলে বর্গাদারদের নির্যাতন পর্যন্ত করত।

এর বিরুদ্ধে বর্গাদারদের ক্ষোভ জমা হতে থাকে। কিছু কিছু স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামও গড়ে উঠেছিল কিন্তু তা কোন পরিণতি লাভ করেনি। ভারতের

BanglaBook.org

কৃষক নেতা জয়ন্ত ভট্টাচার্যের এক লেখা থেকে জানা যায় যে কংগ্রেস নেতা সৈয়দ নওশের আলী (যিনি পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন) নড়াইল জেলায় (তখন মহকুমা) বর্গাদারদের ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তা তেমন ফলপ্রসূও হয়নি, আন্দোলনও বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষাণ সভা ইস্যুটি নিয়ে আন্দোলন শুরু করলে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং জঙ্গী রূপ ধারণ করেছিল।

১৯৪০ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই (তখনও জনযুদ্ধের যুগ শুরু হয়নি এবং কমিউনিস্ট পার্টি আত্মগোপনে থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল) যশোর জেলার পাঁজিয়া নামক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিবেশন হয়। সেই সম্মেলনেই বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার দাবি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তখনই সংগ্রাম শুরু হয়নি। জনযুদ্ধের যুগে পার্টি ও কৃষক সমিতি দুর্ভিক্ষ নিয়ে অধিক চিন্তিত ছিল। রিলিফ ও খাদ্য আন্দোলন নিয়েই তারা ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি এই তিন জেলা কমিটির যুক্ত অধিবেশনে জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার ভিত্তিতে তিন জেলা কমিটির ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পার্টি সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রধান তিনটি স্লোগান নিয়ে তেভাগার সংগ্রাম শুরু করবে। স্লোগানগুলো ছিল

১. নিজ খোলানে (গোলায়) ধান তোল।
২. আধি (অর্ধেক) নাই, তেভাগা চাই।
৩. কর্জা (ধার করা) ধানের সুদ নাই।

এই রণধ্বনি সেদিন গোটা উত্তরবঙ্গকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। প্রধানত বর্গাদার ও গরিব কৃষকদের ব্যাপক প্রচার ও সংগঠিত সংগ্রামের ফলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দিনাজপুর থেকে কমিউনিস্ট প্রার্থী রূপনারায়ণ রায় জয়লাভ করেন। একই বৎসর ১৯৪৬ সালে খুলনা জেলার মৌভোগ নামক স্থানে জেলার কৃষক সম্মেলন হয়। সেখানেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান রাখা হয়। সেখানেও বর্গাদারদের জন্য

BanglaBook.org

তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবি করা হয়। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (মধ্য আগস্ট থেকে শুরু হওয়া ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে) প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল থেকে ঘোষণা করা হয় যে পরবর্তী ফসল কাটার সময়ই তেভাগা সংগ্রাম শুরু করা হবে। অক্টোবর মাসে দিনাজপুর থেকেই এই আন্দোলন শুরু হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজ গোলায় ধান তোলার ব্যাপারেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নভেম্বর মাস থেকে এই আন্দোলন সমগ্র গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করেছিল দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদা, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগণা, যশোর, খুলনা, হাওড়া, মেদনীপুর প্রভৃতি জেলায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তার নেতৃত্বাধীন লীগ সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বর্বর নির্যাতন ও হত্যাকান্ড শুরু করে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে পুলিশের গুলিতে ও জোতদারের হিংস্র আক্রমণে ৭০ জন কৃষক কর্মী ও কমিউনিস্ট শহীদ হন। পুলিশের গুলিতে প্রথম শহীদ হন দিনাজপুরের চিনির বন্দর এলাকার ক্ষেতমজুর ছমিরউদ্দীন ও গরিব সাঁওতাল কৃষক শিবরাম (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৭)। লীগ সরকারের পুলিশি অত্যাচারে মেয়েরা পর্যন্ত পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়। ১৯৪৭ সালের ২৫শে মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় কমিউনিস্ট প্রতিনিধি জ্যোতি বসু কৃষকদের উপর সন্ত্রাসী অত্যাচার নিপীড়নের বিশদ বর্ণনা দিয়ে সহরওয়ার্দীর মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

তীব্র নির্যাতন সত্ত্বেও আন্দোলনকে থামানো যায়নি। লীগ সরকার একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দিচ্ছে, অপরদিকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জোতদারদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। হত্যা ছাড়াও অন্যান্য ধরণের নির্যাতন, হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার বেপরোয়াভাবে চলতে থাকে। এমনকি আইন সভার নির্বাচিত সদস্য রূপনারায়ণ রায়ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ধান চুরির অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

জোতদার ও লীগ সরকারের হিংস্র আক্রমণ সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলন দমানো সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে জোতদার এবং সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ সরকার আন্দোলনকে দমন করার জন্য দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করেছিল। উল্লেখ্য যে দিনাজপুর, রংপুর এলাকায় কৃষকদের

BanglaBook.org

মধ্যে মুসলমান কৃষকের সংখ্যাই বেশি। দাঙ্গা বাঁধানোর প্রয়াসে মুসলিম লীগ নেতারা নোয়াখালী থেকে কিছু মৌলভীও আমদানি করেছিল। কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে খুন করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। মুসলমান কৃষক ও আধিয়ারদের দ্বারাই এসকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। বরং আন্দোলনের ভয়ে জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা কোলকাতায় পালাতে শুরু করে।

সুশীল সেনের এক প্রবন্ধ থেকে জানা যায়–

"গ্রামের মাঠে মাঠে তখন ধানের সোনালী রঙের সমারোহ। আর হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে সমারোহ লালঝান্ডা ও লাঠিধারী ভলান্টিয়ারদের। স্লোগানে স্লোগানে সারা গ্রাম কাঁপিয়া উঠিতেছে। পাকা ধানের শীষগুলিও কাঁপিতেছে। সংগ্রামের দামামা বাজিয়া চলিয়াছে। 'কমরেড ইনক্লাব'-ঐ ধ্বনিতেই বজ্রমুষ্টি উঁচাইয়া কৃষকরা একে অপরকে সংগ্রামী সম্ভাষণ জানাইতেছে। অন্য গ্রামের প্রস্তুতির খবরাখবর লইতেছে। গ্রামের পর গ্রামে ঐ একই চিত্র। গ্রামগুলি হইয়া উঠিয়াছে জমাট বাঁধা কৃষক-ঐক্যের প্রতীক। ক্ষেতমজুর, আধিয়ার, মাঝারী-কৃষক কিছুটা স্বচ্ছল অবস্থার কৃষক সকলেই আধিয়ারের পক্ষে লাঠি ধরিয়াছে, ভলান্টিয়ার হইয়াছে।"

"কমরেড গুরুদাস তালুকদারের এলাকটি ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। ঠাকুরগাঁর ঐ পশ্চিমাঞ্চল ছিল জেলার পার্টির ও কৃষক সমিতির সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। ঐ এলাকা হইতেই ধান কাটা শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং উহা শুরু করার দায়িত্ব দিয়া পার্টির জেলা সম্পাদককে ঐ এলাকায় পাঠান হয়।"

তখন সর্বত্র কৃষক সংগঠন আওয়াজ তুলেছিল 'এক লাঠি, এক মানুষ, এক টাকা' অর্থাৎ গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন লাঠিধারী ভলান্টিয়ার, একজন কৃষক সমিতির সভ্য এবং সংগ্রামের তহবিলে এক টাকা দিতে হবে। বেশিরভাগ এলাকায় এই আওয়াজ কার্যকরী হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে ১৯শে মার্চ ইংরেজ শাসকদের মুখপত্র 'স্টেটসম্যানের' বিশেষ সংবাদদাতা যা লিখেছিলেন তা হলো–

"বিগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে ছিল নিশ্চুপ; আজ এক স্লোগানের আওয়াজে সে হয়েছে মুখর। সাথীদের সঙ্গে নিয়ে তারা মাঠ ভেঙ্গে চলে, সবার কাঁধের ওপরে রাইফেলের মতো করে ধরা লাঠি, মিছিলের সামনে তাদের লালঝান্ডা দেখে অনুপ্রেরণা জাগে। গ্রামের নিঝুম ঝোপঝাড়ের পাশে নিজেদের মুষ্টিবদ্ধ হাত, কপালের কাছে তুলে তারা যখন

BanglaBook.org

সহযোগী সাথিদের 'ইনকিলাব কমরেড' বলে সম্বোধন করে, শুনে বুকের ভেতরটা যেন গুরু গুরু করে।

"লাঠি নিয়ে চলাফেরা করাটাই মনে হয় বাধ্যতামূলক। আদিবাসীর মতো দেখতে এক কৃষক আমাকে জানালেন 'পার্টির নির্দেশেই আমাদের হাতে লালঝান্ডা আর লাঠি। এটা আমাদের একতার চিহ্ন'। পার্টি বলতে তাঁর সংগঠনকে বোঝাতে চেয়েছেন, যার সদস্য চাঁদা এক আনা। শহরের এক দরদী ব্যক্তি বললেন: 'পুরুষানুক্রমে যারা পদদলিত হয়েছেন, ওই লাঠি তাঁদের সাহস এনে দেয়'। হিংসার ঘোর বিরোধী তাঁরা, তবে প্রয়োজন হলে ওই লাঠি তাঁরা যে ব্যবহার করবেন না তাও নয়।"

তেভাগা আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আন্দোলনের অঞ্চলগুলিতে নারী বাহিনী গড়ে উঠেছিল। তারা কেবল পুরুষদের পিছন থেকে সহায়তাই করতেন না, নিজেরাও সংগ্রামের সম্মুখে থাকতেন। নড়াইলের সরলা দি'র নাম এখনও কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে। সত্যেন সেনের লেখা 'গ্রাম বাংলা পথে পথে' গ্রন্থে সরলা দি'র উপর একটি বিশেষ প্রবন্ধও রয়েছে। সুপ্রকাশ রায়ের 'বিদ্রোহী ভারত' গ্রন্থে তেমনি আরেক সংগ্রামী নারীর কথা পাওয়া যায়।

"রাত দুপুরে ঠুমনিয়া পার্টি অফিসে সংবাদ এল, রানিশঙ্কাইল-এ একটি বন্দুকধারী পুলিস মহিলা ভলান্টিয়ারদের প্রতি অসম্মানজনক উক্তি করে গালি দেয়। রাজবংশী স্ত্রী কৃষক-নেতা ভাগুমীর নেতৃত্বে কৃষক মহিলারা পুলিসটিকে গ্রেপ্তার করে আটক রেখেছে। ঠুমনিয়া থেকে পুলিসটিকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত ভাগুমী একটি বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঐ পুলিসকে ঘরে আবদ্ধ করে পাহারা দিল। বিভিন্ন রকমের বীরত্বের নজির সৃষ্টি করেছে মহিলারা।"

যশোরের তেভাগা অঞ্চলগুলো একপ্রকার মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়েছিল। এগারো খান, বড়েন্দার, দুর্গাপুর, পাঁজিয়া, কেশবপুর মনিরামপুর, প্রভৃতি এলাকা নিয়ে একটি বিরাট অঞ্চল। সেখানে ভলন্টিয়াররা লাল টুপি পরে পাহারা দিত। পুলিশ আসার সংবাদ পেলে তারা ঘন্টা বাজিয়ে বা অন্যভাবে কৃষক বাহিনীকে সতর্ক করে দিত। এই এলাকায় নেতা ছিলেন অমল সেন, নূর জালাল, হেমন্ত সরকার, মোদাসসের মুন্সি প্রমুখ। একবার প্রায় সত্তর জন পুলিশ নিয়ে কয়েকজন পুলিশ অফিসার গ্রামে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়

BanglaBook.org

হাজার হাজার কৃষক। এক অফিসার এসে বলল, "রাস্তা বন্ধ করবেন না, পুলিশকে যাবার পথ করে দিন।" বিপ্লবী নেতা নূর জালাল বললেন, "আগে জবাব দিন কেন কৃষকের বাড়িঘর লুট করা হয়েছে, কেন কৃষক সমিতির অনুমতি না নিয়ে এখানে প্রবেশ করেছেন।" পুলিসের বারবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড নূর জালালের ছিল একই জবাব, আগে পুলিশকে জবাবদিহি করতে হবে। এই অবস্থায় অফিসারের নির্দেশে পুলিশরা রাইফেল তুলে নিশানা করে বসে গেল। তখন নূর জালাল নির্দেশ দিলেন "যাদের কাছে ঢাল-সড়কি আছে তারা প্রস্তুত হন।" কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীও নিশানা ঠিক করে সুশৃঙ্খলভাবে ঢালের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। পুলিশ অফিসার চিৎকার করে হুকুম দিলেন– "ফায়ার"। সঙ্গে সঙ্গে নূর জালালও পাল্টা নির্দেশ দিলেন "কমরেডগণ একটা গুলির শব্দ হলে ওদের সব ক'টাকে আপনারা সড়কি দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবেন– মনে রাখবেন ওদের বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনাদের বড়ো বড়ো সড়কিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।"

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে পুলিশ অফিসার বারবার 'ফায়ার' হুকুম দেবার পরও পুলিশরা একটি গুলিও করলো না। তখন নূর জালালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কমরেডস, পুলিশ চাকরির জন্য বন্দুক ঘাড়ে করে এখানে এসেছেন, কিন্তু তারাও আপনার আমার মত গরিব চাষীর সন্তান...।" এই সংবাদটি কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এইভাবে– "নড়াইলে কৃষক জনতার উপর পুলিসের গুলি চালাতে অস্বীকৃতি"।

আন্দোলনের তীব্রতা দেখে ভীত হয়ে ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারী মুসলিম লীগ সরকার 'বেঙ্গল বর্গাদারস টেম্পরারী রেগুলেশন বিল' নামে একটি বিল উত্থাপন করে যাতে বর্গাদারের কিছু দাবি স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই বিল পরে আর উত্থাপন করা হয়নি, পাশও করা হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় কমিউনিস্ট জ্যোতি বসু সোহরাওয়ার্দী সরকারকে অভিযুক্ত করে বললেন, "বিলটি তৈরি করার কথা বলে লীগ সরকার লোক দেখানো খেলা খেলছেন।" তারপর জ্যোতি বসু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "আমি নিশ্চিত যে দিনাজপুরের ছমিরউদ্দীন ও শিবরামের মতো মানুষেরা যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের আত্মদান ব্যর্থ হবে না।"

BanglaBook.org

তবে কিছুদিনের মধ্যেই ভারত পাকিস্তান দুইটি দেশের সৃষ্টি হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তখনকার মতো তেভাগা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। এত বৎসর পর এখনও বর্গাদারদের তেভাগা দাবি সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি।

ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ

বাংলাদেশ তথা ভারতে যে কয়টি মহান কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল বৃটিশ আমলে বা তৎপরবর্তী যুগে তার মধ্যে অন্যতম ময়মনসিংহের (বৃহত্তর ময়মনসিংহের) গোটা উত্তরাঞ্চলজুড়ে সংগঠিত হাজং বিদ্রোহ। এই অঞ্চলটি গারো পাহাড়ে অবস্থিত এবং সেখানে হাজং, গারো, ডালু, কোচ, প্রভৃতি আদিবাসীদের বাস। সবুজ বনানী, পাহাড়ি ঝর্ণা ও নদী ঘেরা এই চমৎকার এলাকাটি ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুরে অবস্থিত। সেখানে এই আদিবাসীরা জমিদারের অধীনে যে শর্তে জমি চাষ করতেন তাকে বলা হয় টঙ্ক প্রথা। যা ছিল এক ধরণের মধ্যযুগীয় ভূমিদাসত্ব। এই টঙ্ক প্রথা বিরোধী আন্দোলনই সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। এবং এই আন্দোলনে প্রধানত হাজং সম্প্রদায়ের কৃষকরা থাকলেও সমতল অঞ্চলের মুসলিম কৃষকরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সংগ্রামের বিস্তৃতি ঘটেছিল ময়মনসিংহের উত্তরে পাঁচটি থানার অন্তর্গত ৯০ মাইল দীর্ঘ এক এলাকাজুড়ে যার মধ্যে তিন শতের অধিক গ্রাম ছিল। এই অঞ্চলটি ছিল সুসং জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। সুসং জমিদাররা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী, নৃশংস ও বৃটিশ ভক্ত।

এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন সেই সুসং জমিদার পরিবারের এক মহান সন্তান কমরেড মণি সিংহ। যিনি কৃষকের স্বার্থে নিজ পরিবারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে সদ্য গঠিত পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে মস্কো-পিকিং মহা বিতর্কের সময় পূর্ব পাকিস্তানের পার্টির যে ভাঙন হয়, তখন তিনি তথাকথিত মস্কোপন্থী অংশের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তানের ২৪ বৎসরে প্রায় সারাটা সময়ই তিনি আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই স্বল্প কালের জন্য

BanglaBook.org

তিনি মুক্ত ছিলেন আর পাকিস্তান যুগের শেষের দিকে তিনি দুইবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ এলাকায় টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনের কেবল প্রধান নেতাই ছিলেন না, কার্যত তাঁরই একক প্রচেষ্টায় এই সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। পরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেক হাজং ও বাঙালি মুসলিম নেতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য কিশোরগঞ্জের কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতিশ রায় এবং নগেন সরকার প্রায়ই সুসং এলাকায় আসতেন সংগ্রামে সহযোগিতা করার জন্য। এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি সাধ্যমত সহযোগিতা করেছিল।

এই সংগ্রামের কিছুটা বিবরণ তুলে ধরার আগে জানা দরকার টঙ্ক প্রথাটি কি ছিল। টঙ্ক প্রথা অনুযায়ী হাজংদের অধিকাংশ সুসং রাজা ও রাজার অধীনস্থ অন্যান্য সামন্ত প্রভুর কাছ থেকে চুক্তির ভিত্তিতে কিছু জমি চাষ করার জন্য নিত। চুক্তিগুলো এই রকম ছিল যে ফসল হোক বা না হোক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জমিদারকে দিতেই হবে। তাছাড়া জমিদারের জন্য বেগার খাটা, জমিদারের জমিতে নির্দিষ্ট সময়ে বিনা মজুরীতে চাষ ও অন্যান্য ধরনের পরিশ্রম করা, রাজাকে (সুসং দূর্গাপুরের জমিদারকেই রাজা বলা হতো) ভেট দেওয়া, সালামি দেওয়া এই ধরনের নিয়ম ছিল। চাষের জমির উপর অধিকারও তাদের ছিল না। জমিদাররা যেকোনো সময় কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। এই ব্যবস্থার নাম টঙ্ক। শুধু জমিদার নয়, জমিদারের অধীনস্ত তালুকদার, জোতদার ইত্যাদি সামন্ত প্রভুরাও টঙ্ক ব্যবস্তায় কৃষকদের শোষণ করত।

এই টঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে আন্দোলনের নেতা মনি সিংহ নিজেই যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ছিল নিম্নরূপ–

"টঙ্ক মানে ধান কড়ারী খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মতো ধান দিতে হবে। টঙ্ক জমির উপর কৃষকদের কোন স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দ্দি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টঙ্ক নাম তা জানা যায় না- এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ঐ সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরণ প্রভৃতি। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং জমিদারি এলাকায় যে টঙ্ক ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হতো সাত থেকে পনের মণ। অথচ ঐ সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময়ে

BanglaBook.org

ধানের দর ছিল প্রতিমণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হতো এগার টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা।"

জমিদারদের শোষণের পাশাপাশি ছিল মহাজনদের শোষণ। সারা ভারতবর্ষব্যাপী মহাজনী দানবরা ছিল কৃষকের শত্রু এবং জমিদারের বন্ধু। মহাজনী প্রথায় কৃষকরা কিভাবে সর্বস্বান্ত হত তার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'বিদ্রোহী ভারত' গ্রন্থে।

"অতি সরল প্রকৃতির হাজং চাষীরা তাদের (মহাজনদের) কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বিনা দলিলপত্রে পাঁচ, সাত বা দশ টাকা ঋণ নিয়ে তাদের জমি ও বাস্তুভিটা বন্ধক রাখত। বলা বাহুল্য, সেই জমি ও বাস্তুভিটা তারা কোনদিন উদ্ধার করতে পারত না। হাজং অঞ্চলের হালুয়াঘাট ও নালিতাবাড়ি গ্রামে এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, একটি ছাতার বিনিময়ে মহাজন এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা জমি দখল করে নিয়েছে, একটি কোদাল অথবা কয়েক সের লবণের বিনিময়ে চাষীর তিন চার বিঘা জমি গ্রাস করেছে। মাত্র দশ টাকার সুদ পাঁচ বৎসরে আড়াই শত টাকায় পরিণত হবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি মহাজন বিরোধী আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল।"

১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আলোড়নের পাশাপাশি কৃষক সংগ্রামেরও ঝড় উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় একদিকে যেমন ইংরেজ শোষণ বিরোধী বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, তেমনই সামন্তবিরোধী জমিদার, মহাজন বিরোধী কৃষক বিদ্রোহও জেগে উঠতে থাকে। এর ছোঁয়া হাজং এলাকায় এবং ময়মনসিংহের মুসলিম সম্প্রদায়ের চাষীদের মধ্যেও লেগেছিল। কিন্তু বড়ো রকমের আন্দোলন শুরু হয়নি। তখন সুসং পরিবারের জমিদারের সন্তান মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে কোলকাতায় শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। একবার তিনি তাঁর নিজ গ্রামে আসলে কয়েকজন মুসলিম কৃষক তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে কমরেড মণি সিংহ কোলকাতা ত্যাগ করে গ্রামেই ফিরে আসেন এবং জমিদার বিরোধী ও টঙ্ক বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন কোলকাতা ছাড়া কোথাও কোন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। হাজং এলাকাতে তো নয়ই। কমরেড মণি সিংহ নিজেই উদ্যোগ নিয়ে হাজং ও মুসলিম কৃষকদের

BanglaBook.org

সংগঠিত করেন। ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ারও কাজে হাত দেন। এই রকম দুর্বল ভিত্তিতে কোন হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ নয় বলে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন। তবে কৃষকদের মধ্যে প্রচার আন্দোলন এবং আইনসঙ্গত সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

কমরেড মণি সিংহ পরবর্তীতে নিজেই লিখেছেন, "(সেই সময়ের) আন্দোলনের ধারা হবে অহিংস-আইনসঙ্গত। কি করতে হবে তা ঠিক করে নিলাম। ধান দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এটাই হবে মূল কার্যধারা। কিন্তু বলতে হবে- আমরা খাজনা দিতে চাই, তা জোতস্বত্বের নিরিখ মতো দিব। ধান দিয়ে আমরা পারি না, আমরা বাঁচি না। আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি। আইনসঙ্গত রাখার জন্যই এইরূপ বক্তব্য বলা দরকার। নচেৎ খাজনা বন্ধের আন্দোলন বলে সরকার এই আন্দোলনকে বেআইনী ঘোষণা করতে পারে।"

এই আন্দোলনের দাবিগুলো ছিল এইরূপ:

১. টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ চাই।
২. টঙ্ক জমির স্বত্ব চাই।
৩. জোতস্বত্ব নিরিখ মত টঙ্ক জমির খাজনা নির্ধারণ করতে হবে।
৪. বকেয়া টঙ্ক মওকুব চাই।
৫. জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ চাই।
৬. সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

অল্প দিনের মধ্যেই এই আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। আন্দোলনের সংগঠনও মজবুদ হয়ে ওঠে। হাজং কৃষকরা নতুন বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিজেদের পূর্ণ অধিকার কায়েম করতে অগ্রসর হন। টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদ না হলেও হাজং এলাকায় কৃষকরা যে সকল আংশিক দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। জমিদার ও তালুকদাররা যে হাট বসিয়েছিল তার তোলা ও ট্যাক্স ছিল অত্যাধিক। হাজং কৃষকরা এই তোলা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। যেখানে পারলেন না সেখানে তারা বিকল্প হাট বসিয়ে জমিদার তালুকদারদের জব্দ করলেন। হাজং কৃষকদের বনের কাঠ আহরণের অধিকার ছিল না। এইবার সেই অধিকার আদায় হলো। বিলে মাছ ধরারও অধিকার ছিল না। বিলের মাছ ছিল একচেটিয়া জমিদারদের জন্য। এবার কৃষকরা মাছ ধরতে শুরু করলেন। জমিদার-জোতদার-

BanglaBook.org

তালুকদাররা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এই নিয়ে জমিদারদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে কৃষকদের অনেকবার সংঘর্ষ হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দলবদ্ধ, সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকরাই জয়ী হয়েছে এবং লাঠিয়ালরা পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। জমিদার তালুকদারদের ভেট দেওয়া, তাদের জন্য বেগার খাটা বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি টঙ্ক আদায়ও অনেক কমে গিয়েছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের শীতকালে দেখা গেল জমিদাররা আগেকার তুলনায় এক চতুর্থাংশ ধানও আদায় করতে পারেনি। হাজং এলাকা থেকে পুলিশ ও জমিদারদের শাসন কয়েক বৎসরের জন্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই রকম অবস্থায় বাধ্য হয়ে বৃটিশ সরকার টঙ্ক প্রথার কিছু সংশোধন করে ১৯৪০ সালে। কিন্তু টঙ্ক প্রথা এবং জমিদারি ব্যবস্থা একেবারে উচ্ছেদ হয়নি।

এরপরে 'জনযুদ্ধের' যুগে পার্টি সাময়িকভাবে হলেও কৃষক আন্দোলন স্থগিত রেখেছিল। ১৯৪৬ সালে পার্টি আবার 'চূড়ান্ত আঘাত হানা'র লাইন গ্রহণ করে। সেই সময় মণি সিংহের নেতৃত্বে আবার দ্বিতীয় দফায় টঙ্ক আন্দোলন শুরু হয়। এটা ছিল সেই সময় যখন কংগ্রেস নেতারা আন্দোলনের পরিবর্তে বৃটিশের সঙ্গে দর কষাকষি নিয়ে ব্যস্ত। যেকোন ধরণের গণআন্দোলনকে তারা বাধা দেওয়ারই চেষ্টা করছিল। আর মুসলিম লীগ তো পাকিস্তানের দাবি নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার ও বৃটিশের দালালি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এটা ছিল সেই সময় যখন পার্টি নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। মণি সিংহের বিবরণ থেকে জানা যায়, সুসং দুর্গাপুরের এক স্কুলের মাঠে সভার মাধ্যমে নতুন করে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পাহাড় অঞ্চল থেকে দলে দলে হাজং কৃষকরা সভাস্থলে উপস্থিত হন। কমরেড মণি সিংহ তখন আত্মগোপনে থাকলেও সভাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। কমরেড মণি সিংহের এক লেখা থেকে জানা যায় "ভলান্টিয়াররা যখন কাঁটাতারের বেড়া দেখল (পুলিশের দেওয়া) তখন কালক্ষেপ না করে স্লোগান দিতে দিতে কাঁটাতারের বেড়া ভেঙ্গে চুড়মার করে ফেলল। বিরাট মিছিল আর বল্লম দেখে সশস্ত্র পুলিশ সেস্থান ছেড়ে থানার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। শুধু কাঁটাতারের বেড়া নয়, টেলিগ্রাফের তারও ছিন্ন করে ফেলা হলো।"

ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ শহরে ভিয়েতনাম দিবসে পুলিসের গুলিতে যে ছাত্রনেতা অমলেন্দু শহীদ হয়েছিলেন তার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদও করা হয়েছিল এই সভা থেকে। অর্থাৎ এর থেকেই সভায় যোগদানকারী সংগ্রামী

BanglaBook.org

মানুষের চেতনার উন্নত স্তরটিও অনুমান করা যায়। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে ছিলেন শ' খানেক হাজং মহিলা।

সুসং দুর্গপুরের অপরপারে বিরিশিরিতে সশস্ত্র পুলিসের ঘাঁটি করা হলো। সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যাতে গুলি চালানোর অর্ডার দেওয়া যায়। ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। সুসং দুর্গাপুরের অপরপারে বহেরাতলী গ্রাম। পূর্বোক্ত পুলিশ ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র ৫জন পুলিশ ঐ গ্রামে এসে হাজং বাড়িতে তল্লাসী শুরু করে। তখন হাজং মেয়েরা দা নিয়ে তাদের তাড়া করে। ভয়ে পুলিশ পালিয়ে যায়। এরপর আরও বেশি সংখ্যক পুলিশ ঐ একই গ্রামে আসে এবং কুমুদিনী নামে ২১ বছরের এক তরুণীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন নিকটবর্তী মাঠ দিয়ে আসছিলেন চল্লিশ জনের এক ভলান্টিয়ার গ্রুপ যাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন মহিলা। তাদের একজন মাঝবয়েসী হাজং মহিলার নাম রাসমণি। রাসমণি ছিলেন বিধবা, মাঝবয়েসী, সাহসী সংগঠক। অবশ্যই গরিব কৃষক ঘরের মেয়ে। তার সমাজসেবা ও বিপ্লবী কার্যক্রম ঐ অঞ্চলে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। সেদিন রাসমণি কুমুদীনিকে ছাড়িয়ে আনার জন্য দৌড়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে রাসমণিকে হত্যা করে। এরপর সুরেন্দ্র নামে আরেক বিপ্লবীকেও তারা গুলি করে হত্যা করে। তখন হাজং বিপ্লবীদের গ্রুপ বল্লম নিয়ে পুলিসের উপর আক্রমণ চালায়। বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলে দুই পুলিশ মারা যায়। ময়মনসিংহের টঙ্ক বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলেন রাসমণি ও সুরেন্দ্র। সেই সময় অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সহরওয়ার্দী সাহেব। তার মন্ত্রীসভা ও প্রশাসন পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে হাজং এলাকায় অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে দিয়েছিল। এমনকি হেলিকপ্টারে করে আকাশে টহল দিতে থাকে এই পাহাড়ি অঞ্চলে কি ঘটছে তা দেখার জন্য ও দমন করার জন্য। কোলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সহরওয়ার্দীর কাছে হাজং এলাকার অত্যাচারের কাহিনি বিবৃত করলেও তিনি কোন ভূমিকা নেননি এবং নির্যাতনের পথ থেকে বিরত হন নি। এমনকি নির্বাচিত আইনসভার সদস্য জ্যোতি বসু (পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী), ব্যারিস্টার স্নেহাংশু আচার্য্য (যিনি মুক্তাগাছার মহারাজার পরিবারের সন্তান, যদিও তিনি তখন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য) ও প্রভাত দাসগুপ্ত নামক এক সাংবাদিক এই তিনজনের এক কমিটিকে হাজং এলাকায় তথ্যাবলি সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের জন্য কোলকাতা থেকে পাঠানো

BanglaBook.org

হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ প্রশাসন তাদেরকে এলাকায় প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে বৃটিশ আমলেই একটি মামলা হয়েছিল। মামলায় মণি সিংহসহ অনেকেই আসামী ছিলেন। পুলিশ কিছু মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করেছিল। তাদেরকে দিয়ে মিথ্যা বিবৃতিতে টিপসইও নেওয়া হয়েছিল। সাক্ষীরা কি বলবে তাও শেখানো হয়েছিল। মজার কথা হলো এই যে, কোর্টে উঠে এই সাক্ষীরা কেউই মিথ্যা কথা বলতে রাজি হয়নি। বরং বলেছে, পুলিশ তাদেরকে দিয়ে জোর করে একটা কাগজের উপর টিপসই নিয়েছে। এমনকি একজন মুসলমান ও একজন নেপালি পুলিশও আদালতে মিথ্যা কথা বলতে রাজি হয়নি। ফলে কোর্টে মামলা খারিজ হয়ে যায়। অবশ্য কোর্টে কোন আসামী উপস্থিত ছিলেন না। উল্লেখ্য, সেই মামলা আবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে কোর্ট তোলা হয়েছিল যেখানে মণি সিংহ অন্যতম আসামী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের আগ পর্যন্ত হাজং ও গারো এলাকায় যে বর্বর অত্যাচার চলে তার ফলে অনেকেই বিশেষ করে গারোরা দেশ ভাগের পর ভারতে আশ্রয় নিতে চলে যান। হাজংদের প্রায় বড়ো অংশই আবার দেশে ফিরে আসেন।

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট দেশভাগ হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৮ সালেই হাজং এলাকায় আবার নতুন করে টঙ্ক বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তখনও নেতা কমরেড মণি সিংহ। সেই আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করেছিল। সেই সশস্ত্র সংগ্রামের বিবরণ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হবে। সেটাই ছিল টঙ্ক আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়।

নানকার বিদ্রোহ: বৃহত্তর সিলেট

নান শব্দের অর্থ রুটি। সেখান থেকেই নানকার শব্দের উদ্ভব। যে প্রজা চাষীকে কেবলমাত্র রুটি অর্থাৎ খাদ্য দিয়ে রাখা যায় তাদেরকে বলা হয় নানকার। অনেকটা দাস যুগের দাসদের মতো অথবা গরু-ষাড়ের মতো যাদেরকে কেবল খাবার দিয়েই সব কাজ করানো যায়। চাষের কাজ, গাড়ি টানার কাজ। উপরন্তু দুধ সংগ্রহ করা যায়, লাথি দিয়ে পেটানো যায়। নানকাররা অতীত যুগের দাস অথবা গৃহপালিত পশুর মতো। জমিদাররা ছিল তাদের মালিক। সিলেট জেলায় নানকার প্রথা, বেগার প্রথা বা চাকরাণ প্রথা নামেও পরিচিত।

BanglaBook.org

জমিদাররা নানকারদের বসবাসের জন্য ছোটো একটা ভিটা এবং দু'চার বিঘা জমি বরাদ্দ করত যেখান থেকে ইচ্ছা করলেই জমিদাররা তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারত। এই বরাদ্দকৃত জমির বিনিময়ে নানকারদের জমিদারের হুকুম মতো কাজ করতে হতো। ঘরের কাজ এবং জমিদারের জমি চাষের কাজ। বলাই বাহুল্য এর জন্য কোনো মজুরী দেয়া হতো না। অর্থনীতির ভাষায় এদেরকে বলে ভূমিদাস। বিনা মজুরীর এই খাটুনীকে বলা হতো 'হদ' বা 'বেগরি'। নানকারদের বলা হত নানকার প্রজা, হদুয়া প্রজা বা বেগার প্রজা।

বরাদ্দকৃত জমিতে চাষ করার সময় ও সুযোগই তারা পেত না। জমিদারদের হুকুম মানতেই তাদের সময় চলে যেত। ফলে জমিতে ফসল হতো কম এবং সারা বৎসর তারা প্রায় অভুক্ত থাকত। নানকার প্রজার অধিকার ছিল কেবলমাত্র ভিটায় বাস করার। ঐ জমিতে কোন গাছ জন্মালে সেটাও জমিদারের দখলে চলে যেত। বলাই বাহুল্য ঐ জমি বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক ইত্যাদির অধিকারও তার ছিল না।

শুধু তাই নয় নানকার প্রজার পুরো পরিবারকেই জমিদারের হুকুম মত কাজ করতে বাধ্য করা হত। এমনকি নানকার মেয়েদেরও জমিদারের জন্য কাজ করা ছিল বাধ্যতামূলক এবং তা বিনা মজুরীতে। জমিদারের ডাকে নানকার পরিবারের বালক-বালিকাদেরও বেগার খাটতে হতো।

কোনো কারণে জমিদার নানকারের উপর অসন্তুষ্ট হলে তাদের ভয়ঙ্কর ধরণের শাস্তি দেওয়া হতো। কোর্ট কাচারির কোনো বালাই ছিল না। জমিদার ও তার নায়েব মুন্সিরাই ছিল বিচারক এবং তাদের মুখের কথাই ছিল আইন। কিল, চড়, জুতো পেটা, জরিমানা, বেত মারা, হাত পা বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা, দুটি আস্ত বাঁশের ফাঁকে বা তক্তার তলায় হাত পা বা গোটা দেহ ফেলে দুপাশে চেপে ধরে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের করা, লোহার শিক পুড়িয়ে গায়ে সেঁক দেওয়া, বন্ধ ঘরে অভুক্ত অবস্থায় এক সপ্তাহের বেশি দিন আটক রাখা ইত্যাদি। এইসব কারণে যদি নানকারের মৃত্যু হতো তার জন্য নির্যাতনকারী জমিদারের বা জমিদারের লোকদের কোনো বিচার হতো না। এমনকি এই মৃত্যুর জন্য তার আত্মীয় স্বজনরা গলা ছেড়ে কাঁদতে পর্যন্ত পারত না। নানকার নারীদের ভোগ করার স্বাভাবিক অধিকার ছিল জমিদারদের বা জমিদারের নায়েব বা দালালদের।

BanglaBook.org

এমন নির্যাতন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও কখনও নানকাররা প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করেনি এমন নয়। কিন্তু সংগঠিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক বিদ্রোহ খুব বেশিদিনের কথা নয়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যেই নানকার বিদ্রোহ ব্যাপকরূপ লাভ করেছিল। সেই সময়ের কথা বিদ্রোহের মহান নায়ক অজয় ভট্টাচার্য লিখেছেন–

"ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে সিলেট জেলার নানকার সমাজ অবশেষে শেষ সীমান্তে এসে পৌঁছাল, বিদ্রোহের আগুনে চারদিক ঝলসে দিয়ে তারা ইতিহাস সৃষ্টি করল। সিলেট জেলায় এই বিদ্রোহের কালটা হলো ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল। তারপর নানকার প্রথা আইনত লোপ পেয়েছে। কিন্তু লোপ পায়নি সামন্ত ব্যবস্থা। প্রচুর সম্ভাবনাময় এই বিদ্রোহটি ইতিহাসের পাতাকে পুরোপুরি ওল্টাতে পারেনি।"

"স্বাভাবিকভাবেই লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচার যেখানে নিত্যদিনের ঘটনা, বিদ্রোহ সেখানে আপনা-আপনিই অঙ্কুরিত হয়। আপনার জীবন রক্ষার তাগিদে নানকার সমাজকে তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে হয়েছিল।"

১৯৪৫ এর আগেই বিংশ শতাব্দীতেই বৃহত্তর সিলেট জেলায় কয়েকবার নানকার বিদ্রোহ ঘটেছিল যদিও তা খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। সেই রকম দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯২২-২৩ সালে (তখনও কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠেনি) সুখাইড় গ্রামে নানকার প্রজারা বিদ্রোহ করেছিলেন। বিদ্রোহের কারনটি একটু অন্য ধরণের। গ্রামের জমিদারের নজর পড়ে একটি মেয়ের প্রতি। জমিদার তার পাশবিক লালসা মেটানোর জন্য মেয়েটিকে ডেকে পাঠায়। তখনকার সময়ে নিয়মটি এমন ছিল যে অসহায় বাবা মা বাধ্য হতেন মেয়েকে জমিদারের কাছে পাঠানোর জন্য। কিন্তু এবার তা হলো না। এতে ক্রুদ্ধ জমিদার গুণ্ডা বাহিনী পাঠিয়ে নানকারের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে আসে এবং জমিদারের বাড়িতে আটক রাখে। এইবার যে ব্যতিক্রমি ঘটনা ঘটল তা হলো, নানকার প্রজারা ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদারের বাড়ি চড়াও হয়ে মেয়েটিকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। এতে জমিদার ক্ষিপ্ত হয়ে নানকার প্রজাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। নানকাররা জমিদারের হুকুম মানতে অস্বীকার করে, জমিদারের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং নিজেদের ভিটা আগলে বসে থাকে।

BanglaBook.org

এবার অসহায় জমিদার পার্শ্ববর্তী জমিদারদের ও আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য প্রর্থনা করে। আর অন্যদিকে ঐ গ্রামের নানকাররাও পার্শ্ববর্তী নানকারদের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেন। আশেপাশের গ্রামের নানকাররাও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। প্রধানত সুনামগঞ্জের (বর্তমানে জেলা) গৌরারঙ্গ এবং তখনকার শ্রীহট্ট সদর মহকুমার বোয়ালজুড় গ্রাম দু'টিতে বিদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠেছিল। দুই বৎসর পর্যন্ত এই সব গ্রামের জমিদাররা নানকারদের দিয়ে কোনো কাজ করাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসকদের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বিদ্রোহের পরাজয় ঘটে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সুখাইড় গ্রামের ব্রজবাসী দাস। বিদ্রোহে পরাজয়ের পর তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ বলেন তিনি খাসিয়া পাহাড়ের পথে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। আবার অন্য কথাও প্রচলিত আছে। জমিদাররা তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছিল।

১৯৩১-৩২ সালে সিলেট জেলার কুলাউড়ায় নানকার বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। সেই সময় ভরতের স্বাধীনতা সংগ্রামও বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। তার প্রভাব গিয়ে পড়েছিল কুলউড়া গ্রামে। কুলাউড়ার নানকার প্রজারা বলেছিলেন, "দেশের স্বাধীনতার অর্থ যদি হয় নিজের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা তবে আমরা আর জমিদারের বেগার খাটব না।" ১৯৩১ সালে তারা জমিদারের বেগার খাটা বন্ধ করে দিলেন। নানকার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য শুধু জমিদার নয়, স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও জমিদারদের পাশে এসে দাঁড়াল। এবং এই কারণেই শেষ পর্যন্ত নানকারদের বেগার বিরোধী সংগ্রামের পরাজয় ঘটে।

১৯৩০-৩২ সালে কৃষক ও নানকারদের বিদ্রোহ ঘটেছিল ভানুবিল অঞ্চলে যেখানে প্রধানত মণিপুরী কৃষকদের বাস ছিল। এই অঞ্চলটি পৃথিমপাশার কুখ্যাত জমিদার আলী আমজাদ খাঁ'র জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মতো নিষ্ঠুর অত্যাচারী জমিদার খুব কমই ছিল। তার মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে আলী হায়দার খাঁ ও আলী আজগর খাঁ উত্তরাধিকারী হিসেবে জমিদারির লাগাম ধরেছিল। প্রজা পীড়নের ক্ষেত্রে তারা তাদের বাপের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিল। তবে পাকিস্তান আমলে এই বংশেরই সন্তান আলী হায়দার খাঁ'র ছেলে আলী সফদার খাঁ কৃষকের পক্ষ হয়ে নিজ পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ভাসানী ন্যাপেরও কেন্দ্রীয় নেতা হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে এবং মহাত্মা গান্ধী খাজনা ও কর বন্ধেরও দাবি

BanglaBook.org

তোলেন। এর প্রভাব গিয়ে পড়েছিল ভানুবিলের কৃষক ও নানকারদের উপর। ভানুবিলের মণিপুরী কৃষকরা জমিদারের খাজনা ও সরকারি কর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়।

এর প্রতিশোধ নিতে ও বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে আসে বৃটিশ সরকার ও জমিদার পক্ষ। সরকারি সৈন্য, সশস্ত্র পুলিশ ও জমিদারদের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে কৃষকদের মারপিট করে, সম্পত্তি লুট করে, কৃষকদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়, হাতি দিয়ে জমির ফসল নষ্ট করে এবং মেয়েদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। সেই সময় সত্যাগ্রহ চললেও কংগ্রেস কর্মীরা কৃষকের পক্ষে তো এলোই না এমনকি ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। এদিকে সরকার ও জমিদারদের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকরাও প্রতিরোধে এগিয়ে এল। সমগ্র ভানুবিল অঞ্চল যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হলো। কংগ্রেস নেতারা এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে অহিংস নীতির লংঘন বলে সমালোচনা করল। সেখানে অত্যাচার এমন এক পর্যায়ে উঠেছিল যে বাংলাদেশের আইনসভায়, দিল্লীতে বড়ো লাটের কাউন্সিলে ও কেন্দ্রীয় আইসভায়, এমনকি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টেও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বণিত হয়েছিল। সুনামগঞ্জে তথা সুরমা উপত্যকায় প্রধানত কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৩৬ সালে। সুনামগঞ্জ তখন সিলেট জেলা এবং আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৩৬ সালে সুনামগঞ্জের বেহেলি গ্রামে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে জমির উপর প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা, নানকার প্রথা ও বেগার প্রথার অবসান, জমিদারদের বেআইনী আদায় ও জুলুম বন্ধের দাবি ওঠে। এই সম্মেলন সমগ্র সিলেট জেলায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সুনামগঞ্জের বংশীকুণ্ডার জমিদারের অত্যাচরের বিরুদ্ধেও ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর ফলে জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

এই সবের প্রভাব ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনেও পড়েছিল। জমিদারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কৃষকরা প্রধানত জমিদার বিরোধী প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন। এই নির্বাচনে কৃষক সমিতির নেতা (প্রজাবন্ধু বলে পরিচিত, যদিও তিনি নিজেও সামন্ত) করুণাসিন্ধু রায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তার পুত্র প্রসূন কান্তি রায় যিনি পরবর্তীতে বরুণ রায় নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি পাকিস্তান

BanglaBook.org

আমলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং বরুণ রায় সুনামগঞ্জের অনেক কৃষক আন্দোলনে সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

করুণাসিন্ধু রায় আসামের আইন পরিষদে শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপন করেন। এই বিলটি পরিষদের বাইরেও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রজাস্বত্বের দাবিতে কৃষক কর্মীদের নেতৃত্বে শত শত কৃষক দুর্গম খাসিয়া পাহাড় অতিক্রম করে শিলঙে অভিযান করেন। তখন আসামে মুসলিম লীগ সরকার ছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সাদ উল্লাহ। সেই সময় আসামের মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি মুসলিম লীগ করলেও সাদ উল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকের প্রজাস্বত্ব বিলের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। আসাম পরিষদের বহু এম.এল.এও এই বিলের পক্ষে দাঁড়ান। যার ফলে মুসলিম লীগের সাদ উল্লাহ মন্ত্রীসভার পতন হয় এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হয়েও কৃষকের পক্ষে এবং লীগ বিরোধী ভূমিকা রেখেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সাদ উল্লাহ ভাসানীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীতে পকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় সাদ উল্লাহ বলেছিলেন "এক ভাসানীই হবে যথেষ্ট পাকিস্তানের পতন ঘটানোর জন্য।" কথাটা আংশিকভাবে হলেও সত্যে পরিণত হয়েছে।

কৃষক আন্দোলনের চাপে নতুন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বাধ্য হয়েছিল জমির উপর রায়তি প্রজাদের জোতস্বত্ব স্বীকার করে নিতে। কিন্তু নানকার কৃষকদের দাবি অর্থাৎ বেগার প্রথার অবসান ও তাদের জমি-বাড়ির উপর জোতস্বত্বের দাবি কংগ্রেস মেনে নেয়নি। এর থেকে মুসলিম লীগের ন্যায় কংগ্রেসেরও শ্রেণী চরিত্র বোঝা যায়।

১৯৪৬ সালে কমিউস্টি পার্টি 'চূড়ান্ত আঘাত হানা'র কর্মসূচি যখন গ্রহণ করে তখন বাংলায় তেভাগা আন্দোলন এবং আসামের অন্তর্ভুক্ত সিলেট জেলায় নানকার বিদ্রোহ নতুন করে সংগঠিত হতে থাকে। বিশেষ করে সিলেট জেলার লাউতা-বাহাদুরপুরের নানকার কৃষক এবং মনেশ্বর ও দাসের বাজারের অন্যান্য কৃষকরাও সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। লাউতা-বাহাদুরপুরের সকল নানকার প্রজা একযোগে জমিদার বাড়ির কাজ ছেড়ে দিলেন। তারা দাবি তুললেন, বেগার প্রথার অবসান চাই, নানকার প্রজার জমি-বাড়ির উপর জোতস্বত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। নানকার আন্দোলনের সমর্থনে লাউতা-বাহদুরপুরের সাধারণ প্রজারাও জমিদারের বাড়ি যাওয়া ও খাজনা দেওয়া একযোগে বন্ধ করলেন।

BanglaBook.org

কৃষক সমিতি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনই করেনি, তারা নানকার ও কৃষকদের মধ্যে সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। আগে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিরোধ মীমাংসা ও বিচারের জন্য যেত জমিদার বাড়িতে, এখন তারা আসে কৃষক সমিতির অফিসে।

নানকার ও কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জমিদারগণ একযোগে কাজ শুরু করে। কংগ্রেসী জমিদার শ্যামাপ্রসাদ দেবের বাড়িতে পুলিসের ঘাঁটি বসানো হলো। একদিকে হিন্দু মুসলমান জমিদাররা এক হয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রজাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু সফল হয়নি।

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্ট দেশ ভাগ হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। বৃহত্তর সিলেট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় বসল। ক্ষমতায় বসেই তারা দমননীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতি চালানো শুরু করল। আগে যেখানে কংগ্রেসী জমিদার শ্যামাপ্রসাদ দেবের বাড়িতে পুলিশ ঘাঁটি বসানো হয়েছিল, এখান সেখানে পুলিশের ঘাঁটি বসানো হলো মুসলিম লীগের নেতা বাহাদুরপুরের জমিদারের বাড়িতে। এখানে উল্লেখ্য, কৃষকদের বয়কট আন্দোলন, অর্থাৎ জমিদারের বাড়ি না যাওয়া ইত্যাদি পাকিস্তান হওয়ার পরও অব্যাহত ছিল। এমনকি কৃষকরা জমিদার বাড়ির বাজার বয়কট করে বিকল্প কৃষক সমিতির বাজার স্থাপন করে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৪৭ ও ১৯৫০ সালে যখন উভয় বাংলায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল তখনও নানকার বিদ্রোহের এলাকায় দাঙ্গা তো দূরের কথা সামান্যতম সাম্প্রদায়িক মনোভাবও দেখা যায়নি।

পাকিস্তান আমলে নতুন করে নানকার আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সংগ্রাম সশস্ত্র রূপলাভ করেছিল। নানকার বিদ্রোহের প্রধান নেতা অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'নানকার বিদ্রোহ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় (পৃষ্ঠা ৮৬) "আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় বাহিনী ১৫০ জনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল আর গ্রাম রক্ষীবাহিনীগুলোর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় শপাঁচেক। তাঁদের হাতে গাদাবন্দুক, রাইফেল প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ছিল ৭০/৮০টি। এগুলো মেরামত করা এবং পাইপগান, গোলাবারুদ তৈরি করার জন্যে তাদের নিজস্ব কারখানা ছিল। এই আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন রবি দাস(যিনি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন), রাজনৈতিক সাংগঠনিক নেতৃত্বে ছিলেন লালা শরদিন্দু (বুলিবাবু)। তাঁদের সঙ্গে নেতা ও কর্মীদের ভেতর উল্লেখযোগ্য ছিলেন যতীন দাস, প্রমোদ দাস, শরদিন্দু

BanglaBook.org

চৌধুরী, জ্ঞান দাস, অনিমা দাস, কালীচরণ হাজং, উনেশ্বর হাজং, ব্রজনাথ হাজং প্রমুখ। সিলেট জেলা কমিটির নেতারাও সব সময় গোপন পথে সে অঞ্চলে গিয়ে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।"

১৯৫০ সালের দিকে নানকার ও কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতি দেখে ভীত মুসলিম লীগ সরকার নানকার কৃষকদের বাড়ি ও অর্ধেক জমির উপর জোতস্বত্ব স্বীকার করে নেয়। এইভাবে আংশিক দাবি পূরণ হলেও সামন্ত ব্যবস্থা ও তার জের অব্যাহত থাকে।

সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক যে সাহসী লড়াই করেছে তা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে মুসলিম লীগ সরকার ও ইংরেজ প্রশাসন যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল তা কেবল ঘৃণার সঞ্চার করে। '৪৭ পূর্ববর্তী নিখিল বঙ্গের সরকার ছিল মুসলিম লীগ সরকার, সহরওয়ার্দী ছিলেন যার মুখ্যমন্ত্রী, তখনও কৃষকরা নির্যাতিত হয়েছিল। গুলি খেয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল, নারীরা ধর্ষিত হয়েছিল। '৪৭ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে আবার সেই মুসলিম লীগ সরকারই আসল যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রথমে খাজা নাজিম উদ্দীন, পরে নুরুল আমীন। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি নুরুল আমীন যে গুলি চালিয়েছিলেন সে খবর জানেন। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের খুব কম লোকই জানে যে তথাকথিত স্বাধীন পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার আরও কী কী বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল। এখানে অসংখ্য নির্যাতনের কাহিনির মধ্যে দু'টি উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে (বাকিগুলো সম্পর্কে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হবে)। নাচোলে কৃষক সংগ্রামের নেত্রী ইলা মিত্রকে গ্রেফতার করার পর তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল। পর পর আটজন পুলিশ তাঁকে ধর্ষণ করে।

সিলেটে নানকার বিদ্রোহের সময় কৃষকনেত্রী অপর্না পাল গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনি তখন অন্তঃস্বত্তা ছিলেন। মুসলিম লীগের পুলিশ তাঁকে লাথি মেরে তাঁর পেটের উপর চাপ দিয়ে গর্ভস্থ সন্তানটিকে হত্যা করে। এরকম অত্যাচারের আরও বহু ঘটনা আছে। একদিকে অত্যাচার আরেকদিকে সংগ্রাম। এভাবেই তৈরি হয়েছে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রামী সংস্কৃতি। এই ধরণের অসংখ্য ঘটনা ও পথ ধরেই ১৯৭১ সালের মুক্তির সংগ্রামের পটভূমি তৈরি হয়েছিল।

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ পনেরো

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার শিল্প-সাহিত্য

১.

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা, সাহিত্য, গান, যাত্রানাটক ও চিত্রকলায় এক অভূতপূর্ব উত্তরণ ঘটেছিল এবং অনেক প্রগতিশীল উপাদান যুক্ত হয়েছিল। সাহিত্যে এসেছিল বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং কমিউনিস্ট শ্রেণী চেতনা। যার কোনটাই উনবিংশ শতাব্দীতে পাওয়া যাবে না।

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব। মধ্যযুগীয় কাব্যের পর্যায় অতিক্রম করে বাংলা ভাষার কাব্য জগৎ এক অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছিল। প্রথমে মাইকেল, পরে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। বঙ্কিমের হাত দিয়েই সার্থক বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছিল। ছোটো গল্প এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' এবং মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণে'র মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীভিত্তিক নাটকও রচিত হয়েছিল। আমরা অবশ্য এখানে সাহিত্যের নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করছি না। সমাজ সাহিত্যে যে প্রগতিবাদী উত্তরণ ঘটেছিল সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সেই সময়ই আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে কিছুটা বুর্জোয়া উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অবশ্য তা স্বল্পসংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। তারা পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তারা বৃটিশ শাসনের ভক্ত ছিলেন (কিছু ব্যতিক্রম ছিল)। তারা একদিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী

BanglaBook.org

অপরদিকে জমিদারি প্রথার সমর্থক এবং কৃষক বিদ্রোহের বিরোধী ছিলেন। অবশ্য সেখানেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ।

সেই যুগে যখন সতীদাহের মত বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল তখন নারী প্রসঙ্গে তুলনামূলক সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের অনেকে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে কিছুটা হলেও নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর, মীর মশাররফ হোসেনের মতো অনেকেরই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। আবার বঙ্কিমের মতো অত বড়ো সাহিত্যিকের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের পাশাপাশি নবাব আব্দুল লতিফের মতো তথাকথিত অভিজাত মুসলিম সমাজের নেতারা মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, মুৎসুদ্দি ও জমিদাররা, এমনকি রাজা রামমোহন রায়ের মতো উদার গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বও বৃটিশ শাসনকে আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দু মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করে বিদ্যা ও বিত্ত উভয় দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিলেন এবং আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমানরা সাম্রাজ্য হারানোর ক্ষোভে বৃটিশ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং কেউ কেউ ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। তারা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে। একদিকে তারা হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অপর দিকে তারা পশ্চাৎপদ প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী ধ্যান ধারণার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আরও বলতে হয় যে সেই সময়কার উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন উচ্চবর্ণের হিন্দু ও ব্রাহ্ম নেতারা নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং নারী শিক্ষার পক্ষে থাকলেও নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন (যেমন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশব চন্দ্র সেন)। যে সময় সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল তখন নারী পুরুষের সমতার কথা ভাবা যায় না। এমনকি বঙ্কিমও পরিণত বয়সে নারী পুরুষের সমতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। একমাত্র ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল গ্রুপই নারী স্বাধীনতা ও সাম্যের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতেন।

অবশ্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ব্যাপক কৃষক সমাজ ও শ্রমজীবী মানুষ, তারা নিরক্ষরই রয়ে গেলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে যে তর্ক বিতর্ক চলছে তার থেকে এই কৃষক শ্রমজীবী সমাজ অনেক দূরে অবস্থা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই

BanglaBook.org

কৃষক সমাজই প্রথম থেকেই বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন যার সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো সম্পর্কই ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধ থেকেই আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি। কিন্তু সেদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল না। তারা কি হারিয়েছিলেন সেটাও তারা বুঝতে পারেন নি। তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন উর্দু কবি হালি লিখেছিলেন–

কিয়ে হুয়ে সফর জিসনে সাতোঁ সমন্দর।
উহ ডুবা দহনে মেঁ গঙ্গাকে আকর।

আরেক জন অজানা কবি পলাশীর পরাজয়ের মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন তার কবিতায়–

কি হলো রে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
... ...
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি॥
দুধে ধোওয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান।
মীর জাফরের দাগা বাজিতে গেল নবাবের প্রাণ॥
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি।
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥

অনেক পরে বিংশ শতাব্দীতে সিরাজুদ্দৌলাকে মহান করে ইংরেজ বিদ্বেষী নাটক লেখা হয়েছে একাধিক। পলাশীর প্রসঙ্গ টেনে কবি নজরুলও লিখেছেন–

'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
... ...
কান্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাসীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ওই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।

ইংরেজ শাসনের শুরুর দিকেই যে ভয়াবহ মন্বন্তর হয়েছিল সে সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ মারা গিয়েছিল। সেই বেদনা ফুটে উঠেছিল রামপ্রসাদ সেনের সংগীতে–

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুধে বাতাসা (ওগো তারা)

BanglaBook.org

আমার এমনি দশা,
শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারে দিলে ধনজন মা হস্তী-অশ্ব-রথচয়,
ওগো তা'রা কি তোর বাপের ঠাকুর!
আমি কে তোর কেউ নই?
... ...
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি
শ্যামা হলি পাষানময়ী॥

অনুরূপভাবে যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের সাধারণ জনগণের ব্যাপক সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল তার প্রতিও কোলকাতা কেন্দ্রীক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের বিরোধী অবস্থান ছিল। তবে সেখানেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় ১৮৫৭ সালের ২১শে মে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজকোষ এড়িয়ে লেখেন–

"গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা থেকে দেখা গেছে যে ভারতীয় প্রজাদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুকুল্য একান্ত অল্প।

এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার গুরুভার অনুভব করছে না। বস্তুত এই অসন্তোষ বিদেশি শক্তির অধীনে হয়ে থাকার অবশম্ভাবী পরিণাম।"

সেই সময়ে বিহারের কবি কুমার সিংহ ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ ও তাতিয়া তোপীর বীরত্ব নিয়ে বীর্যগাথা রচনা করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছরই প্রকাশ লাভ করল রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', যেখানে লেখা হলো–

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় হে কে বাঁচিয়ে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায়?

তাহলে দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ কিছুটা বিস্তার লাভ করলেও তার মধ্যে স্ববিরোধীতা ছিল। সবচেয়ে র‍্যাডিকাল গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, মীর মশাররফ হোসেন (যিনি ছিলেন একাধারে জমিদার বিরোধী ও অসাম্প্রদায়িক), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরনাথ শাস্ত্রী, শেখ আব্দুল লতিফ (নবাব আব্দুল লতিফ নন), আব্দুর রহিম দাহরি প্রমুখ। ১৮৬২ সালে হাওড়ার ১২শত রেলওয়ে

BanglaBook.org

শ্রমিক ধর্মঘট করলে বিদ্যাসগর পরিচালিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় তা সহানুভূতির সঙ্গে ছাপানো হয়েছিল। পাবনার কৃষক বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের প্রতি হরিশচন্দ্রের সাহসী লেখার জন্য তাঁকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল। ১৮৭০ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমিক শ্রেণীকে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান জানিয়ে এক দীর্ঘ গান লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এটাই সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণীর স্বপক্ষে একটি রচনা (গান)। উল্লেখ্য, ঐ গানে তিনি নারী এবং পুরুষ শ্রমিক উভয়কেই জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৮৭৭ সালে মেদিনীপুরের শেখ আব্দুল লতিফ 'ধনী ও দরিদ্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধে আর্থিক বৈষম্য ও শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক আব্দুর রহিম দাহরি (তিনি উত্তর প্রদেশের মানুষ হলেও কোলকাতায় বসবাস করতেন) ছিলেন নাস্তিক, প্রকৃতিবাদী, দর্শন-গণিত-জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী পুরুষ।

উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ আলোকপ্রাপ্তির যুগে প্রবেশ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের বিশাল উল্লম্ফন ঘটেছিল। অনেক প্রতিভাবান কবি, লেখক ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের মধ্যে অনেক স্ববিরোধতা এবং কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান ধারণা থাকলেও অল্প সংখ্যক কয়েকজন পাওয়া যায় যারা যুগের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আরও পরে সাম্যবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যে ও শিল্পকলায় এর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৯৪৭ এর আগেই বাংলাদেশে একগুচ্ছ প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, চিত্রশিল্পী, যাত্রাশিল্পী, গণসংগীত রচয়িতা এবং বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক হিসেবে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (যার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিৎ ছিল বলে বর্তমান যুগের নোবেল কমিটি স্বীকার করেছে। সম্ভবত পরাধীন দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তদানীন্তন নোবেল কমিটি তাঁকে বাদ দিয়ে ইতালির মার্কনীকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যাপক সত্যেন বসু, মেঘনাথ সাহা- বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষ করে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় সত্যেন বসুর অবদান ছিল বিরাট মাপের। বোস-

BanglaBook.org

আইনস্টাইন সূত্রটি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। পদার্থবিদ্যায় এক শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র মৌলিক কণা আছে যাদেরকে বলা হয় বোসন। এই বোসন কথাটি এসেছে সত্যেন বসুর নাম থেকে। মাদ্রাজ প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনও পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। তিনি বসবাস করতেন কোলকাতায় এবং সেখান থেকেই নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার আগে প্রাচ্যের কেউ এই পুরস্কারটি পাননি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাঞ্জাবের উর্দু কবি আল্লামা ইকবালের কবিতায় শ্রেণী চেতনা ও বিপ্লবী ধারণা প্রকাশ পেয়েছিল। যেমন তার একটি কবিতায় (ফরমান এ খুদা) তিনি যা লিখেছেন তা বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়–

কিষাণ মজুর পায়না যে মাঠে শ্রমের ফসল
সে মাঠের সব শস্যকণায় আগুন লাগিয়ে দাও।

পরবর্তীকালে সেই ইকবাল মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন এবং ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইকবালের এই উল্টোমুখী স্রোত সত্যিই বেদনাদায়ক।

সেই সময় যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীরও আবির্ভাব ঘটেছিল। মুকুন্দ দাসের মতো প্রতিভাবান যাত্রা রচয়িতা ও অভিনেতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। চল্লিশের দশকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরীর মতো প্রতিভাবান কবি গায়ক সুরকারের আবির্ভাব সংগীত শিল্পকেই শুধু যে বিশাল উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাই নয়, তাদের গানের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট মতবাদ ও শ্রমিক কৃষকের মুক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছিল যা সাম্যবাদী আন্দোলনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সর্বপরি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের কবিতা, নাটক, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গান বিশ্ব সাহিত্যের অংশ হিসেবে বাংলা সাহিত্যকে অতি উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। এত বড়ো বহুমুখী প্রতিভা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। কবি হিসেবে তিনি শেক্সপীয়র ও গ্যাটের সমকক্ষ। ছোটো গল্পকার হিসেবে চেকভ ও মোপাসার সমপর্যায়ের।

BanglaBook.org

এছাড়াও বিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধে কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সমর সেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, তারাশংকার বন্দোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ, জসীমউদ্‌দীন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ প্রতিভাবান কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার সাহিত্যিকের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই মার্কসবাদী ও সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অবশ্য বেশ কিছু সাহিত্যিক রাজনীতি নিরপেক্ষ ছিলেন, কেউ কেউ গান্ধীবাদীও ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে এক মহিয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর নাম বেগম রোকেয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে (যে শতাব্দীর শুরুতে সতীদাহ প্রথা ছিল) সেই শতাব্দীতেই হিন্দু নারী সমাজে কিছুটা শিক্ষার বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু মুসলমান নারীরা ছিল অন্ধাকারাচ্ছন্ন, শিক্ষাবর্জিত এবং পর্দার অন্তরালে। অবশ্য সেই সময়ও তাহেরুন্নেসা নামে এক মুসলিম নারী লেখিকার সন্ধান আমরা পাই। কিন্তু সেটাকে ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরতে হবে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বেগম রোকেয়া অসম সাহসী ভূমিকা নিয়ে দৃঢ়তার সাথে লেগে থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা ও অপবাদকে অগ্রাহ্য করে মুসলমান মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন (সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কোলকাতা) এবং নারী শিক্ষার প্রসার ঘটান। শুধু তাই নয়, তিনিই ছিলেন প্রথম নারীবাদী লেখিকা যিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে নারী জাগরণ, নারী স্বাধীনতা এবং নারী পুরুষের সমতার জন্য সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া ছিলেন প্রথম নারীবাদী লেখক বা লেখিকা।

২.

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের স্বল্প কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রতিভার অন্যতম। তবে এই গ্রন্থে আমরা তাঁর সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করছি না। কিন্তু তাঁর লেখায় ও

BanglaBook.org

কাজে এই দেশের সমাজ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক চিন্তাবোধের ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপর তিনি যে বিশাল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার কিছুটা ধারণা দেওয়া হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে সরাসরি বৃটিশ শাসনকে সমালোচনা করে লিখেছেন এমন কেউ ছিলেন না। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুটা লিখেছেন, তবে অপ্রত্যক্ষভাবে। হরিশচন্দ্র অবশ্য পাবনার কৃষক প্রজা বিদ্রোহ ও নীল করের বিরুদ্ধে সরাসরি লিখেছেন। সেই সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র ও মীর মশাররফ হোসেন যথাক্রমে নীল কর সাহেব ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সোচ্চার হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের নাটকে দেখানো হয়েছে যে রানির দয়া প্রার্থনা করা হয়েছিল। সম্ভবত রাজরোষ এড়ানোর জন্য একটি কৌশল ছিল। রবীন্দ্রনাথ একটু পরের যুগের মানুষ। তাঁর জীবন উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সমান দুভাবে বিভক্ত। ইতোপূর্বে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় (যদিও পরবর্তীতে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ধারার মধ্যে চলে গিয়েছিলেন), তারা সকলেই কোনো না কোনো ভাবেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা লালন করতেন ও তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথের মত এতটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে পারেননি। তার একটি কারণ অবশ্য এই যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আরও পরের যুগের মানুষ। ১৮৯৮ সালেই মহারাষ্ট্রের নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক গ্রেফতার হলে তিনি এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রোধের বিরুদ্ধে 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধটি লেখেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেটাই ছিল প্রথম পরিপূর্ণরূপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন রচনা। এই রচনায় তিনি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি হাজির করেন। ঠিক একই রকম গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় যেখানে কবি ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে বলছেন,

ওরে বৎস শোন,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষ তিক্ত করি চপল চঞ্চল
নিন্দা ক্লান্ত হয়ে পড়ে; দিয়ো না তাহারে

BanglaBook.org

নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয় দুর্গে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই 'মেঘ ও রৌদ্র' নামে তিনি যে ছোটোগল্পটি লিখেছিলেন সেখানে বৃটিশ শাসন, সাদা চামড়া, রাজ কর্মচারীদের বর্বরতা ও অত্যাচার এবং তার সঙ্গে জমিদারদের নিষ্ঠুরতা যেভাবে ফুটে উঠেছে এমন বৃটিশ বিরোধী গল্প বা প্রবন্ধ তাঁর আগে কেউই লেখেননি। তিনিই প্রথম। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি যে সকল গান রচনা করেছিলেন তা জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল। একই সময় তিনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে তখনকার ভাইসরয়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের গালে একটি সজোরে চপটেঘাতের মতই যা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা আছে। সেখান থেকে একটি রচনার একটি অংশ (সফলতার সদুপায়) থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র উন্মোচন করে তিনি লিখছেন "... আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল বাসর ঘরে আমাদিগকে কোন কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে। ... ইম্পিরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহাদের খরচ জোগানো, সোমালিল্যান্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা, উষ্ণ প্রধান উনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর যোগান দেওয়া।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আফ্রিকা' কবিতাটি হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবিতা। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'রক্তকবরী' নাটকটি হচ্ছে পুঁজিবাদ বিরোধী অসাধারণ রূপক নাটক। 'মুক্তধারা' একটি রূপক রাজনৈতিক নাটক যেখানে দখলদার উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কলোনীর জনগণের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। বৃটিশ শাসকদের ভয়ে এদেশের সাধারণ নাট্যশালাগুলো মঞ্চস্থ করতে সাহস পায়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার ছিলেন। জমিদারি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু একথা সত্য যে, তিনি জমিদারি

BanglaBook.org

ব্যবস্থার অবসান চাননি। এমনকি তাঁর জমিদারিতে যারা জমিদার মহাজন বিরোধী সংগ্রাম ও প্রচার করছিলেন তাদেরকে তিনি বেশ কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাদেরকে তিনি লালমুখো গুণ্ডাতন্ত্র ইত্যাদি বলেও গালি দিয়েছিলেন (রায়তের কথা, কালান্তর)। এমনকি ১৯০৭ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে বক্তব্য রাখেন এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও গ্রাম উন্নয়নের যে পরিকল্পনা হাজির করেন সেখানেও গ্রাম্য শালিস মীমাংসার জন্য কোর্টে যাওয়ার আগে জমিদারের কাছে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, যেন জমিদাররাই ছিলেন প্রজাদের অভিভাবক। একথা সত্য যে তিনি তাঁর শ্রেণীচরিত্রের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। প্রজাদের শোষণের উপরই যে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সম্পদ গড়ে উঠেছে একথা তিনি একবারও উচ্চারণ করেননি। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করব অহিংসবাদী তলস্তয় ছিলেন জমিদার বিরোধী। তলস্তয়ের রচনাকে লেনিন রুশ বিপ্লবের দর্পণ বলে অভিহিত করেছেন। তবে একই সঙ্গে তলস্তয়ের চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের সমালোচনাও লেনিন করেছিলেন (যথা: তলস্তয়ের সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধিতা ও বাইবেলভিত্তিক সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন)। অন্যদিকে তলস্তয়ের মতই অহিংসবাদী গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ কখনওই জমিদার প্রথা উচ্ছেদের কথা বলেননি।

এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'দুই বিঘা জমি'র মত কবিতা ও 'শাস্তি'র মতো ছোটোগল্প জমিদারদের নিষ্ঠুরতা ও শোষণের চিত্র তুলে ধরে এবং জনগণের মধ্যে জমিদার বিরোধী সংগ্রামী চেতনা তৈরি করে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই ধরণের স্ববিরোধীতা আরও দেখা যাবে।

মাত্র কিছুদনি আগে রায়তের কথা প্রবন্ধে (কালান্তর) যে রবীন্দ্রনাথ বলশেভিকবাদকে গুণ্ডাতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের পর একটা বিরাট উত্তরণ ঘটেছিল। 'রাশিয়ার চিঠি'তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি যা লিখেছিলেন তা বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে অনেক সাহায্য করেছিল। তিনি বলেছিলেন রাশিয়ায় না আসলে তাঁর এই জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আবার একই সঙ্গে দেখি রবীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কিছু সমালোচনাও করেছেন। প্রধান সমালোচনার বিষয় ছিল এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে "সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা– সেটা হারালে সে

BanglaBook.org

যেন বোবা হয়ে যায়।" কিন্তু দেশের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষের কোনো সম্পত্তিই নাই, সেক্ষেত্রে কি হবে? এই প্রশ্নে কবি নিরুত্তর। এটাই হলো তাঁর শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ব্যবস্থা ও বৃটিশ শাসনকে অপরিবর্তিত রেখেই তার মধ্যেই মানব কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্ভব বলে মনে করতেন। যেমন 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি গান্ধীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, "... প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়– এটাই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া– ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোন জায়গাই নেই"। অর্থাৎ তাঁর মতে মানুষের মধ্যে প্রেম জাগ্রত করাই মুক্তির পথ। ইংরেজ শাসন বা জমিদারি ব্যবস্থা অবান্তর মাত্র। তিনি বড়ো ধরণের রাজনৈতিক আলোড়নকে পছন্দ করতেন না, সশস্ত্র সংগ্রাম বা বিপ্লব তো দূরের কথা। তবে মূলত অহিংসাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। যেমন 'মুক্তধারা' নাটকে উপনিবেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধরেছিল। ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান অচলায়তনকে (নাটকের নামও 'অচলায়তন') সশস্ত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। এবং সেই বলপ্রয়োগ করেছিল নিচু জাতের দুইটি সম্প্রদায়। এই সকল রচনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? তাঁর দুইটি রাজনৈতিক উপন্যাস আছে। 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'। 'চার অধ্যায়ে' তিনি সশস্ত্র বিপ্লবীদের অত্যন্ত নোংরাভাবে উপস্থাপন করেছেন (তার আগেই সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ বা প্রীতিলতার আত্মদান ঘটেছে। যার প্রতি তাঁর সামান্যতম সহানুভূতি দেখিনি)। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে দেখি, রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতাকে তিনি ভিলেন সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সমস্ত সহানুভূতি গেছে জমিদার নিখিলেশের প্রতি। নিখিলেশ বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন; দেশপ্রেমিকও বটে। কিন্তু রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। বরং এটাকে উপন্যাসের এক চরিত্র চন্দ্রবাবুর মুখ দিয়ে 'ছটফটানি' বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য এই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার কিছু রাজনৈতিক দুর্বলতার দিক সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন। ১. সাম্প্রদায়িক বিভাজন ২. বিদেশি কাপড় বর্জনের আন্দোলনে গরিব মানুষের সাড়া না পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ বিপ্লব বিরোধী, শান্তিবাদী, সংস্কারবাদী উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব যার দুর্বলতা ছিল সেসব জমিদারদের প্রতি যারা

BanglaBook.org

তাঁর নিজের মতোই উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন (রবীন্দ্রনাথ জমিদার হলেও দৃষ্টিভঙ্গিগতভাবে সামন্তবাদী ছিলেন না, বরং ছিলেন উদার মানবতাবাদী)। তাই দেখি 'যোগাযোগ' উপন্যাসে তাঁর ঘৃণা দিয়ে পড়েছে কুৎসিত চরিত্রের মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী মধুসূদনের প্রতি এবং সহানুভূতি রয়েছে জমিদার বংশের সন্তান উদারদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পজিটিভিস্ট কিন্তু অপদার্থ বীপ্রদাসের প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ভাববাদী। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে তিনি সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। নৈবেদ্য থেকে শুরু করে গীতাঞ্জলী পর্যায় পর্যন্ত এই ১২ বৎসর তিনি ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু সেটাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় নয়। বিশ্ব মানবতার পক্ষে, মানুষের পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং কখনও কখনও শোষিত মানুষের পক্ষে যে ভূমিকা রেখেছিলেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। একসময় তিনি 'নববর্ষ' প্রবন্ধে (বাংলা সাল ১৩০৯) সনাতন ভারতের জীবনাদর্শকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন যেখানে, "সতীস্ত্রী অনায়াসেই স্বামীর চিতায় আরোহন করিতেন।" বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বালিকা বধূর সহমরণের দৃশ্য যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে মনে হয় সহমরণ একটি মহৎ কাজ। রবীন্দ্রনাথও কি তাই মনে করতেন? না, সেভাবে দেখা ঠিক হবে না। ঐ অবস্থান থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল খুব দ্রুতই। প্রায় একই সময় রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' নামে আরেকটি প্রবন্ধে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতিভেদ প্রথা রক্ষার পক্ষে কথা বলেছেন। বলাই বাহুল্য এই অবস্থান থেকেও রবীন্দ্রনাথের উত্তরণ ঘটেছিল, যেমন তাঁরই আঁকা চরিত্র গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী 'গোরা'র পরবর্তীতে ধর্ম নিরপেক্ষতা, বিশ্ব মানবতাবাদে উত্তরণ ঘটেছিল। নিসঃন্দেহে 'গোরা' হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। একদা আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে বলেছেন "আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্য করিনে।... কেননা আমি যুথভ্রষ্ট, আমি ধর্ম সমাজের তকমা পরা ছাপ-মারাদের কেউ নই, রাজার দণ্ড উপাধিও আমি ত্যাগ করেছি, সম্প্রদায়ের দণ্ড উপাধিও আমার নেই"। (পত্র-১০৩, চিঠিপত্র-৯)

রবীন্দ্রনাথ মূলত ভাববাদী কবি হলেও, এবং আধ্যাত্মিকতা তাঁর রচনার বিশাল অংশ জুড়ে থাকলেও, কখনও কখনও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য চমকে দেবার মতো। যেমন 'রাশিয়ার চিঠি'তে লিখছেন, "এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকণ্যার মতো...।"

BanglaBook.org

ধর্মের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে শোষক পুঁজিপতির স্বার্থেই তা তিনি বলেছেন 'রক্তকরবী'র দুই একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে। "ওদের মদের ভাড়ার অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে।" অথবা "চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে রশিতে এই চাবুক তৈরি সেই রশির সুতো দিয়েই গোসাইয়ের জপমালা তৈরি।"

হেমলতা দেবীকে লেখা আরেক চিঠিতে (৩১শে জৈষ্ঠ্য, ১৩৩১) তিনি বলেছেন–

"আমার ঠাকুর মন্দিরে নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়, আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে যেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে ... যে দেবতা স্বর্গের, তার মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়"।

হেমলতা দেবীকে লেখা আরেক চিঠিতে (২৯শে চৈত্র, ১৩৩৭) তিনি মন্দিরে স্থাপিত দেবতার মুর্তিকে বারংবার 'খেলার দেবতা' বলে তাচ্ছিল্য করেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে দেবীর প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে পুরোহিত রঘুপতির মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলো বলেছেন সেটাও লক্ষ্য করার মতো।

"দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে।"

রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষ বয়সের লেখা 'মুসলমানির গল্প' নামে একটি অসাধারণ গল্প আছে। সেই গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু সমাজের কদর্যতা, কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোস যেমন উন্মোচন করেছেন, তেমনি পাশাপাশি উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন মুসলমান সমাজের তুলনামূলক উদারনৈতিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন, কিন্তু কখনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতায়ও তিনি বিশ্বাস করতেন না। 'গোরা' উপন্যাসে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার এবং বিশ্ব মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তা যদি সেদিনকার জাতীয় নেতারা অনুসরণ করতেন তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্যপথে রচিত হতো।

'নারী প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই একজন মানুষকে চেনা যায়'– একথা লেনিন বলেছেন। নারী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই

BanglaBook.org

আজকের চেয়েও আধুনিক। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। সতীদাহ প্রথার বিলোপসাধন, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ বাতিল করার তাগিদ, নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এই সকল বিষয়ে অনেকেই কথা বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেটা করেছেন তা হলো নারীকে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উপর দাঁড় করিয়েছেন। 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে এবং বিভিন্ন ছোটগল্পে নারীর যে বেদনা ও নির্যাতনের চিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন তার আগে এমন করে আর কেউ লিখতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি শ্রেষ্ঠ নারীবাদী গল্প। একটি একান্নবর্তী পারিবারে একটি অনাত্মীয় বালিকার প্রতি নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সেই সংসারের মেজ বউ স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। যে সময়ে এটা লেখা সে সময় কোন স্ত্রী কর্তৃক স্বামীগৃহ ত্যাগের ঘটনা কল্পনাই করা যায় না। 'স্ত্রীর পত্রে'র মেজ বউয়ের সঙ্গে ইবসন-এর 'ডল্‌স হাউজের'র নোরা'র স্বামীগৃহ ত্যাগের তুলনা করা চলে। ইউরোপীয় সমাজে তখন গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন পরাধীন, সমাজটা সামন্তবাদী, নারী শৃঙ্খলিত। সেই সমাজে রবীন্দ্রনাথ উন্নততর গণতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে আসলেন এই গল্পের মধ্য দিয়ে।

এমনকি অনেক কম বয়সেই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে কবি নারীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন–

"এসো, ছেড়ে এসো সখী কুসুম শয়ন–
বাজুক কঠিন মাটি চরণ তলে"

পরিণত বয়সে 'মহুয়া' কাব্যে 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন–

"যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায় কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী"

নারী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও আধুনিক ও র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় যখন 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যে। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলছে–

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেই আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর

BanglaBook.org

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার তবে পাইবে পরিচয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের যুগে পুরুষের পক্ষে একাধিক নারী ভোগ বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নারীর পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করতেই হবে। তাই দেখি বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দের গুলিতে রোহিনীকে মরতে হয়। মহাবিদ্রোহিনী দেবী চৌধুরাণী জননেতৃত্বের পথ পরিহার করে তিন সতীনের সঙ্গে মিলে বাসন-কোসন মাজা ও স্বামী সেবা করার মধ্যেই নারী জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেলেন। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন 'প্রেম মহৎ কিন্তু ধর্ম মহত্তর। ধর্মের জন্য প্রেমকে সংহার করিব'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন ঠিক উল্টো কথাটি। প্রেমকে তিনি বড়ো করে তুলে ধরলেন। এইদিক থেকে 'চোখের বালি' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি মাইলফলক, যেখানে বিধবা নারী তথাকথিত সংযম রক্ষা না করে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেও আমরা এই পরকীয়া প্রেম দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম এনেছেন। যাকে স্বাভাবিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহৎ বলেও তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' এর নায়িকা দামিনী একটি অসাধারণ চরিত্র যেখানে রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন দামিনী শুধু মেয়ে মানুষ নয়, সে মানুষ। তার শরীর আছে, মনও আছে। সে তার যৌবনকে মিথ্যা কারণে নষ্ট হতে দিতে চায় না। তাই বিধবা দামিনী একজনকে ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আরেক পুরুষকে বিবাহ করেছিল। দামিনী প্রথাবিরুদ্ধ, দামিনী বিদ্রোহী। তার মধ্যে হিংসা নাই। এমন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার আরেকটি দ্বার উন্মোচন করেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আরও আধুনিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। মনের মিল না থাকলে স্ত্রী'র সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকে রবীন্দ্রনাথ 'আন্তরিক অসতীত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। *যোগাযোগ* উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কুমু বিক্রি হয়ে গেল দাসীর হাটে– যে হাটে মাছ মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়'। ইতিপূর্বে নারীর সবচেয়ে বড়ো গুণ হিসেবে দেখানো হতো মাতৃত্ব। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'ব্যক্তিত্ব'। কুমুদিনী'র মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যও খোয়ানো যায় না।' সেটা কী? নারীর

BanglaBook.org

ব্যাক্তিত্ব, তার আত্মমর্যাদা। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি ছোটোগল্পে অনিলা স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল। একান্নবর্তী পরিবারে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মেজ বউ গৃহ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু অনিলা কেন স্বামীগৃহ ত্যাগ করল? কেন তার প্রতিবেশী প্রেমাকাঙ্ক্ষী পুরুষকেও প্রত্যাখ্যান করল? কারন মনের মিল হয়নি। এসব দৃষ্টিভঙ্গি একবিংশ শতাব্দীতেও অনেক আধুনিক। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিতর্কিত ও ব্যতিক্রমী গল্প হলো 'ল্যাবরেটরি'। সেই গল্পের নায়িকা সোহিনী যে শারিরীক বিচারে সতী নয় তা খুব পরিষ্কার। কিন্তু সমস্ত গল্পের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাকেই সত্যিকারের সতী ও মহৎ হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

এই সকল গল্প উপন্যাস কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নারী প্রসঙ্গে যে দৃষ্টিভঙ্গি এনেছেন তা আজকের যুগেও আধুনিক এবং তা অধিকতর গণতান্ত্রিক চেতনার দাবি করে। বাঙালি সমাজ ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশাল। তিনি যুগ সৃষ্টি করেছেন। শুধু সাহিত্যকে নয়, সমাজকেও অনেকদূর অগ্রসর করে নিয়েছেন।

৩.

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য শুধু নয় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজে এবং রাজনীতিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তার আগে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল সাহিত্য প্রতিভা, তাঁরা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত। বাংলা সাহিত্যের এই সকল মহা দিকপালদের মধ্যে নজরুল ছিলেন ব্যতিক্রম, তিনি তাঁর কাব্যে ও রাজনীতিতে দেশজ মাটি থেকেই রস সংগ্রহ করেছিলেন।

কবি জীবনানন্দের ভাষায়, 'আধুনিক বাঙলাদেশে তিনি বাঙলার মাটির বিশেষ স্বায়ত্ত সন্তান ... বাঙলার এই মাটি থেকে জেগে, এ মৃত্তিকাকে ভালোবেসে আমাদের দেশের উনিশ শতকের ইতিহাস-প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়বাদী কবি নজরুল ইসলাম। ... নজরুলকেই সত্যিকারের দেশ ও দেশীয়দের বন্ধু কবি বলে জনসাধারণ চিনে নেবে। জন ও জনতার বন্ধু ও দেশপ্রেমিক কবি নজরুল।"

নজরুল ইসলামের আবির্ভাব যখন ঘটে তখন রবিকরোজ্জ্বল সাহিত্য অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করা অথবা রবীন্দ্র বলয়ের

BanglaBook.org

বাইরে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দুজন সাহিত্য প্রতিভা সত্যিকার অর্থেই রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে তাঁদের নিজস্ব স্বকীয় প্রতিভা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাব্যে নজরুল ইসলাম, কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র। আমরা এই গ্রন্থে নজরুল, শরৎচন্দ্র বা অন্য কারও সাহিত্যিক মূল্যায়ন ও নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করছি না। নজরুলের কবিতা ও গান রাজনীতি ও সমাজের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটাই আলোচ্য বিষয়।

নজরুলকে বলা হয় বিদ্রোহী কবি। লোকের মুখে মুখেই এইভাবে তাঁর পরিচিতি ঘটেছিল। 'বিদ্রোহী' নামে তাঁর একটা কবিতাও আছে। সম্ভবত বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত। কবিতা হিসেবেও অনবদ্য। তবে এই কবিতা যত না শিল্প নৈপুণ্যে বিস্ময়কর, ঠিক ততটা সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে আহ্বান বা আবেদন পাওয়া যায় না যা তাঁর পরবর্তীতে লিখিত একাধিক কবিতা ও গানে পাওয়া যায়।

নজরুল তাঁর বিপ্লবী কবিতা ও গান এবং অনেক গদ্য রচনার জন্য একদিকে যেমন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তেমনই সেই একই কারণে তাঁকে বারবার রাজরোষে পতিত হতে হয়েছে।

বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ও পরবর্তীতে কমিউনিস্ট সুধী প্রধাণের কাছ থেকে জানা যায়, সেদিনের বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের কাছে নজরুল ও শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী চেতনায় ভাস্বর শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি ছিল একটি অসাধারণ সাহসী রচনা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা সহ্য করতে পারেনি। বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। শরৎচন্দ্র আশা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। না করার পেছনে যে যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন সেটা যথাযথ বলে মনে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই শরৎচন্দ্র মর্মাহত হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের একটি বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথেরও একটি বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। তা হলো 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদ। আর নজরুলের পাঁচটি গ্রন্থ নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। 'যুগবাণী', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান', 'প্রলয় শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু'। এছাড়াও নজরুলের আরও কয়েকটি বই 'অগ্নিবীণা', 'ফণি-মনসা', 'সর্বহারা' ও 'রুদ্রমঙ্গল' বাজেয়াপ্ত করার কথা উঠেছিল বৃটিশ রাজের প্রশাসনিক মহলে। শুধুমাত্র কবিতা লেখার জন্য নজরুল জেল খেটেছেন দুবার। হুগলি জেলে তিনি জেল

BanglaBook.org

প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে ৩৯দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালোবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে অনশন প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সাহিত্যে নজরুলের এখন দারুণ প্রয়োজন রয়েছে।" নজরুল যখন জেল খাটছেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

তখনকার অনেক সাহিত্যিক এটাকে ভালো চোখে দেখেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে তারা নালিশ করেছিলেন এই বলে যে, নজরুলের কবিতা কোনো কবিতাই নয়, বরং তাতে রয়েছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কাব্যে অশির ঝনঝনা থাকতে পারবে না এও তোমাদের অদ্ভুত আবদার বটে।" তবে অস্ত্রের ঝনঝনানি সমর্থন করেও রবীন্দ্রনাথ সেদিনের তরুণ কবি নজরুলকে কিছু সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তিনি মহৎ সৃষ্টি সাধনা করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাছতে' নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু নজরুল তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র পরিত্যাগ করেননি। বরং তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল লিখলেন,

"গুরু কন, 'তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাছা'

... ...

বন্ধুগো, আর বলিতে পারি না, বড়ো বিষজ্বালা এই বুকে।
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড়ো দুঃখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহার আছ সুখে!

স্বভাগতভাবেই নজরুল ছিলেন বিপ্লবী। করাচির সেনানিবাসে থাকার সময় তিনি রাশিয়ায় লাল ফৌজের বিজয় বার্তা শুনে উল্লসিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তিনি একই সঙ্গে ভাড়া করা বাসায় থাকতেন। সেখানেই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। তখন তাঁর যুবক বয়স। এই কবিতার প্রথম পাঠক বা শ্রোতা ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। মুজফ্ফর আহমদের সংস্পর্শে থাকার কারণে নজরুল কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন যার ছাপ পাওয়া যায় পরবর্তীতে তাঁর একাধিক রচনায়।

BanglaBook.org

তবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলার লোকও তিনি ছিলেন না। তাছাড়া মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্ফর আহমদ গ্রেফতার হয়ে গেলে এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উপরন্তু নজরুলের মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয়েরই সংমিশ্র পাওয়া যায়। বিশের দশকে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও গোপন কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পরামর্শে 'শ্রমিক ও কৃষক পার্টি' গঠিত হয়। কবি নজরুল প্রথম দিকে তার নেতৃস্থানীয় পদেও ছিলেন। তবে তিরিশের দশকে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আর সরাসরি রাজনীতি করেননি। বিশের দশকে কবি নজরুর ইসলাম সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। যেমন নবযুগ (মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন), যুগবাণী, ধুমকেতু, লাঙল, গণবাণী। এই সকল পত্রিকার কোন কোন সংখ্যা বৃটিশ বিরোধী লেখার জন্য বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। 'ধুমকেতু' পত্রিকায় ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবরের সংখ্যায় নজরুল লিখেছিলেন, "সর্বপ্রথম 'ধুমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে সকল নিয়ম-কানুন-বাধন-শৃঙ্খল-মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।" স্পষ্টতই বোঝা যায় এই লেখার কী প্রচণ্ড তেজ ছিল। তখনও পর্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেসের কোন নেতা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে সাহস পাননি (অবশ্য ১৯২১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে মওলানা হযরত মোহানী সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং সেজন্য গান্ধী কর্তৃক প্রকাশ্যে তিরস্কৃত হয়েছিলেন)। 'ধুমকেতু' ছিল সেই সময় সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ধুমকেতু'কে আশীর্বাদ জানিয়ে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তা 'ধুমকেতু'র প্রতি সংখ্যায় ছাপা হতো। পুলিশের ধারণা ছিল 'ধুমকেতু' হচ্ছে ছদ্মনামে কমিউনিস্ট প্রকাশনা। অবশ্য তা সঠিক নয়। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় এই পত্রিকায় লিখতেন। অবশ্য কোনো পত্রিকাই অর্থাভাবে অথবা মালিকের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে (নবযুগের মালিক ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক) বেশি দিন টেকেনি। লাঙল পত্রিকায় শুধু বৃটিশ বিরোধী নয়, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ বিরোধী চিন্তাধারারও প্রকাশ পাওয়া যায়। লাঙলের প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সর্বহারা'। লাঙল পত্রিকায় কার্ল মার্ক্সের জীবনী ও গোর্কির 'মা' উপন্যাসের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে ছাপা

BanglaBook.org

হয়েছিল। এইভাবেই কমিউনিস্ট ভাবধারা বাংলাদেশে প্রচারিত হতে থাকে যেখানে কবি নজরুলের অবদান অসামান্য।

'লাঙল' পত্রিকায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ অনেক লিখেছেন যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার আবেদন ছিল। এই পত্রিকায় মুজফ্‌ফর আহমদ কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লাঙল পত্রিকাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছিলেন। লাঙলের আগে গণবাণী নামে যে পত্রিকাটি 'শ্রমিক ও কৃষক দলে'র মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হতো (১৯২৬ সালের দিকে) তাতেই প্রথম কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন সৌমেন ঠাকুর। অনুবাদটি মুজফ্‌ফর আহমদের পছন্দ হযনি। তিনি নতুন করে অনুবাদ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন কবি নজরুল এবং প্রথম যুগের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা ও মুজফ্‌ফর আহমদের সহযোদ্ধা কমরেড আব্দুল হালিমের উপর। অবশ্য 'গণবাণী' প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার কারণে সেই অনুবাদ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গণবাণীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গানের অনুবাদ। এটিই ছিল প্রথম বঙ্গানুবাদ যা করেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। অবশ্য এখন বাংলাদেশে যে গানটি গাওয়া হয় সেটি কিন্তু ভিন্ন। সেটির অনুবাদ করেছিলেন অমর শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। 'গণবাণী'তে নজরুলের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল- 'মন্দির-মসজিদ'। এটি ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ যা সেই সময়ের রাজনীতিতে এবং মানুষের চিন্তাধারায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

নজরুল বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবিতা ও গানের জন্য। প্রথম কারাবাসের সময় তিনি লিখলেন

"এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরার ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।"

তার আরেকটি গান এখনও খুবই জনপ্রিয়

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!

BanglaBook.org

... ...
লাথি মার্ ভাঙ্রে তালা!
যত সব বন্দী-শালায়-
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি ॥

বাংলা সাহিত্যে এমন বিপ্লবী গান বা কবিতা আর দ্বিতীয়টি নাই। বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। নজরুলের এই ধরণের আরও অনেক গান ও কবিতা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামে উদ্দীপনা ও শক্তি জোগায়। জীবদ্দশাতেই নজরুল শ্রমিক কৃষকের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে তাঁকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হতো। এক সংবর্ধনা সভায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন "তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছে হত।" সেই সভার সভাপতি বিজ্ঞানী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন "আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবি বংশধরেরা একেকটি অতি মানুষে পরিণত হইবে।"

আবার অপরদিকে রাজনীতিতে রক্ষণশীল এবং গোড়া মুসলমান এবং হিন্দুরা নজরুলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করত। 'শনিবারের চিঠি' নামে তখন একটি রক্ষণশীল পত্রিকা ছিল যা নজরুল সম্পর্কে নানা ধরণের কটুক্তি করত।

কবি নজরুল ইসলামই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাম্যবাদী কবি যদিও মার্ক্সবাদ সম্পর্কে কোন গভীর অনুশীলন তাঁর ছিল না। তবে বহু রচনায় তিনি বলশেভিক বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন, কার্ল মার্ক্সকে বলেছেন ঋষি, প্রশংসা করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কির, বন্ধুত্ব হয়েছিল কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। তিনি রচনা করেছেন শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামের ও মুক্তির গান ও কবিতা যেগুলি এখনো মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তিনি সাম্যবাদী কবিতায় লিখলেন,

"আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি খুন
লাল লাল হয়ে উঠিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ"

নারী পুরুষের সমতার কথা জোরের সঙ্গে তিনি উল্লেখ করলেন–

"সাম্যের গান গাই
আমার চোক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই"

BanglaBook.org

ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, বারাঙ্গনা, নারী, কুলি মজুর ইত্যাদি কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নতুন। এসকল কবিতায় রয়েছে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি দরদ এবং একই সঙ্গে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘৃণা। আরও রয়েছে বিদ্রোহের ডাক।

অনেকে নজরুলকে ইংরেজ কবি শেলীর সঙ্গে তুলনা করেন। যেমন ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেত্রী কণক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

"কবি নজরুলের মধ্যে ছিল সেই বাল্মীকির যন্ত্রণা, ছিল শেলীর 'Prometheus Un-bound' এর শিকল ভাঙার প্রেরণা। শেলীর মতো তাঁর কবিসত্তা তীব্র যন্ত্রণায় যেন বলত I fall upon the thorns of life! I bleed."

কিন্তু নজরুল শেলীর সেই যন্ত্রণাহত আকাশচারী বিহঙ্গকে মাটির পৃথিবীর নীড়ে নিয়ে এসেছেন, যেখানে

'হাট হ'তে বাবা ফেরে নাই আর চাল বাড়ন্ত সেথা,
হাড়ির পানিতে টগবগ করে ফোটে জননীর ব্যাথা'।

নজরুলের গান, কবিতা, লেখনী ও প্রত্যক্ষ রাজনীতির আরেকটি মহান বৈশিষ্ট্য হলো অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা। বৃটিশ আমলে সেই যুগে এই অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা যতটা জরুরি ছিল এখনো তা প্রায় একইভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে নজরুলের সাহিত্য ও কর্মজীবন আজও আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি ও প্রাসঙ্গিক। তিনি পাকিস্তান ধারণার চরম বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তানকে বলতেন 'ফাকিস্তান'। ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভীদের ঠাট্টা করে বলতেন 'মৌ-লোভী'। বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আকরম খাঁ'র নাম দিয়েছিলেন 'আক্রমণ খাঁ'। তিনি সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে যে ধরণের অমানবিক বিষয় রয়েছে তাকে তিনি কখনও ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় অথবা কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সেজন্য প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানরা তাঁকে কাফের, শয়তান ইত্যাদি বলেও গালি দিয়েছে। আবার ঢাকা শহরে একবার কট্টর প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের দ্বারা দৈহিকভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন–

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া।"

অথবা

"জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি

BanglaBook.org

আপনার পেট ভরায়, তখত চায় এরা শয়তানী।

... ...

ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ

এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদের মেরে কর সব শেষ।"

'মন্দির-মসজিদ' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগার, মসজিদের জিন্দাখানা, গির্জার Goal-বন্দি। মোল্লা, পুরুত, পাদরী, ভিক্ষু জেল ওয়ার্ডারের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে।"

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নজরুল কখনও পুরোপুরি বস্তুবাদী ছিলেন না। তিনি একই সঙ্গে ইসলামি গান ও শ্যামা সংগীত রচনা করেছেন। উদাহারণ হিসেবে তাঁর দুইটি কবিতার দুইটি পৃথক পৃথক লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন তিনি লিখেছেন–

দাড়িমুখে সারিগান 'লা-শরীক আল্লাহ'

আবার তিনিই লিখছেন–

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'র দুইটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"ধরি বাসকীর ফণা জাপটি

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাঁপটি।"

একই কবিতার ক্যানভাসে হিন্দু মুসলমান পৌরাণিক চিত্রকল্পের এমন চমৎকার প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সম্ভবত বিশ্ব সাহিত্যেও অদ্বিতীয়।

নজরুল ইসলাম প্রধানত বিদ্রোহী কবি। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা, শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামের চেতনা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী চেতনা বিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকে একটা নতুন বৈপ্লবিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল। নজরুল যুগের সৃষ্টি আবার তিনি নিজেও নতুন যুগ সৃষ্টি করেছেন। নজরুলের বিদ্রোহের ডাক, সাম্যবাদী চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এত বৎসর পরেও এখনো বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

BanglaBook.org

৪.

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এর আবির্ভাব ঘটে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের এবং পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর পুরোটা জুড়েই সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। তাঁর আকর্ষণীয় ভাষা, চরিত্র সৃষ্টি ও সংলাপের অসাধারণ দক্ষতার জন্য তিনি ছিলেন অতি উঁচু মাপের একজন ঔপন্যাসিক। কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। আসল কথা এই যে তিনি তাঁর উপন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ ও কাহিনি বিস্তারের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজকে বিশেষ করে পল্লী সমাজকে দারুণভাবে আঘাত করেছেন। পণ প্রথা, বিধবা নারীর অপমানকর জীবন ধারণ, পুরুষতান্ত্রিকতা, নানা ধরণের কুসংস্কার ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং সেদিনকার সমাজে শরৎচন্দ্রের রচনাসমূহ সমাজকে যথেষ্ট নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিল যার কিছু কিছু ইতিবাচক ফলও পাওয়া গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র সাহিত্য প্রতিভার জন্য নয় তিনি যে প্রগতির পতাকা ধারণ করেছিলেন এবং সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখেছিলেন সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান। তিনি সৃষ্টি করেছেন অমানবিক সমাজের দ্বারা নিপীড়িত মানব মানবীর অশ্রুসিক্ত ট্র্যাজেডি। তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য দিয়ে তিনি কয়েকটি নারী চরিত্রকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখে গেছেন। অন্নদা দিদি, রাজলক্ষী, অভয়া, কমললতা, কিরণময়ী, সাবিত্রী, জ্ঞানদা, সন্ধ্যা-তারা সবাই সমাজের নিচের তলার নিপীড়িত নারী। পল্লী সমাজের রমা জমিদার হলেও নিষ্ঠুর সামাজিক বিধানের কারনে অপমানিত হয়েছেন পরাজিত হয়েছেন পুরুষতান্ত্রিকতার কাছে। হিন্দু পল্লীসমাজ যে কত নির্দয়, হৃদয়হীন এবং কসাই হতে পারে 'অরক্ষণীয়া' তারই একটি মর্মস্পর্শী কাহিনি। শরৎচন্দ্র সমাজের কদর্যতার ছবি এঁকেছেন। কাহিনি বিস্তার ও সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে অশ্রুসিক্ত করেছেন এবং নিজেও প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে কোথাও নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা যায় না।

শরৎচন্দ্র জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। হিন্দু সমাজের ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপরটি নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, নিন্দা করেছেন। শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায়, দেশের বাইরে রেঙ্গুনের সেই আশ্চর্য হোটেলে জাত পাতের

BanglaBook.org

কোন ভেদাভেদ নাই, তেমনি স্টিমারের ডেকেও খাওয়া-ছোঁয়া ইত্যাদি ব্যাপারে কোন ভেদাভেদ পাওয়া যায় না। স্টীমারের ডেকে নন্দ মিস্ত্রী'র জাত নিয়ে গৌরব করাকে তিনি একটি হাসির খোরাকে পরিণত করেছেন। এভাবে তিনি দেখাচ্ছেন হিন্দু সমাজে বিশেষ করে পল্লীসমাজে যে ধরণের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আছে তার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। সামাজিক দিক থেকে এটি ছিল শরৎচন্দ্রের একটি বিরাট ইতিবাচক অবদান। শরৎচন্দ্র সে সকল নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই তখনকার সামাজিক দৃষ্টিতে পাপী ও ঘৃণ্য। শরৎচন্দ্র তাদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন দুর্লভ মহত্ত্ব। এটাই শরৎচন্দ্রকে কেবল মহৎ করে তোলেনি, তিনি সমাজের ক্ষেত্রেও নতুন মানবিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীকান্ত ও অন্যান্য উপন্যাস পাঠে দেখা যায়, সমাজ অননুমোদিত তথাকথিত নিষিদ্ধ প্রেমে শরৎচন্দ্রের সমর্থন অকুণ্ঠ। 'প্রেমের ক্ষেত্রে দৈহিক সুচিতার প্রশ্নের চেয়ে মানসিক নিষ্ঠার মূল্য ছিল তাঁর কাছে অধিক' (নাজমা জেসমিন চৌধুরী– বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি)।

শরৎচন্দ্র লেখনীর মাধ্যমে বিরাট প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে গেছেন। অবশ্য সমাজে সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল।

শরৎচন্দ্র সমাজকে আঘাত করেছেন নীতির দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে নয় (একমাত্র ব্যতিক্রম 'মহেশ' গল্পটি)। তাঁর অনেক রচনায় দৈন্যের হাহাকার আছে কিন্তু দারিদ্রের কারণও উল্লেখ নাই, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামও নাই। পল্লী সমাজে কৃষক কীভাবে বঞ্চিত হয় তার বর্ণনা আছে। কিন্তু সংগঠিত কৃষকের লড়াই নাই। কৃষকের পক্ষে লড়াই করছেন আরেক জমিদার রমেশ। সেজন্য তিনি জেলও খাটছেন। এই রমেশ আরেক জমিদার কন্যা রমাকে ভালোবেসেও কাছে টানতে পারছেন না। জমিদার রমেশও পরাজিত হয় সমাজের কাছে। জমিদার কন্যা (নিজেও জমিদার) রমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় দূর কাশিতে।

নারী প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সোহিনী, অনিলা, দামিনীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন শরৎচন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। শরৎচন্দ্রের কাছে নারীর

BanglaBook.org

মাতৃত্বের গুণটি সচচেয়ে বড়ো। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে মাতৃত্বের চেয়েও ব্যক্তিত্ব অনেক বড়ো।

অবশ্য শরৎচন্দ্রও কয়েকটি বিদ্রোহী নারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। অভয়া, কিরণময়ী, কমল। রবীন্দ্রনাথের দামিনী প্রেমাস্পদ পরিবর্তন করে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা শরৎচন্দ্রের অভয়াও দ্বিতীয় বিবাহ করেছিল। অভয়াও স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত ও বিতাড়িত। সে বাধ্য হয়েছিল আরেক পুরুষের সঙ্গে বসবাস করতে। সেটা দ্বিতীয় বিবাহ নাকি আজকের যুগের মত 'লিভ টুগেদার' তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে শরৎচন্দ্র যেভাবে অঙ্কন করেছেন তাতে আমাদের সহানুভূতি অভয়ার দিকেই যায়। অভয়া অতি সাধারণ মেয়ে, সেও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে বলেছিল 'একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল— সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনের একমাত্র সত্য আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা?' এভাবে আরও বহু সংলাপের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র হিন্দু শাস্ত্র, হিন্দু সমাজের রীতি, তথাকথিত 'সতী ধর্ম' ইত্যাদিকে যেভাবে আঘাত করেছেন ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে কোনো লেখক অথবা কোনো সমাজ সংস্কারক বা রাজনীতিবিদ সেভাবে করতে পারেননি।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে বিধবা নারী কিরণময়ী পরপুরুষ উপেনের প্রেমে পড়ে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে রাগের মাথায় সে উপেনের ছোটোভাইকে নিয়ে জাহাজে করে বার্মায় যায় এবং সেখানে বেশ কিছুদিন বসবাস করে। এই কিরণময়ীও এক বিদ্রোহী নারী। সমাজের চোখে সাধারণভাবে সে চরিত্রহীন। কিন্তু উপন্যাস পাঠে আমাদের সহানুভূতি কিরণময়ী'র প্রতিই গিয়ে পড়ে। আমরা তার জন্য মর্মবেদনা অনুভব করি। এভাবে শরৎচন্দ্র যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন তা সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট পদক্ষেপ ছিল।

শরৎচন্দ্রের এক অসাধারণ সৃষ্টি হচ্ছে 'শেষ প্রশ্নে'র কমল চরিত্রটি। বিধবা কমল দুইবার প্রেমাস্পদ পরিবর্তন করে। বিবাহের মন্ত্রে সে বিশ্বাসী নয়। তর্কমুখর অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কমল যুক্তি দিয়ে সকল সনাতনী বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' ও কমল চরিত্র শরৎচন্দ্রের এক অনবদ্য সৃষ্টি এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মহত্তম সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহৎ উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের মুসলিম প্রীতি বেশ আলোচনার বিষয় ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে বলেছিলেন 'আপনার মুসলিম প্রীতি বেশ প্রসিদ্ধ'।

BanglaBook.org

শরৎচন্দ্র আগাগোড়া অসাম্প্রদায়িক। 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী বলছেন, "... শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয়- শুধু আমার বাংলাদেশের কবি।"

অভয়ার মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র বলছেন, মুসলিম সমাজ হিন্দু সমাজের চেয়ে অনেক বেশি উদার। অভয়া মুসলিম সমাজের যেভাবে প্রশংসা করেছে সেটা তো আসলে শরৎচন্দ্রেরই কথা। শ্রীকান্তের দ্বিতীয় পর্বে তিনি হিন্দু মুসলমানের প্রেম দেখিয়েছেন। গহর ও কমললতার সম্পর্কটা পরিণতি লাভ করতে পারেনি। কারণ সেদিনের বাস্তবতায় সেটি সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যায় শরৎচন্দ্র এই প্রেমকে অশ্রদ্ধার সঙ্গে মোটেই দেখেননি।

'নারীর মূল্য' নামে শরৎচন্দ্রের একটি রচনা আছে। এটি কেবল সাহিত্যিক রচনা নয় একে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা বলেও উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন মূল্যবান গবেষণামূলক রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। শরৎচন্দ্রের আগে অন্য কেউ নারী সংক্রান্ত বিষয়ে এত গভীর আলোচনা করেননি। এই রচনায় তিনি পুরুষতান্ত্রিকতাকে কঠোরভাবে আঘাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ধর্মই নারীকে অধঃস্তনের জায়গায় নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টান্ত টেনে শরৎচন্দ্র বড়ো দুঃখের সঙ্গে বলেছেন 'ঈশ্বর নারীকে পুরুষের জন্যই সৃজন করিয়াছেন, পুরুষকে নারীর জন্য সৃজন করেন নাই।' বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্র এই বিকৃত ধারণাকেই খণ্ডন করেছেন। নারী নির্যাতনের সঙ্গে ধর্মের সম্পকর্কে তিনি নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"ভগবান শঙ্করাচার্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, roof of all evil." স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, বিধবার প্রতি নির্যাতন, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর যে বক্তব্য তা আজকের যুগেও আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক। দুই একটা লাইন উদ্ধৃত করা যাক।

"এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ ঘরের মধ্যেই আরও একশত স্ত্রী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলেও তাহাকে দেবী হইতেই হইবে, এই ব্যবস্থা এ দেশের সমস্ত নারী জাতিকে যে কত হীন, কত অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।"

BanglaBook.org

আরেক জায়গায় তিনি লিখছেন,

"নারীর মূল্য কি? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনী, অর্থাৎ তাহাকে লইয়া কী পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে এবং কী পরিমাণে তিনি রূপসী।"

শরৎচন্দ্রের এই সকল বক্তব্য এবং বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যে বার্তা তিনি বহন করে এনেছিলেন তা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজে নতুন চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল।

'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি বৃটিশ সরকার বেআইনী ঘোষণা করেছিল। এই উপন্যাসে তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র বিপ্লবীদের মহান করে তুলেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সশস্ত্র বিপ্লবীদের যাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলা হয় তাদেরও ভূমিকা ছিল বিরাট। সূর্যসেন, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয় তাদের পথ কিন্তু নির্ভুল ছিল না। একদিকে গান্ধীবাদী অহিংস নীতি যেমন ভ্রান্ত, অপরদিকে জনগনকে সংগঠিত করার পরিবর্তে কয়েকজন বীরের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম সঠিক পথ নয়। সেইদিক দিয়ে দেখলে 'পথের দাবী'র সব্যসাচী সশস্ত্র বিপ্লবী যুবকের সশস্ত্র কার্যকলাপের উপরই নির্ভরশীল, জনগণ নয়। পথের দাবির অসাধারণ তাৎপর্য স্বীকার করেও এই সমালোচনাটুকু করতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে তিন জন মহান সাহিত্যিক তিনটি রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন- বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'। সাহিত্য মূল্যের দিক দিয়েও এর মধ্যে 'পথের দাবী' শ্রেষ্ঠ। যদিও 'চার অধ্যায়ে'র ভাষা খুবই কাব্যময় ও আকর্ষণীয়। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত ইংরেজ নয়, প্রতিবেশী মুসলমানেকেই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 'চার অধ্যায়ে' রবীন্দ্রনাথ সশস্ত্র বিপ্লবীদের চরিত্রকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে অঙ্কন করেছেন যেন তারা মানবতাবিহীন নিষ্ঠুর যন্ত্র শামিল। অন্যদিকে 'পথের দাবী' সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাঠককে উজ্জীবিত করে। তাই যেকোনো বিচারে এই তিন গ্রন্থের মধ্যে 'পথের দাবী'ই শ্রেষ্ঠ।

'পথের দাবী' ছাড়াও বিভিন্ন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র উন্মোচন করেছেন। যেমন শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্বে সন্ন্যাসী ব্রজানন্দ "সোনার মাটি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে এমন শুষ্ক রিক্ত হইয়া উঠিল, কেমন

BanglaBook.org

করিয়া দেশের সম্পদ বিদেশীর হাত দিয়া ধীরে ধীরে বিদেশে চলিয়া গেল, কেমন করিয়া মাতৃভূমির সমস্ত মেদ-মজ্জা-রক্ত বিদেশীরা শোষণ করিয়া লইল" তার বিশদ ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

শরৎচন্দ্র নিজেও কংগ্রেস করতেন, যদিও কোন বড়ো মাপের নেতা ছিলেন না। গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও গান্ধীর অহিংস মতবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর গান্ধী বিরোধী মতবাদ বহুল প্রচারিত। গান্ধী প্রবর্তিত চরকা আন্দোলনেরও তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। গান্ধী সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য সঠিক হলেও কিছুটা চমকে দেওয়ার মতো ছিল, "তাঁর (গান্ধীর) আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনীকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতন্ত্রীদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।"

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পে জমিদারের অত্যাচার, মুসলমান ভাগচাষী গফুরের নির্মম দারিদ্রের এক করুণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পটি দরিদ্র কৃষকের প্রতি মর্মবেদনা ও জমিদারের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করে। রাগের মাথায় গফুর তার প্রিয় গরু মহেশকে সজোরে আঘাত করে হত্যা করেছিল। এই গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের কিছুটা মিল পাওয়া যায়। 'শাস্তি' গল্পে ক্ষুধার্ত দিনমজুর রাগের মাথায় নিজের স্ত্রীকে খুন করেছিল। উভয় গল্পে জমিদারের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বর্ণনা আছে। কিন্তু নাই শ্রেণী সংগ্রাম।

মহেশ গল্পের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে জমিদার হিন্দু আর তার অত্যাচারের শিকার যে প্রজা সে মুসলমান। হিন্দু মুসলমানের প্রসঙ্গটিও এখানে সামান্য হলেও এসেছে। মুসলমান বলেই গফুরের দশ বছরের মেয়ে আমিনা ভিড় ও কাড়াকাড়ির মধ্যে জল আনতে পারেনি। শরৎচন্দ্র লিখছেন, "বিশেষত মুসলমান বলিয়া এই ছোটো মেয়েটা কাছেই ঘেঁষিতে পারেনি।" আরেক জায়গায় দেখা যায়, গরুর খাবারের জন্য যখন গফুর জমিদারের দালাল ব্রাহ্মণ তর্করত্নের কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে "ধপ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, তর্করত্ন তীরবত দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ-মর, ছুঁয়ে ফেলবি নাকি?" ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র হিন্দু ধর্মের ছোঁয়াছুঁয়ির মতো কুৎসিত ব্যাপারটিকে উন্মোচিত করেছেন। গল্পের মধ্যে এক জায়গায় দেখি ধনীর ঘরে সামান্য গো-খাদ্য চেয়ে তা না পেয়ে আক্ষেপ করে গফুর বলেছিল, "ওদের অনেক

BanglaBook.org

আছে তবু দেয় না।' এই বাক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমির একটি ছত্রের বেশ মিল পাওয়া যায়

"এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

উনবিংশ শতাব্দীতে মীর মশাররফ হোসেন এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে সামন্ত বিরোধী চেতানাকে এক ধাপ অগ্রসর করে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়ই জমিদারের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বর্ণনা তুলে ধরে সেই চেতনাকে আরও অগ্রসর করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই সংগ্রামের ডাক দেননি যে ডাক শুনতে পাই নজরুলের কণ্ঠে অথবা পরবর্তীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ও সুকান্তের কবিতায়।

৫.

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির দিকেই সেই হিন্দু নারীদের মধ্যেই শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছিল যদিও খুব সীমিত আকারে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত মুসলমান নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল না। অভিজাত পরিবারে মুসলিম বালিকাদের কিছু ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হলেও তারা বাংলা পর্যন্ত পড়তে পারত না। মুসলমান মেয়েদের জন্য স্কুল বলে কিছু ছিল না। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীতে কোলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে কিছু হিন্দু ঘরের মেয়েরাই পড়ত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধে এক মহিয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটে– বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি প্রথম মুসলমান মেয়েদের জন্য শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯১১ সালে কোলকাতায় প্রথম মুসলমান বালিকাদের জন্য স্কুল স্থাপন করেন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। তবে স্কুলের জন্য ছাত্রী জোগাড় করার কাজটি সহজ ছিল না। নানা ধরণের সামাজিক প্রতিরোধ মোকাবেলা করে, বিভিন্ন ধরণের কুৎসাকে উপেক্ষা করে বেগম রোকেয়া একক উদ্যোগে যে স্কুল প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইতিহাসে তার অবদান অসামান্য।

বেগম রোকায়ার ভূমিকা আরও বেশি। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় এমন কি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আগেও পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কলম

BanglaBook.org

ধরেছিলেন। বেগম রোকেয়াই বাংলা ভাষায় প্রথম নারীবাদী লেখিকা। নারীবাদী সাহিত্য এর আগে ইউরোপ, আমেরিকায় রচিত হয়েছিল। বেগম রোকেয়া সম্ভবত সে সম্পর্কে জানতেন না। পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের দাবির সঙ্গে আমাদের দেশের তখনকার নারী প্রশ্নগুলোর কোনো তুলনাই চলে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ আমেরিকায় লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান, নারীর ভোটাধিকার, নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ও পরে গর্ভপাত করার অধিকার নারী আন্দোলনের দাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে যে যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল সেই সময়ে ইউরোপীয় আন্দোলনের এই সকল দাবি কল্পনাও করা যায় না। তবে এখানে উল্লেখ্য, ইউরোপে ও আমেরিকায় ১৯১৭ সালের মহান রুশ বিপ্লবের আগে কোথাও নারীর ভোটাধিকার ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারীকে ভোটাধিকার দিয়েছিল। বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না (আমাদের দেশে মুসলিম সমাজে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকলেও তা কখনও কর্যকরি ছিল না। তথাকথিত অভিজাত মুসলিম পরিবারে বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বিবাহকে লজ্জার বিষয় মনে করা হতো। অবশ্য হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই পুরুষের জন্য একই সঙ্গে একাধিক বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না)। ইউরোপে সেই সময়েও নারীকে অনেকটা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হতো। গলসওয়ার্দীর 'ফোরসাইট সাগা', বার্নার্ড শ ও ইবসনের বিভিন্ন রচনা পড়লে তা বোঝা যায়। এমনকি মার্ক্সের সমসাময়িক নৈরাজ্যবাদের জনক ফ্রান্সের প্রুধো কতকগুলো কারণে (যেমন অবাধ্যতা) স্বামী স্ত্রীকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তাহলে ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যুগেও নারী সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যে কত পশ্চাৎপদ ছিল তা বোঝা যায়। আর আমরা তো বিংশ শতাব্দীতে এসেও তার চেয়েও অনেক পেছনে ছিলাম।

বাস্তববাদী বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিয়ে সংগ্রাম যেমন করেছেন তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে লেখনীর মাধ্যমে কঠোর সমালোচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য ইউরোপের মতো নারীর ভোটাধিকার (তখনকার পরাধীন দেশে কারোরই ভোটাধিকার ছিল না), বিবাহ বিচ্ছেদ ও গর্ভপাতের অধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গ ভুলেও উচ্চারণ করেননি। আবার অনেক আধুনিক নারীবাদীর মতো তিনি পুরুষবিদ্বেষও

BanglaBook.org

প্রচার করেননি। তিনি প্রধানত জোর দিয়েছেন নারী শিক্ষা উপর। তিনি মনে করতেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উপার্জন ক্ষমতা অর্জন করা দ্বারা নারী পুরুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। হ্যাঁ, পুরুষের দাসত্ব, পুরুষের প্রভুত্ব ইত্যাদি শব্দগুলি তিনি বহুবার উচ্চারণ করেছেন যা তাঁর আগে ভারতের কোনো সাহিত্যে পাওয়া যায় না। বেগম রোকেয়াই প্রথম নারী প্রশ্নে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন যার প্রায় বিশ বছর পর একই কথা শরৎচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে তুলে ধরেছিলেন।

রংপুরের পেয়ারাবন্দের এক রক্ষণশীল জমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ তাঁর ছিল না। পর্দা প্রথা ছিল কঠোর। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। ঐ রকম পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা অর্জন করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। ষোলো বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় চল্লিশোর্ধ এক পুরুষের সঙ্গে। বিহারের ভগলপুরের অবাঙালি বিপত্নীক রাজভক্ত আমলা খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক কন্যা সন্তানও ছিল। রোকেয়া বিধবা হন ১৯০৯ সালে। তাঁর স্বামী তাঁর জন্য যে অর্থ রেখে গিয়েছিলেন তা দিয়েই তিনি স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর পর স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্কুলের নামটির সঙ্গে তাঁর স্বামীর নাম জড়িত রয়েছে। স্বামীর জীবিত কালেই বেগম রোকেয়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি করেছেন যার প্রায় সবগুলোই নারীবাদী রচনা। বেগম রোকেয়ার মোট পাঁচটি গ্রন্থ আছে। দুইটি রচনা সংকলন, একটি উপন্যাস, 'Sultana's Dream' নামে ইংরেজিতে লেখা রূপকধর্মী ব্যাঙ্গাত্মক রসাত্মক একটি নারীবাদী গ্রন্থ। সবশেষে লিখেছিলেন ১৯৩১ সালে মৃত্যুর এক বছর আগে 'অবরোধবাসিনী' নামে একটি গ্রন্থ যেখানে ৪৭টি নকশা ধরণের রচনা আছে। নারীর অবরোধ জীবনের মর্মান্তিক কাহিনি যার প্রত্যেকটি সত্য বলে রোকেয়া দাবি করেছেন। রোকেয়ার লেখায় যুক্তি আছে, ধার আছে, স্যাটায়ার আছে। সাহিত্য হিসেবেও উন্নত মানের। তাঁর একটি রচনা (মতিচুরের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) 'স্ত্রী জাতির অবনতি' সেই সময়ে দারুণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। তা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম সমাজপতিদের দারুণ আক্রমণের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এটি প্রথমে ছাপা হয়েছিল ১৯০৩ সালে গিরিশচন্দ্র সম্পাদিত মাসিক 'মহিলা' পত্রিকায় 'অলংকার না Badge of Slavery' নামে। বেগম রোকেয়া পরবর্তীতে কৌশলগত কারণে এবং

BanglaBook.org

স্কুলটিকে রক্ষা করার স্বার্থে কিছু কিছু আপোষ করেছিলেন। সেই আপোষেরই একটি উদাহরণ হলো পরবর্তী সংস্করণে উক্ত লেখার কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরিত্যক্ত অংশ থেকে কিছু উদ্ধৃত করা যাক

"আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছে, অমনই ধর্ম্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।

... ...

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলোকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

... ...

এই ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

... ...

এখন আমাদের আর ধর্ম্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য উচিৎ নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ- সতীদাহ।

... ...

ধর্ম্ম, শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভূত্ব করিতেছেন।"

বেগম রোকেয়া বিভিন্ন লেখায় নারী জীবনকে দাসতুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। 'স্বামী' কথাটাতেই তাঁর আপত্তি ছিল কারণ তা প্রভূত্বের নিদর্শন করে। তিনি বলেছেন, "তাহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের স্বামী হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশ তাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।" অবশ্য কোনো কোনো রচনায় বেগম রোকেয়া ইসলাম ধর্মের প্রশংসা করেছেন। ইসলাম ধর্মে যে নারীকে শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেকথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পর্দপপ্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন এবং নিজেও পর্দা পালন করতেন। তবে পর্দার নামে কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি যা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে রয়েছে তার তীব্র সমালোচনা ও বাতিল করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর পাঠকদেরকে যথাযথ ধর্ম পালনের জন্য আবেদন রেখেছিলেন। এটা কৌশলগত কারণে নাকি নিজস্ব উপলব্ধিগত কারণে তা বলা কঠিন। তবে বেগম রোকেয়া যে নারী মুক্তির

BanglaBook.org

পথ প্রদর্শনই শুধু করেননি, যুক্তিবাদী আলোচনার ধারারও উন্মোচন করেছেন তা সেদিনের সমাজে ছিল নতুন। এই সাহসী, যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক নারী সমাজকে বিশেষ করে মুসলিম সমাজকে বহুদূর অগ্রসর করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের দেশের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে থাকবে।

৬.

বাংলা সাহিত্যে তিরিশের দশকে একটি নতুন ধারা তৈরি হয়েছিল যা শুধু সাহিত্য নয়, সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে এবং সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রেও নতুন প্রগতিশীল উপাদান যুক্ত করেছিল। সেই সময় তিরিশের দশকে এক ঝাঁক কবি ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে যারা সাহিত্যর নতুন ধারা প্রবর্তন করেন এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও অনেক মানবিক ও প্রগতিশীল উপাদান সংযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এছাড়াও বনফুল (বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কবিদের মধ্যে তিরিশের দশকের পাঁচ কবির নাম প্রায় উচ্চারিত হয়। তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাস। এই কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে ছিলেন মার্কসবাদী আর জীবননান্দ দাস নিসঃসন্দেহে বাংলা কাব্য জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, নজরুলের পরেই তাঁর নাম আসে। এই কবি ও ঔপন্যাসিকগণ নতুন কিছু করতে চেয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্র প্রভাব বলয়ের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ যে রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি করেছেন বাস্তবগজৎ তার থেকে একেবারে ভিন্ন। বাস্তবজগতের কদর্যতা, নোংরা পরিবেশ ও অমঙ্গলবোধকে সামনে নিয়ে আসাই সাহিত্যের কাজ। সেটাই আধুনিকতা। ঠিক এমন কথাই বলেছিলেন ফরাসি কবি বদলেয়ার। বদলেয়ারের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের অনেকে সাহিত্যে রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্য্যবোধের বদলে জীবনের রুক্ষতাকেই তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ও আরও কিছু নতুন ধারার প্রবর্তন করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাদের কেউ কেউ প্রকাশ করেছিলেন 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' পত্রিকা। তিরিশের দশকে কল্লোলকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে যে যুগ সৃষ্ট হয়েছিল তাকেই অনেক সময় 'কল্লোল

BanglaBook.org

যুগ' বলা হয়। অনেকে তাকে আধুনিকতার যুগ বলেও আখ্যায়িত করেন। তবে আধুনিকতার কথাটি নিয়ে বিতর্ক আছে। এই গ্রন্থের জন্য সেই প্রসঙ্গটি খুব প্রাসঙ্গিক নয় বলে এই আলোচনায় আমরা আর অগ্রসর হচ্ছিনা।

ইতিপূর্বে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যে সকল উপন্যাস রচনা করেছেন তার সকল চরিত্রই ধনী ভূস্বামী বা বিত্তবান। দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন কাহিনি পরিপূর্ণরূপে অনুপস্থিত (রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে দরিদ্র শ্রমজীবীরা থাকলেও তাঁর উপন্যাসে তারা অনুপস্থিত)। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ঘরের নারীদের নিয়ে অনেক মর্মস্পর্শী কাহিনি লিখেছেন কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক জীবনটি কেমন ছিল তা জানা যায় না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি।

উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের দিকে মুখ ফেরালেন প্রথম বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৯০)। এই যে সাহিত্যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত তার সামাজিক ভূমিকাও বিরাট। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পথের পাঁচালি'। এটি একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত। সেখানে প্রতি ছত্রে ছত্রে দারিদ্রের করুণ বর্ণনা আছে। যেমন ইন্দিরা ঠাকুরুণ ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছেন। কিন্তু এই ক্ষুধার আগুন পাঠকের মনে করুণার সৃষ্টি করলেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালায় না। লেখক দারিদ্রের কারণও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেননি। এখানেই বিভূতিভূষণের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য।

তবু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যে যা নাই তা আনলেন বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। ক্ষুধার জ্বালায় বালিকা দুর্গা বিভিন্ন গাছ গাছালির মধ্যে মিষ্টি রস খুঁজে বেড়ায়, তার বিবরণ আছে 'পথের পাঁচালিতে'। দুর্গা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক লিখছেন–

"জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কোন ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নতুন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নতুন- ইহারা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্টি রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না- বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্ট রস আহরণরত এইসব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালক বালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া রাখেন।"

ক্ষুধা ও দারিদ্রের কী নিখুঁত বর্ণনা! কত সহজ ভাষায়!

BanglaBook.org

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে আরও তীব্রভাবে আছে ক্ষুধার যন্ত্রণা। কিন্তু দুর্ভিক্ষের মূল কারণ এই উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় না, বড়জোর মজুতদারদের চিহ্নিত করা হয়েছে। আড়ালে পড়ে আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'পোড়া মাটির নীতি' এবং নাজিমউদ্দীন-সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক সেই নীতির বাস্তবায়ন। দুর্ভিক্ষ নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্প আছে যেখানে দুর্ভিক্ষের কারণ খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মানুষের ক্ষুধা ও মৃত্যুর জন্য তিনি সরাসরি দায়ি করেছেন ইংরেজ প্রশাসন ও পুঁজিপতিদেরকে।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বিষয়টি নানাভাবে এসেছে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রচনায়। বিষয়টি যেভাবে আছে সেভাবেই তিনি চিত্রিত করেছেন। কোন সমর্থনও নাই, সমালোচনাও নাই। তার সমস্ত উপন্যাসগুলোর প্রধান চরিত্র সকলেই ব্রাহ্মণ, যদিও তারা খুবই দরিদ্র (একটি অপ্রধান উপন্যাস 'দম্পতি'তে মুখ্য চরিত্রে রয়েছে একজন কায়স্ত। এটাই একমাত্র ব্যতিক্রম)।

তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা যে কৃষিকাজ বা ঐ ধরণের দৈহিক শ্রম করতে চায় না এটাকে তিনি একভাবে সমালোচনা করেছেন। 'অশনী সংকেত' উপন্যাসের চরিত্র গঙ্গাচরণ (ব্রাহ্মণ) বলছেন, "আমাদের ভদ্রলোকদের কতকগুলো দোষ আছে। পরের পরিশ্রমে আমরা খাব।" দুর্ভিক্ষ যখন শুরু হলো তখন গঙ্গাচরণ পরিবারটি সবচেয়ে প্রথম বিপদে পড়ল। কারণ তাদের জমি নাই, তারা চাষ করে না। নিচু জাতের মানুষরা গঙ্গাচরণকে ব্রাহ্মণ বলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় চাল দিতে অস্বীকার করেছিল। বাধ্য হয়ে গঙ্গাচরণের স্ত্রী কিছু চালের প্রত্যাশায় পরের বাড়িতে ধান ভানার কাজ করেছিল। এটা কিন্তু ব্রাহ্মণের কাজ নয়। দুর্ভিক্ষ মূল্যবোধকেও পাল্টে দিচ্ছে। এদিকে নিচু জাতের কাপালী বউ ছুটকি ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দেহ বিক্রি করেছে। সে বলেছিল, "আর পারিনে না খেয়ে– না খেয়েই যদি মলাম তবে কিসের কি? আমি কোন কথা শুনবো না– চলি বামুন দিদি, পাপ হয় নরকে পচে মরবো সেও ভালো।" দেহ বিক্রির বিনিময়ে ছুটকি যে সামান্য চাল জোগাড় করতে পেরেছিল তার থেকে কিছুটা সে ব্রাহ্মণ গঙ্গাচনণের স্ত্রী অনঙ্গকেও দিয়েছিল। অনঙ্গ তা গ্রহনও করেছিল। যদিও অমন কাজের জন্য তাকে মৃদু তিরস্কারও করেছিল। ব্রাহ্মণ স্ত্রী ছোটজাতের ছুটকি'র দেহ বিক্রির মত ঘটনাটিকে ঘৃণা না করে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেছে। দুর্ভিক্ষ সমস্ত মূল্যবোধকেই ওলোট পালট করে

BanglaBook.org

দিচ্ছে। এই ঘটনা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্টি দুই চরিত্র নিচু জাতের ছুটকি ও ব্রাহ্মণ স্ত্রী অনঙ্গ দুজনকেই মহৎ রূপে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। বস্তুত লেখক নিজেই আমাদের সামনে মহৎ হয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। এবং সমাজকে এক উদার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালিত করছেন। গোটা উপন্যাসে এই দুর্ভিক্ষে একটি মাত্র মৃত্যু আছে। না খেয়ে মারা গেল মতি মুচিনী যে হিন্দু সমাজের চোখে অস্পৃশ্য। কিন্তু তার সৎকারের ব্যবস্থা করলেন দুই ব্রাহ্মণ-গঙ্গাচরণ ও দীনু ভট্টাচার্য। তাহলে দুর্ভিক্ষের কারণে মূল্যবোধের অবক্ষয় শুধু ঘটে না, বিকশিত হয় মানুষের মানবিক দিক। এটাই দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। তাঁর লেখার এবং চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আধ্যাত্মিকতা। তিনি নিজেও উপনিষদ ভক্ত। তাঁর বহু রচনায় উপনিষদের উক্তি শ্রদ্ধা ভরে উচ্চারিত হয়েছে, আধ্যাত্মিকতার রেশও রয়েছে।

প্রথম বাংলা উপন্যাসে বিভূতিভূষণই এনেছেন গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারকে, চিত্রিত করেছেন তাদের দারিদ্র ও ক্ষুধাকে (ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' আরও আগে লেখা হয়েছিল)। আর তারাশঙ্কর (১৮৯৮-১৯৭১) সাহিত্যে নিয়ে আনলেন শুধু দারিদ্রই নয় একেবারে হিন্দু সমাজের নিচের তলায় পড়ে থাকা মানুষ তথাকথিত নীচু জাতের বা নিম্ন বর্ণের মানুষ। তাদের নিয়ে যে সাহিত্য হতে পারে এ কথা উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবাই যেত না। তারাশঙ্কর লেখক হবার আগেই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন এবং জেলও খেটেছিলেন। সেই রাজনীতি হলো কংগ্রেসী রাজনীতি। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় বেশ স্ববিরোধীতা পাওয়া যায়। একদিকে তিনি চরম গান্ধীবাদী, অপরদিকে তাঁরই ভাষ্যমতে তিনি মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরই ভাষ্যমতে, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের 'বস্তুসর্বস্ববাদ' তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। অন্যথায় 'অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি' এই যে মার্ক্সবাদী তত্ত্ব তা তিনি সঠিক বলে মনে করেছেন (আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম খণ্ড)। ১৯২১ সালের আগ পর্যন্ত তাঁর কথামত 'একমাত্র লেনিনই ছিলেন আমার জীবনের নায়ক'। পরে তিনি গান্ধীর আদর্শ ও কর্মভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। আবার ১৯৬০ সালে তিনি লেনিন সম্পর্কে লিখছেন, 'এই আশ্চর্য মানব বন্ধুটি আজও আমার পথ প্রদর্শক'। তাঁর কয়েকটি রাজনৈতিক উপন্যাস আছে। 'ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', ও 'পঞ্চগ্রাম'। এই সকল উপন্যাসে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামকে যা সন্ত্রাসবাদ

BanglaBook.org

নামে পরিচিত তাকে সমালোচনা করা হয়েছে। গান্ধীবাদী নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং নাস্তিকতাবাদের বিপরীতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাম্যবাদী দর্শনের বিপরীতে গান্ধীবাদী মতাদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। এই সকল উপন্যাসে কিছু কিছু কমিউনিস্ট চরিত্র আছে যাদেরকে উজ্জ্বল করে ধরা হয় নি। বরং কোন কোন কমিউনিস্ট চরিত্রকে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনে হয়েছে।

এই সকল উপন্যাসে সমাজসেবা জনকল্যাণমূলক কাজ এগুলোকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে এবং এগুলিই হলো আসল রাজনীতি। তাঁর মতে মুক্তির সংগ্রাম হলো আত্মিক মুক্তির সংগ্রাম, নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বেশ মিল পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের বেশ ওঠানামা আছে। কখনও কখনও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ঘোর বিরোধী, কখনও বা বন্ধু। কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেক সমালোচনা করা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে সব সময়ই একজন বড়ো মাপের সাহিত্যিক হিসেবে সম্মান জানিয়ে আসছে।

নানা রকম স্ববিরোধীতা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের অবদান কেবল উঁচুমানের সাহিত্য রচনাই নয়, সাহিত্যে একেবারে দরিদ্র ও নিচু বর্ণের মানুষকে নিয়ে আসাই হলো তাঁর বাংলা সাহিত্যে প্রগতির ধারায় সবচেয়ে বড়ো অবদান। 'কবি' উপন্যাসের নায়ক হলো ডোম বংশের সন্তান নিতাই, যে বংশের অন্যেরা চোর বলেই পরিচিত। পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবে চোর না হয়ে উপন্যাসের নায়ক নিতাই হয়ে গেল কবি। আসরে গান গাওয়া তো দূরের কথা, মঞ্চে ওঠার অধিকারও তার ছিল না। একদিন এক বিশেষ কারণে মঞ্চে গান গাওয়ার সুযোগ পেল। তার প্রতিপক্ষ তার ডোম বংশ পরিচয় তুলে ধরেই তাকে আক্রমণ করল এই বলে–

"সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।"

অথবা

"আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা-স্বগগে যাবার আশ গো
ফরাৎ করে উড়িল পাতা- স্বগগে যাবার আশ গো"

কত কদর্য ও নিম্ন রুচির এই কবি গান ও গ্রাম্য সংস্কৃতি এবং জাতিভেদ ও বর্ণভেদ সমাজে কত দৃঢ়ভাবে গাঁথা আছে। তারাশঙ্কর তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এর প্রতি সমর্থন নয় রবং সমালোচনাই তুলে ধরেছেন।

BanglaBook.org

তারাশঙ্করের 'কবি' ও অন্যান্য উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামগুলো ছিল জমিদার শাসিত। নিষ্ঠুর ও অমানবিক সেই শাসন। কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থার অবসান তিনি চাননি। তারাশঙ্করের সঙ্গে নিম্নবর্ণের গরিব মানুষগুলির ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতা ছিল। সাঁওতালদের জীবন সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল। সাঁওতাল ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দরিদ্র নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি লেখায় তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তাদের জীবন প্রণালী। যেমন 'হাসুলি বাঁকের উপকথা'। এ উপন্যাসে দেখা যায় একদিকে রয়েছে নিচু জাতের কাহারদের উপর জমিদারি সামন্ত শোষণ। কিন্তু অন্যদিকে ঐতিহ্য ও বিশ্বাসগতভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই গোষ্ঠী জমিদারের অধীনে থেকে কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করবে না। এক পর্যায়ে নবীনরা পুরাতন বিশ্বাসকে ভঙ্গ করে জমিদারি শোষন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চলে গেল নিকটবর্তী চন্দনপুরের রেল লাইনের কাজে, শ্রমিক হয়ে। ছিল কৃষক প্রজা, এখন হলো শ্রমিক। ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিবর্তনের ধারাটি উঠে এসেছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি হয়নি। সামন্ত শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পুঁজিবাদী শোষণের স্বীকার হলো তারা। তারাশঙ্করের ভাষায়–

"মাটি ধুলো, কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙ্গল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর শাবল গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্দনপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে। সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে। কিন্তু তার জন্য বাবা ঠাকুরকে ডাকে না। ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে– বাতাস দেখার যন্ত্রটার দিকে।"

তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে বিশেষ করে রাজনৈতিক উপন্যাসে কোন শ্রেণী সংগ্রাম বা গণ সংগ্রাম নেই। আছে প্রাচীন সামন্তবাদী ধ্যান ধারণার সঙ্গে আধুনিক পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদ যে খারাপ এটা আমরাও যেমন বিশ্বাস করি তারাশঙ্করও একইভাবে বিশ্বাস করতেন। তবে তারাশঙ্করের বেদনা প্রধানত প্রাচীন মূল্যবোধ থাকছে না, সেই কারণে। তাঁর দৃষ্টি সামনের দিকে নয় পেছনের দিকে। ফেলে আসা অতীতের দিকে।

এমনকি এটা ভাবতে অবাকও লাগে যে, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেক্যুলার শিক্ষার পক্ষে ছিলেন তার প্রায় একশ বছর পরে জন্মগ্রহন করে

BanglaBook.org

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তারাশঙ্কর স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মশিক্ষাকে রাখার পক্ষে বারংবার মত দিয়েছেন।

এইরকম পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আস্থাহীন অনেকে পুঁজিবাদের বদলে সাম্যের দিকে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র অভিমুখে না তাকিয়ে পেছনের যুগের (যা হলো সামন্তবাদী) সমাজ ও তার মূল্যবোধের জন্য হা হুতাশ করে। এই প্রসঙ্গে মার্ক্সের একটি মন্তব্য বেশ প্রাসঙ্গিক হতে পারে। বুর্জোয়া বিপ্লব ইউরোপে যে জোয়ার এনেছিল তা সৃষ্টি করেছিল রোমান্টিক সাহিত্য- শেলী বায়রন যার প্রতিনিধি। মার্ক্স বলছেন এই সাহিত্য হচ্ছে বিপ্লবী রোমান্টিসিজম যা বুর্জোয়া সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। আবার বুর্জোয়া সমাজকে প্রত্যাখান করে নস্টালজিয়া, অর্থাৎ অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর প্রবণতা ছিল কারোর মধ্যে যেমন ইংরেজ কবি কলরেজ। মার্ক্স তাকে 'সামন্তবাদ অভিমুখী' বলে বর্ণনা করেছেন। তারাশঙ্করের মধ্যে সেই ধরণের নস্টালজিয়া দেখতে পাই। বিভূতিভূষণের মত তারাশঙ্করও দুর্ভিক্ষ নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন- 'মন্বন্তর'। এই দুই উপন্যাসেই ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রকাশ পেলেও শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাই না। কেন দুর্ভিক্ষ, কারা কেড়ে নিল মানুষের মুখের ভাত, তা জানা যায় না। অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ নিয়ে যে কয়েকটি গল্প লিখেছেন তা সাহিত্য হিসেবেও উন্নত এবং দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা শ্রেণী শত্রুকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করেন।

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' অন্যরকম ছিল। সেখানে দেখি সামন্তব্যবস্থার নির্মম চিত্র। জমিদার মহাজনের অত্যাচারে কৃষক দিশেহারা। তারাশঙ্করের ভাষায় সেই কৃষকের কাছে 'গান্ধীর স্বরাজ সাধনা' বোধগম্য নয়। এই বক্তব্যের সঙ্গে নজরুলের একটি কবিতার দুইটি লাইন তুলনীয়–

"ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,
বেলা বয়ে যায়, খায়নি ক' বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।"

ঐ উপন্যাসে তারাশঙ্কর দেখাচ্ছেন, বাস্তব জীবনে কৃষক জানতে চায় এই জমিদারি প্রথা কবে উঠে যাবে। পরবর্তীকালে জমিদারী প্রথা বিলোপের পক্ষে তিনি আর লেখেননি। এই উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে এক বিরাট প্রশ্নকে সামনে রেখে। এই কৃষককে বাঁচাবে কে? এত বড়ো প্রশ্নকে সামনে রেখে তারাশঙ্কর সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর আগে আর

BanglaBook.org

কোন লেখক সাহিত্যে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এই উপন্যাসে দেখি কৃষক বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের আর কোনো বইয়ে কৃষক বিদ্রোহের সামান্যতম ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। এই উপন্যাসে দেখি, এক ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী কৃষক রাগের মাথায় জমিদারকে হাতের কাছে না পেয়ে হত্যা করল জমিদারের খোট্টা চাপরাশিকে (তুলনীয়- শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে গফুরও রাগের মাথায় হত্যা করেছিল তার প্রিয় গরুটিকে)। তারপর সে স্বস্ত্রীক গ্রাম ত্যাগ করল (তুলনীয়- গফুরও রাতের অন্ধকারে মা মরা মেয়ের হাত ধরে গ্রাম ত্যাগ করেছিল)। শরৎচন্দ্রের গফুরের মত তারাশঙ্করের কৃষকটিও কারখানায় চাকরি নিল। কিন্তু সেখানেও আরেক ধরণের শোষণ ও নির্যাতন। গ্রামে সামন্ত শোষণ, শহরে ও কারখানায় পুঁজিবাদী শোষণ। শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে (যা তারাশঙ্করের অন্য কোন উপন্যাসে পাওয়া যাবে না)। উপন্যাসের শেষের দিকে দেখি শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু সেদিনকার মতো ব্যর্থ হলেও শ্রমিকরা মনের দিক থেকে পরাজিত হয়নি। লেখকও আশাবাদ পারিত্যাগ করেননি। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে তারাশঙ্কর শ্রমিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাতে চেয়েছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল 'চৈতালী ঘূর্ণি' পরিণত হবে 'কাল বৈশাখীতে'।

এই লেখার কুড়ি বছর পর তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'চৈতালী ঘূর্ণি'র পূর্বাভাস সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, "রুশ বিপ্লব সেই দিনের ঊষাকাল।"

একমাত্র 'চৈতালী ঘূর্ণি' বাদে তারাশঙ্কর বা তাঁর আগে অন্য কোন লেখক শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক গল্প উপন্যাস লেখেননি। সর্বপ্রথম শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক সার্থক সাহিত্য রচনা করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে যথার্থই বাংলার গোর্কি বলা যেতে পারে।

৭.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) কেবল উপন্যাসে ও ছোটোগল্পে সাম্যবাদী ধ্যান ধারণা ও শ্রেণী সংগ্রামের বিষয়বস্তুই আনেন নি, তিনি আনলেন লেখার নতুন স্টাইল, ভাষা, সংলাপ ও চরিত্র সৃষ্টির নতুন ধারা। একদিকে বিষয়বস্তুতে কমিউনিস্ট চেতনা, অন্যদিকে নান্দনিক সাহিত্য মূল্য হিসেবেও অসাধারণ। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাস যথা– 'পদ্মা নদীর মাঝি' অথবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (এই দুটি উপন্যাস কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম

BanglaBook.org

ভিত্তিক রচনা নয়) বিশ্ব সাহিত্যের বিচারেও উৎকৃষ্ট, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্যতাও রাখে। দুর্ভাগ্য আমাদের, নোবেল প্রাইজ কমিটির নিকট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলা ভাষায় রচিত অনেক উচ্চমানের আর্ট সম্পন্ন সাহিত্য অপরিচিতই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়ার পরই তা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল (গীতাঞ্জলীও রবীন্দ্রনাথের মধ্যম শ্রেণীর রচনা)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর্টের জন্য আর্ট (Art for Art's Sake) এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সাংস্কৃতিক সংগঠন 'গণনাট্য সংঘে'র প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বললেন "আর্টের ধোঁয়ায় এদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধেও এদের দ্বিধাও নেই। দূর্বলতা নেই।" তাঁর মতে, শিল্পীর একটি সামাজিক দায়িত্বও আছে। তা হলো মেহনতি মানুষের শ্রেণী চেতনাকে শাণিত করা। জাতীয় মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে সাহিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা।

প্রথম জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মার্কসবাদী ছিলেন না। তাঁর উপর বরং ফ্রয়েডীয় প্রভাব ছিল। তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় 'চতুষ্কোণ' উপন্যাস অথবা 'প্রাগৈতিহাসিকে'র মতো অসাধারণ উচ্চমানের গল্পের মধ্যে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের গল্প বিরল। ফ্রয়েডীয় প্রভাব আছে ঠিকই, কিন্তু অশ্লীলতা নাই। বরং সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। এক পর্যায়ে তিনি ফ্রয়েডকে প্রত্যাখ্যান করে মার্কসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যও হয়েছিলেন।

তাঁর কোনো কোনো গল্প বা উপন্যাসে যৌনতা আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে তাঁর নিজের কথাই শোনা যাক।

"চাষাভূষা নিয়ে গল্প লিখব বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য, যারা দেহরক্ষার ব্যাপারে অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করার অবসর পায় এবং ওই অবসর সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষাভূষা পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করবো একমাত্র ঐ দুটি ভুখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে, সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গেছে।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেণী সংগ্রামের লেখক। তিনি মার্কসবাদী। তার মানে এই নয় যে তাঁর লেখায় শিল্প নৈপুণ্যের অভাব ছিল অথবা রোমন্টিকতা বলে কিছুই ছিল না। বরং শিল্প নৈপুণ্যের দিক থেকে তিনি অতি উচ্চাসনে অবস্থান করছেন এবং তাঁর অনেক লেখা রোমান্টিকতায়

BanglaBook.org

ভরপুর। যেমন– তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'অতসী মামী' রোমান্টিকতায় ভরপুর একটি গল্প। তাঁর প্রথম উপন্যাস (প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস) 'দিবারাত্রির কাব্য' তো আসলেই কাব্য। অপূর্ব কাব্যরসে ভরপুর। প্রথম দিককার এইসব গল্প উপন্যাসে শ্রেণী বা শ্রেণী সংগ্রাম নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই উপন্যাসের কোন কোন জায়গায় আমরা অন্য এক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাই, সম্ভবত ভবিষ্যতের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যখন তিনি এক চরিত্রের মুখ দিয়ে 'সুখ'কে 'শুঁটকি মাছে'র সঙ্গে তুলনা করছেন। 'সুখ তো শুঁটকি মাছ। জিহ্বাকে ছোটলোক না করলে স্বাদ মেলে না।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বাস্তবতার সাথে রোমান্টিকতার মিশ্রণ, কাব্যরসের পাশাপাশি ঋজু, বলিষ্ঠ, ব্যাঙ্গাত্মক, তীর্যক বাক্য দেখা যাবে। এক্ষেত্রে ম্যাক্সিম গোর্কির একটি কথা প্রাসঙ্গিক হতে পারে। "খুব সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন যে, বালজাক, তুর্গেনভ, গোগল, লেসকভ অথবা চেখভের মতো ধ্রুপদী সাহিত্য রোমান্টিক না বাস্তববাদী ছিল। কারণ মহৎ শিল্পকর্মে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার মিশ্রণ থাকে।"

'পদ্মা নদীর মাঝি'র মতো রোমান্টিক উপন্যাসে যেখানে শ্রেণী সংগ্রামের কোন কিছু নাই সেখানেও মাঝে মধ্যে ভবিষ্যতের মার্ক্সবাদী ও শ্রেণী সংগ্রামের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা পাওয়া যাবে। রোমান্টিকতার মধ্যেও আরেক ধরনের ভিন্ন স্বাদ। যেমন গরিব মৎস্যজীবী কুবের জানে, "গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। ... তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্ম-সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না।"

এই উপন্যাসে তিনি জেলেপাড়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ব্যতিক্রমী শিল্পীর চোখ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হত না। তিনি লিখছেন, "জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

এই লেখায় ধর্ম সম্পর্কে যে বক্র উক্তি আছে সেটা লক্ষ্য করার মতো। তিনি নিজেও পরবর্তীতে দাবি করেছেন যে কলেজে পড়াকালীন সময়েই তিনি নিজেকে ধর্মীয় গোড়ামি থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন আর পরবর্তীতে মার্ক্সবাদের দীক্ষা লাভ করার পর পুরোপুরি বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিতে পরিণত

BanglaBook.org

হন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর এরকম আরও বক্তব্য আছে। পরিণত বয়সে লেখা 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে মহাকাব্য রামায়ন ও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে এমন ধরণের বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য পাওয়া যাবে।

"কামের জ্বালায় রাবণের এবং বিরহের জ্বালায় সীতার জ্বর হয়। সে জ্বর জগতে আগে ছিল না।" ধর্মীয় বিষয় নিয়ে এমন তীর্যক ও ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম।

মার্কসবাদের দীক্ষা লাভ করার পর তিনি এই উপলব্ধি করলেন যে সাহিত্যেও মার্কসবাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁর কথায়, "...মার্কসবাদই যখন মানবতার প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীতে কি ছিল, বর্তমানে কি হয়েছে এবং কীভাবে কোন ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে, তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে-এলোমেলো উল্টাপাল্টা অনেক কিছুই তো ঘটবেই...।"

মার্ক্সবাদী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক রচনাসমূহকে তাঁর উত্তরকালের সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে উপন্যাসের চেয়ে তাঁর গল্পগুলো অধিকতর শ্রেণীচেতনায় উদ্দীপ্ত এবং কোনো কোনোটি বিশ্বমানের পর্যায়ে পড়ে। 'হারানের নাতজামাই' এবং 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী' শ্রেণী সংগ্রামের গল্প হিসেবে অসাধারণ। এখানে উল্লেখ্য, হুগলী জেলার শিঙ্গার থানার এক গ্রামে কংগ্রেস সরকারের গুলিতে দুই কৃষক কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কথাবার্তা বলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই এই গল্পটি লিখেছিলেন। এই গল্পে সংগ্রামী মানুষের তেজস্বী ভূমিকা যেমন আছে তেমনই গুলি চালাতে চেয়েছিল যে পুলিশ দলপতি সেই মন্মথকে লেখক ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় চিত্রিত করেছেন। রঙিন শাড়ি পরা কচি মেয়েটিকে দেখে পুলিশ অফিসারের মনে হয়েছে "যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে এক ফোঁটা টসটসে দরদ।" এটাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব স্টাইল যা বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয়। আবার একই গল্পে ভয়হীন ঐক্যবদ্ধ লড়াকু মানুষের যে বর্ণনা দিচ্ছেন যার সামনে পুলিশ ছিল অসহায় সেখানে লেখকের মন্তব্য "মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।" সংগ্রামী মানুষের প্রতি এই ছিল তাঁর গভীর আস্থা।

চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু মানিকের মতো এমন করে কেউ প্রশ্ন করেনি 'ছিনিয়ে খায়নি কেন?' এটি একটি

BanglaBook.org

গল্পের নাম। দুর্ভিক্ষ পীড়িত যোগীর মুখ দিয়ে লেখক বলছেন, "দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু?" তারপর লেখক ব্যাখ্যা করছেন জনগণের মধ্যে বিদ্রোহী চেতনার অভাব, বড়োলোকের তৈরি আইনের প্রতি অকারণ আস্থা বা শ্রদ্ধা– এটাই কেড়ে না খাওয়ার কারণ। এইসবগুলোকেই তিনি নিন্দা করে বিদ্রোহের আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রচলিত বুর্জোয়া মূল্যবোধ যে ভেঙ্গে যাচ্ছে তাকে তিনি গল্পে স্বাগত জানিয়েছেন। আকালের সময় শহরের ব্যবসায়ী দত্ত বাবুরা নিয়ে গিয়েছিল রমাপদের স্ত্রী মুক্তাকে। সমাজপতিরা মুক্তাকে দুশ্চরিত্র মেয়ে বলে বিচার বসিয়েছিল। রমাপদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই বিচার সভায় বনমালী চিৎকার করে ওঠে, "কীসের বিচার, কার বিচার?" এই কথার মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিচার, সামাজিক বিচার বা কোর্টের বিচার যাই হোক তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনার সৃষ্টি করেছেন। আরেকটি গল্পে রাঘব মালাকারকে দিয়ে তিনি বিদ্রোহ করিয়েছেন যে ধরণের বিদ্রোহ তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসে পাওয়া যাবে না।

মানিকের ব্যাঙ্গাত্মক ভাষা এবং একই সঙ্গে রুঢ় বাস্তবভিত্তিক বক্তব্য লক্ষ্য করার মতো। "অন্ন নেই, কিন্তু অন্ন পাওয়ার একটি উপায় পাওয়া গিয়েছে মেয়ের বিনিময়ে। কয়েক বস্তা অন্ন, মেয়েটির দেহের ওজনের দুই তিন গুণ। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও যা দিয়ে খান কয়েক বস্ত্র কেনা যেতে পারে" (নমুনা শীর্ষক গল্পে)। আরেক গল্পে (গোপাল শাসমল) ক্ষুধার তাড়নায় একটি মেয়ে নিজেই দেহ বিক্রী করতে এসেছে। কিন্তু তার কথাগুলো লক্ষ্য করুন, "চাল এনেছো তো? আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা অসাধারণ। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক–

'কর্তরা ভোজ খাবেন, মোরা না খেয়ে মরব।'

দুর্ভিক্ষ পীড়িত নারীর দৈহিক বর্ণনা–

'মেয়েছেলে। হাতে জড়ানো সিটে চামড়া, তাতে ঘা-পাঁচড়া। আধ ওঠা চুলের জট ক্ষ্যাপার মতো চুলকাচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গের মতো শুকনো বোঁটা, পাছা বলতে লাঠির ডগার মতো, খোঁচানো হাড্ডি। আর কী দুর্গন্ধ গায়ে! পচা ইঁদুর, মরা সাপের মতো।'

ধনী ব্যবসায়ীদের লাম্পট্য সম্পর্কে তাঁর একটি মন্তব্য

'লাখপতিরা মোটর হাঁকায় শুধু বাজারের স্ত্রী লোক নিয়ে– বাড়ির স্ত্রী বাড়িতেই থাকে।'

BanglaBook.org

শোষক শ্রেণীর রাজভক্ত আমলাদের প্রতি তাঁর ঘৃণা মিশ্রিত মন্তব্য 'একুশ বছরের ব্রিলিয়ান্ট সার্ভিস, একুশ বছরের কর্তব্যপরায়ন দায়িত্বশীল নিখুঁত চাকর।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এরকম প্রতিটি বাক্য যেন চাবুকের মতো ঝলকায়।

কোলকাতার দাঙ্গা পীড়িত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন গল্পে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সামনে এনেছেন। 'শত্রু মিত্র' গল্পে দেখা যাচ্ছে হিন্দু মুসলমানের নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া বিবাদ থাকুক না কেন, এক ইংরেজ সৈন্যের অত্যাচারের হাত থেকে চাঁপা নামের এক মেয়েকে বাঁচাতে, নারীর সম্মান রক্ষার্থে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছে।

১৯৪৬ সালের রশীদ আলী দিবসে জনগণের যে রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছিল এবং ইংরেজরা বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন এক অসাধারণ উপন্যাস 'চিহ্ন'। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে যারা তারা সবাই গরিব ও শ্রমজীবী। তাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। সবাই একত্রে লড়াই করছে। শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'দর্পণ' উপন্যাসটি। এই আন্দোলনের নেতা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই। পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিভাজন নীতি লড়াকু মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান নারী পুরুষের মধ্যে প্রেমের ঘটনাও আছে।

উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল প্রতিভাবান লেখকই নন, তিনি যেন শ্রেণীসংগ্রামের কর্মী বা নেতা। 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক এক নিবন্ধে "অজস্র প্রচারযন্ত্র ও অসংখ্য দালালের মারফতে যেখানে অহরহ বুর্জোয়ার সংস্কৃতির আফিমের ধোঁয়া ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে জনসাধারণের মগজে, বুর্জোয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান কায়দা, সেখানে সেই অবস্থায় সংস্কৃতি প্রতিরোধ ও প্রতি আক্রমণকে কলম ও তুলির সাহায্যে জোরালো" করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই আরেকজন লেখক হয়তো আমরা পেতাম যদি না মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে খুন না হতেন। তাঁর নাম সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২)। তিনি ঢাকার সন্তান। ঢাকা শহরেই লেখাপড়া করেছেন এবং সরাসরি

BanglaBook.org

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি ঐ বয়সেই রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন করতেন। এবং এক সময় এই ট্রেড ইউনিয়নের সাধরণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। রেলওয়ে ইউনিয়ন করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সোমেন চন্দ শ্রমিকের বস্তিতেও থেকেছেন। তাঁর ইউনিয়নের এলাকাটি ছিল নারায়নগঞ্জ থেকে ভৈরব পর্যন্ত। মেট্রিক পাশ করার পর তাঁর আর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া হয়নি। তবে শ্রমিক ইউনিয়নের কাজের পাশাপাশি মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেন গভীর আগ্রহ সহকারে। একই সঙ্গে দেশি বিদেশি সাহিত্যও পাঠ করেছেন এবং নিজেও একাধিক গল্প রচনা করেছেন যা ছিল নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং সাহিত্য হিসেবেও উন্নত মানের। তিনি যক্ষা রোগে ভুগছিলেন। সেই যুগে যক্ষার চিকিৎসা ছিল না। কিন্তু ঐ স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি পার্টির কাজ, ইউনিয়নের কাজ এবং সাহিত্য চর্চা একই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন। সোমেন চন্দের সমসাময়িক ও তাঁর জীবনীকার কবি কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত লিখেছেন, "১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত সোমেন চন্দের সাহিত্য জীবন ও রাজনীতি চর্চা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছিল।" এসবের পাশাপাশি সোমেন চন্দ, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত ও রণেশ দাসগুপ্ত ঢাকায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন যেখানে প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা হতো এবং সাহিত্যে গণ মানুষের কথা তুলে ধরা হতো। সোমেন চন্দের শিক্ষাগুরু বিপ্লবী সতীশ পাকড়াসী বলেছেন সোমেন চন্দই ছিলেন এই তরুণ দলের অগ্রণী কর্মী।

সোমেন চন্দ যক্ষার কারণে মৃত্যু বরণ করেননি। তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি মিছিলে (১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ) নেতৃত্ব দেবার সময় রাজনৈতিক বিরোধী পক্ষের আক্রমণে ও ছুরিকাঘাতে। এইভাবে আমরা এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছি। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন ছাত্র ফেডারেশন এই হত্যার প্রতিবাদে কোলকাতায় যে সভার আয়োজন করেছিল সেখান থেকেই গড়ে উঠেছিল 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও উর্দু কবি ইকবালের গান পরিবেশিত হয়েছিল।

সোমেন চন্দের জীবদ্দশায় তাঁর কোন গল্প, উপন্যাস, গল্পসমগ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। কিছু কিছু গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

BanglaBook.org

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ আত্মগোপনে থাকাকালীন সোমেন চন্দের নাম জানতেন, তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তাও জানতেন, কিন্তু তাঁর কোনো লেখা পড়ার সুযোগ পাননি। পরে তিনি সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'ইঁদুর' জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প। তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ গভীর বেদনা সহকারে লিখেছিলেন "আমার মন তখন হাহাকার করে উঠল। হায় হায়! এমন ছেলেকে রাজনীতিক মন কষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেললো! সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন।" 'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থটির ভূমিকায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এই কথাগুলো বলেছিলেন।

'ইঁদুর' গল্পটি একটি রূপকধর্মী গল্প যেখানে ইঁদুর হলো সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। আর তাকে মারার জন্য যে সামাজিক প্রস্তুতি, সেটাকেই রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন গল্পকার। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী ও সাহিত্যিক কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে এমন সার্থক রূপক গল্প বিরল।"

সোমেন চন্দ এরকম অনেকগুলো রূপক গল্প লিখেছেন। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে বাস্তব সংসারের জীবন এবং শ্রেণী সংগ্রাম চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে খতম করে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন ও সম্ভাবনা তিনি দেখিয়েছেন।

দাঙ্গা নিয়েও তাঁর একটি গল্প আছে। অবশ্য তখনো চল্লিশের দশকের মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু তার আগেই ঢাকায় তুলনামূলক যে ছোটোখাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তাতে অন্যান্য কমিউনিস্ট কর্মীদের মতো সোমেন চন্দও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। তিনি সাইকেলে চড়ে দাঙ্গাপীড়িত এলাকায় যেতেন, খোঁজ খবর নিতেন এবং দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর সেই উৎকণ্ঠা ও অভিজ্ঞতার ফসলই ছিল 'দাঙ্গা' গল্পটি।

'সংকেত' নামে তাঁর একটি পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের গল্প আছে যেখানে তিনি মিল মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব এবং শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত একটি গল্প রচনা করেছিলেন। এই

BanglaBook.org

গল্পে আমরা দেখি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রমিক ও কৃষক ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করছে। সেই লড়াইকে দমন করার জন্য গুলি চালিয়েছে পুঁজিপতি ও তাদের পাহারাদার সরকারের সৈনিকরা। কিন্তু শ্রমিক কৃষক আন্দোলনকে দমন করা যায়নি। এখানে আমরা আরও দেখি মালিক পক্ষের দালালদের মধ্যে যেমন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোক রয়েছে তেমনই সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যেও রয়েছে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমজীবীরা। ধর্মীয় বিভেদ নয় বরং শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বই আসল কথা। গল্পের শিরোনামটিও ইঙ্গিতবহ। 'সংকেত' কথাটি ভবিষ্যতের শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের বার্তা বহন করে। তাঁর রচনা সম্পর্কে পবিত্র সরকার যথার্থই বলেছেন, "সোমেন কখনওই হেনরি বা মপাসাঁর মতো Whip-crack ending-এর পক্ষপাতী নন, হঠাৎ তিনি কোন অভাবিত অপ্রত্যাশিত ঝলকানিতে আমাদের বিমূঢ় করে দেন না, বরং গল্পে শেষে আমাদের পৌঁছে দেন। ফলে তাঁর গল্পে উপসংহার আমাদের আরোপিত কৃত্রিম বলে মনে হয় না।"

সোমেন চন্দের বিপ্লবী শিক্ষাগুরু সতীশ পাকড়াসী যথার্থই বলেছেন, "বিপ্লবী সোমেন, কমিউনিস্ট সোমেন, ভারতের স্বাধীনতাকামী সোমেন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিক জনযুদ্ধের বীর সৈনিকরূপে ২২ বছর বয়সে আত্মজীবন উৎসর্গ করে গণমানবের উদ্বুদ্ধ চেতনা সংগ্রামমুখী করে রেখে গেল। তাঁর অস্পষ্ট ও অর্ধস্ফুট সাহিত্য ফুটে উঠবে, স্পষ্ট হয়ে উঠবে, নূতন বিপ্লবী সাহিত্যে-নিপীড়িত গণমানবের মনোবেদনার দুর্জয় অভিব্যক্তিতে।"

বিপ্লবী সতীশ পাকড়াসী যথার্থই ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিলেন। চল্লিশের দশকে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান আন্দোলন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সত্ত্বেও সাহিত্যে একটি বাম প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত তিরিশের দশক থেকেই গণ মানুষের কথা বেশি বেশি করে আসতে থাকে এবং সাহিত্যে বাম মোড় স্পষ্টতর হতে থাকে। নজরুলকে দিয়েই এই বাম যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুকান্তের মধ্য দিয়ে এই ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে।

এবার আমরা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবার ফিরে যাই।

BanglaBook.org

৮.

বাংলা ভাষায় নাটক যাত্রা পালা লোকসংগীত ইত্যাদির ঐতিহ্য অনেক পুরাতন ও সমৃদ্ধ। তবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই যাত্রা পালা এবং গান একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় ও তার পরে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে সব সংগীত রচনা করেন তা যেমন শিল্প হিসাবেও অতি উন্নত তেমনি তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশাত্মবোধক চেতনাও জাগ্রত করেছিল। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' সে সময়ই রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে। বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামী চেতনারও বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানের মধ্য দিয়ে। যেমন-

'আমি ভয় করব না ভয় করব না।'

... ...

অথবা

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।'

... ...

রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) একটি গান তখন খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল–

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই'

... ...

এসব গানকেই স্বদেশী গান বলা হয়ে থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) অনেকগুলো জনপ্রিয় স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন যেমন–

'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক– সকল দেশের সেরা–'

... ...

উনবিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বৃটিশপ্রীতি দেখা গিয়েছিল (কিছু ব্যতিক্রম ছিল)। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিষয়টি উল্টে গেল। তরুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বিশেষ করে হিন্দু মধ্যবিত্ত বৃটিশবিরোধী চেতনায়

BanglaBook.org

উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। শত শত যুবক স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে অথবা পুলিশ মিলিটারির গুলিতে অথবা অন্য কোন নির্যাতনে জীবন দান করতে থাকেন অকাতরে। তাঁদের মহান আত্মত্যাগের কথাই উঠে এসেছে মোহিনী চৌধুরীর (১৯২০-১৯৮৪) সেই বিখ্যাত গানে যার প্রথম স্তবকটি হলো

'মুক্তির মন্দির সোপনতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে॥

গানটির সুর ও কণ্ঠ দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি হওয়ার পর কোন এক অজানা কবি যে দেশাত্মবোধক গানটি লিখেছিলেন তা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে গীত হতো।

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসি।
দেখবে ভারতবাসী॥'

... ...

সঙ্গত কারণেই গানের রচয়িতা নিজের নামটি গোপন রেখেছিলেন। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে এই গানের রচয়িতার নাম পীতম্বর দাস।

রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলালের পর বিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকে আরেক মহান প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলামের যে আবির্ভাব ঘটেছিল সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গানগুলো কেবল দেশাত্মবোধকই নয়, আগুন ঝরানো এবং বিদ্রোহাত্মকও বটে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যাত্রা বা পালা গান লিখে দেশবাসীকে বৃটিশ বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এক বিখ্যাত চারণ কবি- মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪)। ১৯ বছর বয়সেই তিনি ১০০টি গান সমৃদ্ধ একটি বই রচনা করেছিলেন। দরাজ গলায় একের পর এক গান গেয়ে জনসাধারণকে সংগ্রামী চেনতায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাংলার গ্রাম, নগর, বন্দর, মুখোরিত হয়ে উঠত মুকুন্দ দাসের যাত্রাগানে। মুকুন্দ দাস মোট ৫টি স্বদেশী যাত্রা রচনা করেছিলেন- 'মাতৃপূজা', 'সমাজ', 'কর্মক্ষেত্র', 'পথ', ও 'পল্লীসেবা'। 'মাতৃপূজা' গ্রন্থটি বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং এই পালা রচনার

BanglaBook.org

জন্য তিনি আড়াই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। তবে বৃটিশের দণ্ডাদেশ ও নির্যাতন তাকে সংগ্রামী গান ও যাত্রা রচনার পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে তাঁর লেখা 'কর্মক্ষেত্র' ও 'পথ' এই পালা দুটিও নিষিদ্ধ হয়েছিল। তিনি রাজনৈতিক পালা রচনার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারমূলক যাত্রাও রচনা করেছিলেন। 'সমাজ' ও 'পল্লীসেবা' ছিল এই ধরণের পালা যেখানে সামাজিক কুসংস্কার এবং বিশেষত যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন।

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে মুকুন্দ দাসের এক নায়িকা বিদ্রোহ করে ঘোষণা করে–

'থাকুক আমার বিয়ে
চাই না আমি এমএ, বিএ
কিনতে যা হয় টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত
যাদের ছেলের হাটে গিয়ে। ...'

রাজনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে চল্লিশের দশক একটি বিশিষ্ট দশক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। বিশ্বযুদ্ধ, গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলন, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ, লাল ফৌজের হাতে ফাসিস্ত হিটলারের পরাজয়, দুর্ভিক্ষ, গণ আন্দোলন, নৌ সেনা বিদ্রোহ, সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান আবার তারই বিপরীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান আন্দোলন, দেশ বিভাগ ও বৃটিশের ভারত ত্যাগ– সব মিলে এই দশকটি ছিল বিভিন্ন ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাজের মধ্য দিয়ে শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একটি বাম মোড় স্পষ্টভাবে দেখা দিতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে 'লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয়েছিল। তারই পরবর্তী ধাপ ছিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (Indian People's Theatre Association, সংক্ষেপে IPTA)। এই সংস্থার সঙ্গে অনেক প্রতিভাবান মার্কসবাদী ও প্রগতিশীল সাহিত্যিক শিল্পী, গায়ক, সুরকার যুক্ত হয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ নিয়ে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যা ছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত নাটক। দুর্ভিক্ষের উপর জয়নাল আবেদীন একাধিক চিত্র অঙ্কন করেছেন যার শৈল্পিক মূল্য অসাধারণ।

এই গণনাট্য সংঘের সাথে জড়িত হয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলীল চৌধুরীর মতো অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি, গায়ক, সংগীত রচয়িতা ও

BanglaBook.org

সুরকার। তাঁরা উভয়ই মার্কসবাদে দীক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীও ছিলেন। তাঁদের গানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা, শ্রমিক কৃষকের মুক্তির সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলীল চৌধুরীর মতো অত বড়ো প্রতিভাবান সংগীত রচয়িতা আজ পর্যন্ত কেউ আসেননি। বস্তুত তাদের হাত দিয়েই গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে নজরুল প্রমুখ বিদ্রোহী গান রচনা করলেও এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশাত্মবোধক গান রচনা করলেও গণ সংগীত বলতে যা বোঝায় তা বিনয় রায় (১৯১৮-১৯৭৫), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭) প্রমুখ এবং সবশেষ হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলীল চৌধুরীর হাত দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। গণসংগীত তাকেই বলা যায় যার মধ্যে আন্তার্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক চেতনাবোধ থাকে । গণসংগীত রচয়িতা বিনয় রায়কেই গণসংগীতের অন্যতম পথিকৃত বলা যায়। তিনি নিজে ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ এলাকায় বিপ্লবী কৃষক আন্দালনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'অহল্যার মায়ের গান' একটি অতি উচ্চমানের শিল্পসমৃদ্ধ এবং একই সঙ্গে সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি গান। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি গণসংগীতকে মধ্যবিত্ত গণ্ডির বাইরে শ্রমিক কৃষকের মাঝে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই সময় শ্রমজীবী গরিব মানুষের মধ্য থেকেও কয়েকজন প্রতিভাবান লোকশিল্পী, কবি, গায়ক, কবিয়ালের আবির্ভাব ঘটে। তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীলের (১৮৭৭-১৯৬৭) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনে তিনি মাইজভাণ্ডারির গানের জগতে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। বিপ্লবী গান রচনার জন্য তাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন, "কবি রমেশ শীল সর্বহারার আন্তর্জাতিকার আলোকে দেখলেন এক লাল দুনিয়া যার জন্য মুর্শিদের মোকাম ছেড়ে নেমে এলেন লাড়াইয়ের ময়দানে।"

পশ্চিম বাংলা দরিদ্র পরিবারের সন্তান কবিয়াল শেখ গোমানিও (১৮৯৬-১৯৭৬) মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের গান রচনার জন্যই তিনি শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন।

BanglaBook.org

ময়মনসিংহের বিড়ি শ্রমিক লোককবি নিবারণ পন্ডিত (১৯২২-১৯৮৪) শ্রমিক কৃষকের মুক্তির গান রচনা করে একদিকে যেমন মেহনতি মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, অপরদিকে সরকার ও বুর্জোয়ার নির্যাতনও সহ্য করতে হয়েছিল। কবিয়াল রমেশ শীলের মতো তিনিও কারাভোগ করেছিলেন।

আকেকজন বিখ্যাত কবিয়াল গুরুদাস পাল (১৯১৩-১৯৬৮) ছিলেন কোলকাতার মেটিয়াবুরুজের সাধারণ শ্রমিক। রমেশ শীল ও নিবারণ পন্ডিতের মতো গুরুদাস পালকেও গান রচনা ও গান গাওয়ার জন্য কারাভোগ করতে হয়েছিল। বহুদিন তাঁকে আত্মগোপনেও থাকতে হয়েছিল। এই সকল গরিব কমিউনিস্ট লোককবিদের বাইরে একমাত্র নজরুল ইসলামকেই কবিতা ও গান লেখার জন্য জেল খাটতে হয়েছিল।

চল্লিশের দশক একদিক দিয়ে সংগ্রামী চেতনায় উজ্জ্বল একটি দশক, অন্যদিক দিয়ে এই দশকেই পাকিস্তান আন্দোলনের মতো প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে ভেসে গিয়েছিল মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ কয়েকজন অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী (কেউ কেউ কমিউনিস্টও), রাজনীতিবিদ ও লেখকের আবির্ভাত ঘটেছিল যেমন কবি জসীম উদ্‌দীন, লেখক শওকত ওসমান, সৈয়দ মুজতবা আলী, কবি গোলাম কুদ্দুস (কমিউনিস্ট), কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। তাঁরা তখন বয়সে তরুণ এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। (কবি নজরুল যে পাকিস্তানকে 'ফাকিস্তান' বলে ব্যাঙ্গ করতেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।)

তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে আন্তর্জাতিকভাবে এবং আমার দেশেও লেখক সাহিত্যিকদের একটি সক্রিয় উদ্যোগ দেখা যায়। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের বিপদ ও যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে (সেই মহাযুদ্ধ ১৯৩৯ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল লাল ফৌজের হাতে ১৯৪৫ সালে হিটলারের পতনের মধ্য দিয়ে) ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধকে রোধ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালে রোমা রোঁলা, বার ব্যুস ও ম্যাক্সিম গোর্কির নেতৃত্বে পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে প্রেরণা পেয়েই ১৯৩৬ সালে ভারতে গড়ে ওঠে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এর পরপরই কোলকাতায় প্রতিষ্ঠত হলো 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সকল সংগঠন গড়ে তোলার পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ ও ভূমিকা ছিল। প্রগতি

BanglaBook.org

লেখক সংঘের শাখা বিভিন্ন জেলায় তৈরি হয়েছিল, বিশেষ করে ঢাকায়। ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘ গঠনে যারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং প্রগতিশীল সাহিত্য রচনায় যারা এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শহীদ সোমেন চন্দ, রণেশ দাসগুপ্ত, সত্যেন সেন, কিরণশঙ্কর দাসগুপ্ত, অজিত কুমার গুহ, সরলানন্দ সেন প্রমুখ। কিছু পরে চল্লিশের দশকে ঢাকায় একদল অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন তরুণ মুসলমান লেখক এই সংঘে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ নুরুদ্দীন প্রমুখ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যখন কবি গোলার মোস্তফা, কবি ফররুখ আহমেদ প্রমুখ কবি ও লেখকগণ পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে কলম ধরছেন এবং ইসলামী তমুদ্দীনের কথা বলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করে ইসলামীকরণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন ক্ষীণ স্রোত হলেও কিছু জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল মুসলিম লেখক ও কবিরও আবির্ভাব ঘটেছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প দিনের মধ্যেই এই ক্ষীণ স্রোত প্রবল শক্তিশালী স্রোতে পরিণত হয়েছিল এবং শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। তারই পরিণতিতে ভাষা আন্দোলন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল।

৯.

এবার কবিতার জগতে ফিরে আসা যাক। বিংশ শতাব্দীতে কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনা ভালোভাবেই চোখে পড়ে। অবশ্য মার্কসীয় চেতনা না থাকলেও এক ধরণের ভাসা ভাসা সাম্যের চেতনা আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও দেখতে পাব, গদ্য সাহিত্যে এবং কিছু কিছু কবিতাতেও। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'সাম্য' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাম্য গ্রন্থে কৃষকের দুর্দশা শুধু নয়, সাধারণভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিও তাঁর লেখায় এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে বঙ্কিম একেবারে পাল্টে গেলেন। তিনি নারী পুরুষের সমতার দাবি অস্বীকার করলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে তিনি স্পষ্টতই বললেন, 'সাম্য কি সম্ভব? পুরুষ কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যদান করিতে পারে?" তারপর তিনি এই দুটো কাজকেই স্ত্রী জাতির একমাত্র কাজ বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তী'র

BanglaBook.org

বঙ্কিম জমিদারি প্রথা সমর্থন করেছন, এমনকি হাস্যকর মনে হলেও তিনি একথাও বলেছেন যে, "অনেক স্থলে এখন দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী, জমীদার দুর্বল।" 'সাম্য' গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি বইটির পুনর্মুদ্রণ করতে রাজি হননি। এমনকি তাঁর মতে 'সাম্য' গ্রন্থের অনেক কিছু ভুল ছিল।

এর অনেক বছর পর সাম্যের বাণী উচ্চারণ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), নজরুলেরও আগে। নজরুলের চেয়ে বয়সেও তিনি বড়। কবিতা, গান, অনুবাদ সব মিলিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বড়ো মাপের কবি। তাঁকে সাধারণত ছন্দের জাদুকর বলা হয়। এই উপাধিটি রবীন্দ্রনাথই তাঁকে দিয়েছেন। কিন্তু প্রায়শ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাম্যের চেতনার বিষয়টি আলোচনায় আসেনা। তিনি হিন্দু ধর্মের জাত পাতের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, নারী পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর 'সাম্যসাম' কবিতাটি সাম্যবাদী চেতনায় পরিপূর্ণ। গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিম যেমন সাম্যের চেতনা প্রথম তুলে ধরেছেন, তেমনই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই কাব্যের জগতে প্রথম সাম্যবাদী চেতনা নিয়ে এসেছেন। তাঁকে নজরুলের পূর্বসূরীও বলা যায়।

জাত পাত সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মানব জাতির জয়গান গেয়েছেন–

"জগত জুড়িয়া আছে এক জাতি
সে জাতির নাম মানুষ জাতি"

পরবর্তীকালে নজরুলের 'সাম্যবাদ' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে একই স্বাদ পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শোষিত মানুষের পক্ষের কবি, সাম্যের কবি, ক্ষুধিত মানুষের ব্যথা তাঁর কবিতার ফুটে উঠেছে। যেমন–

ক্ষিদের জ্বালায় জোয়ান মেয়ে দেছে সেদিন গলায় দড়ি
ক্ষিদের জ্বরে কচি কাঁচা মরছে নিত্য ঘড়ি ঘড়ি"

এর সঙ্গে তুলনীয় নজরুলের কবিতার একটি লাইন-
"হাঁড়ির পানিতে টগবগ করে ফোটে জননীর ব্যথা।"
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আরও লিখেছেন
"নারী ও শুদ্র নহেক ক্ষুদ্র হেলার জিনিস নহে,
দেহ তাহাদের আগুনের আগে তোমাদেরই মত দহে;"

BanglaBook.org

তাঁর 'সহমরণ' কবিতাটির মর্মবস্তু সেদিনকার সমাজে প্রগতিশীল উপাদান যুক্ত করেছিল। এই কবিতায় একটি গল্প রচনা করা হয়েছে। মৃত স্বামীর চিতা থেকে সদ্য বিধবা এক নারী জলে ঝাপিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। এই দুর্ভাগা অর্ধদগ্ধ নারীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল এক মুসলমান মাঝি। পরবর্তীতে ঐ হিন্দু বিধবা ও মুসলমান মাঝির মধ্যে প্রেম হয় এবং তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের জীবন সুখে সাচ্ছন্দেই কেটেছিল। সেদিনের সমাজে এই রকম দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সহজ ব্যাপার ছিল না। এমন বলিষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ইতিবাচক উপাদান যোগ করে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও মার্কসবাদের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। পরবর্তীতে নজরুল একদিকে সাম্যবাদী চেতনাকে অনেক বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, অপরদিকে মার্কসবাদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছন, যদিও মার্কসবাদ তিনি ভালোভাবে বুঝেছেন এমনটি নয়। তবু মার্কস তাঁর কাছে ঋষি, পথপ্রদর্শক। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর রাজনৈতিক বন্ধু। লালফৌজের বিজয়ে তিনি উল্লসিত।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মার্কসবাদী কবি হলেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। বিষ্ণু দে প্রকাশ্যেই মার্কসবাদের প্রতি আস্থা ঘোষণা করেছেন। তিনি ছিলেন মজুর কিষাণের কবি। মজুর কিষাণরা ইতিহাসে নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটাবে, এই আস্থা রেখে তিনিই প্রথম বলেছেন,

"বহু বঞ্চনা বহু অনাদরে
অমর প্রাণ
বীর দলে চলে হাজারো মজুর
লাখো কিষাণ।"

তবু একথা বলতে হয় যে নজরুলের মত বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি সাম্যবাদের গান গাইতে পারেননি। নজরুলের মতো বিদ্রোহী কবিও ছিলেন না। তাঁর কবিতায় উচ্চমাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটি পাওয়া যায় এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আছে তা অনেকাংশে সত্যও বটে। তিনি পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ অথবা তার বিপরীতে সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক কৃষকের সংগ্রাম এই সকল বিষয়কে কবিতায় রূপকের আকারে ব্যবহার করেছেন। অনেক পৌরাণিক কাহিনি, রূপক ও চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন আজকের সাম্রাজ্যবাদ শাসিত বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য। অবশ্য তাঁর

BanglaBook.org

আগে নজরুল এবং পরে সুকান্ত এই সকল বিষয় কবিতায় তুলে এনেছেন অনেক স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ ভাষায়।

সাহিত্য সমালোচকরা তিরিশের দশকের পাঁচজন কবির নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করেন। তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমীয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশ। এঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে-ই একমাত্র ব্যতিক্রম, যিনি মার্কসবাদী। বাকী চারজন বিশ্বাস করতেন 'Art for art's sake'। তাঁদের মধ্যে প্রগতিশীল উপাদান কোথায় আছে তা খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। তাঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত, পাশ্চাত্যের সাহিত্যে তাঁদের প্রত্যেকেরই গভীর জ্ঞান ছিল। কিছুটা তৎকালীন পাশ্চাত্যের সাহিত্য দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই সময় ইউরোপে অমঙ্গলবোধ, জীবনের অনেক নোংরা, অসুন্দর চিত্রকে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন রোমান্টিকতার পরবর্তী যুগে অমঙ্গলবোধই হচ্ছে আধুনিক বিশ্ব কবিতার প্রধান বিষয়। ফ্রান্সের কবি বদলেয়ার আনলেন 'কাউন্টার রোমান্টিকতা'র যুগ। কাব্যে বদলেয়ারই আধুনিকতার পথিকৃত। এই সবই ছিল তিরিশের দশকে তথাকথিক আধুনিক কবিদের অভিমত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও রোমান্টিক কবি এবং সুন্দরের পূজারী বলে মনে করতেন। তাঁরা কবিতায় অসুন্দরের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র বিরোধীতার নামে আধুনিকতার যুগ আনতে চেষ্টা করেছেন। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে তাঁরা রবীন্দ্রবিরোধীতার নাম করে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাছেই আত্মসমর্পন করেছেন। রোমান্টিসিজমের বিরোধীতার কথা বলে নিজেরাই রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন। অবশ্য জীবনানন্দ দাশ একটু ব্যতিক্রম এবং নিসন্দেহে তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তিরিশের দশকেই এই কবিরা এজরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট প্রমুখ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আমরা জানি এজরা পাউন্ড ফ্যাসিবাদের সমর্থক হয়েছিলেন, টি এস এলিয়ট খ্রিষ্ট ধর্মকে আদর্শায়িত করে কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাই একথা বলা যায় যে, তিরিশের দশকের এই কবিরা প্রতিভাবান হলেও, তাদের কাব্যে শিল্পগুণ উন্নত মানের হলেও, শব্দ প্রয়োগ ও কাব্যে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনলেও সমাজ জীবনে তাঁদের কোন ইতিবাচক প্রভাব ছিল না। হয়ত সমাজ নিয়ে তাঁরা মাথাও ঘামাতেন না।

বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) কবিতা ও গদ্যে আমরা প্রধানত দেখতে পাই নারী দেহের প্রসঙ্গটি এবং প্রেমের দেহী রূপ। এদিক দিয়ে তিনি ইংল্যান্ডের কবি ডি এইচ লরেন্সের কবিতা দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত

BanglaBook.org

হয়েছিলেন। নারীর দেহরূপ ফুটিয়ে তুলতে তিনি যেসকল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন সেখানেও পাশ্চাত্যের কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'চুল' শীর্ষক কবিতাটি'র সঙ্গে শার্ল বদলেয়ারের একটি কবিতার আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব বসুর সবেচেয়ে বড়ো অবদান হলো এই যে, তিনি বহু কবি ও সাহিত্যিককে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনানন্দ দাশকেও তিনিই পরিচিত করিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি, তবে নৈরাশ্যবাদে ভরপুর তাঁর কবিতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'উটপাখি'তে নিষ্ফলা যুগের সেই মানুষকেই অঙ্কিত করেছেন টি এস এলিয়ট যাকে বলেছেন Hollow Man। এই কবিতায় আমরা দেখি পলায়নী মনেবৃত্তি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মবিলাপ। কালের প্রভাব সব কবিদের উপরই পড়ে। কিন্তু একেকজন একেকভাবে প্রভাবিত হন। তিরিশের দশকে কাল প্রবাহের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দেখেছেন কেবল নৈরাজ্য, ধ্বংস আর হতাশার দিক। বিপ্লবী চেতনার উত্থান যে ঘটছে তা তাঁর নজরে পড়েনি। যেটা পড়েছিল বিষ্ণু দে বা নজরুলের চোখে।

সাম্যবাদী বিপ্লব সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে বিভীষিকাসম। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, অনেক কমিউনিস্ট কর্মী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক সংঘের নিখিল ভারত সম্মেলনে তিনি সভাপতিমণ্ডলীতেও ছিলেন।

অমীয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) শুধু প্রতিভাবান কবি নন, তাঁর ছিল বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা। ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরেছেন অনেকবার, আমেরিকায় থেকেছেন অনেকদিন। দেখেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানুষের দুর্ভোগ, অনিশ্চয়তা, অসহায়ত্ব। এসব ঘটনা তাঁর কবিতায় দেখা যায়। কিন্তু সেখানে আছে কেবল নৈরাশ্যই। তিরিশের দশকে একদিকে যেমন ছিল ফ্যাসিবাদের উত্থান, অপরদিকে তেনমই ছিল বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের সাফল্য ও সম্ভাবনা। সেই সময় অনেক সংবেদনশীল মানুষ, কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লব ও মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অমীয় চক্রবর্তী পথ খুঁজলেন, বিপ্লবের পথে নয়, গান্ধীবাদের পথে। তিনি গান্ধীর সঙ্গে কোলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ভ্রমণ করেছিলেন। অমীয় চক্রবর্তীর কাব্যের একটি বিশেষ দিক হলো আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর প্রেম। তবে তাঁর ঈশ্বর হলো

BanglaBook.org

অনেক বেশি মানবিক চরিত্রের, এই ধুলো মাটির পৃথিবীতেই, মানব সংসারের মধ্যে যে ঈশ্বর অবস্থান করেন।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের পরই জীবননান্দের নাম উচ্চারিত হয়। তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। এই ছবি দেশপ্রেম জাগ্রত করে। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

চল্লিশের দশকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রবল গণ আন্দোলন, দাঙ্গা এসব কোনো কিছুই এই প্রতিভাবান কবির কবিতায় ধরা পড়ে না। সমাজ চেতনা তাঁর কবিতায় নেই বললেই চলে। তবু দু'এক জায়গায় ছিটে ফোঁটা কিছু পাওয়া যায়। যেমন 'শকুন' কবিতাটি। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে তিনি দেখেছেন 'এশিয়ার মাঠে চড়া' শকুনের প্রতীকে। 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থে তিনি দেশবন্ধু, বিবেকানন্দ, পতিতা ইত্যাদি কবিতা লিখেছেন। নিপীড়িত মানবতার বেদনাও তিনি অনুভব করেছেন কোন কোন কবিতায়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্র আছে 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাঁর কবিতায় আমরা বাংলাদেশকে পাই। বাংলাদেশকে তিনি ভালোবেসেছেন এবং ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিনি এই বাংলাদেশেই আসবেন, বারবার ফিরে ফিরে আসবেন। হয়তো মানুষের বেশে নয়, অন্যকিছু হয়ে, তবু আসবেন সেই ধানসিঁড়ি নদীটির পাড়ে। তাঁর কবিতায় বাঙালি জাতির কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি একটি বিনম্র কণ্ঠস্বরে। সেইজন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের পাশাপাশি জীবনানন্দের কবিতাও পঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে।

১০.

বিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকে আরেকজন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব ঘটে। জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। ১৯২৫ সালে জসীমউদ্‌দীন যখন মাত্র বি.এ. ক্লাসের ছাত্র তখনই কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর একটি অসাধারণ কবিতা 'কবর'। কবিতাটি তখনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। তার ভাষা, তার ভাব, সুর, স্বাদ, গন্ধ একেবারে আলাদা,

BanglaBook.org

একেবারেই নতুন। যার মধ্যে রাবীন্দ্রিক প্রভাবও নেই, পাশ্চাত্যেরও কোন প্রভাব নেই।

জসীমউদ্‌দীনকে পল্লীকবি বলা হয়। সাধারণত পল্লীকবি বলে যারা পরিচিত, বাংলার গ্রামেগঞ্জে গান গেয়ে বেড়ান, তাদের মতো তিনি নন। তাঁর সাহিত্যে আছে মার্জিত রূপ এবং নান্দনিক উৎকর্ষতা। বাংলা ভাষায় গ্রাম নিয়ে কবিতা লিখেছেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আছে গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, কিন্তু গ্রামের মানুষের কথা নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে গ্রামের দরিদ্র মানুষ তেমন না থাকলেও তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্প গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়েই। গরিব, শ্রমজীবী, তুচ্ছ বালক বালিকা, জমিদার-প্রশাসনের ও সামাজিক নিপীড়নের দ্বারা নির্যাতিত গ্রাম্য নর নারীর বেদনাসিক্ত কথা আছে সেইসব গল্পে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই গ্রামের মানুষকে একটু দূর থেকে দেখেছেন। কারণ তিনি ছিলেন জমিদার। অন্যদিকে জসীমউদ্‌দীন তাঁর কবিতায় দরিদ্র কৃষক ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথা ফুটিয়ে তুলেছেন পরিপূর্ণ রূপে, সহজ সরল ভাষায়, যা অনেক বেশি আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামের চাষাভূষা মানুষের দারিদ্রের কথা আছে কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম নেই।

জসীমউদ্‌দীন কয়েকটি কাহিনিভিত্তিক কাব্য রচনা করেছেন যার মধ্যে 'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুটিই প্রেমের কাহিনি। এখানে নায়ক নায়িকা কেউ ধনী ঘরের সন্তান নয়, শিক্ষিতও নয়। একেবারে চাষার ছেলে। নায়ক নায়িকার উভয়েরই গায়ের রং কালো। তবু জসীমউদ্‌দীন তাদের দৈহিক সৌন্দর্যকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা নাগরিক সভ্যতার মানুষের কাছে অপরিচিত। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে চাষার ছেলের এরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় না। জসীমউদ্‌দীন দৈহিক বিবরণের তুলনীয় হিসেবে এনেছেন কাঁচা ধান, জালি লাউ, নবীন তৃণ, তমাল তরু, ইত্যাদি যা কৃষকের প্রাত্যহিত জীবনের সামগ্রী। জসীমউদ্‌দীনের নায়ক চাষার ছেলে, কালো যার গায়ের বর্ণ, সে শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, তার গুণও আছে অনেক। শুধু লেখাপড়া জানলেই কি গুণী হওয়া যায়? 'নকশী কাঁথার মাঠে'র নায়ক চাষার কালো ছেলে ভালো ঘর ছাইতে জানে, আবার এই হাত দিয়ে সড়কিও চালাতে জানে। ভালো বাঁশি বাজায়, গান গায়। ঘর ছাইতে জানাকে কবি একটা বড়ো গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যাকে তথাকথিত

BanglaBook.org

শিক্ষিত সমাজ, বুর্জোয়া সামন্ত সমাজ তুচ্ছ কাজ বলে মনে করে। এখানেই জসীমউদ্‌দীন এনেছেন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নতুনত্ব। শক্তিশালি করেছেন প্রগতির ধারাকে এবং নিজেও স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন।

নায়িকা সাজু, তারও গুণ আছে নানা ধরণের। সে হাঁড়ির উপর ছবি আঁকতে জানে, সিকায় ফুল তুলতে তার জুড়ি নেই। গ্রামীণ সমাজ ও চাষার জীবন সম্পর্কে শহুরে মানুষ অথবা অর্থবিত্ত ও শিক্ষার দম্ভে অন্ধ লোকের মধ্যে তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে যাকে জসীমউদ্‌দীন অজ্ঞতা বলেই চিহ্নিত করে কটাক্ষ করেছেন কোনো কোনো কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে নতুন।

'নকশী কাঁথার মাঠ' বহু বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং খ্যাতি লাভ করেছে। এইভাবে জসীমউদ্‌দীন শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নয় সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রেও যে প্রগতিশীল অবদান রেখেছেন তা অতীব মূল্যবান। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' একটি ট্র্যাজিক প্রেমের কাহিনি। এখানে কবি দরিদ্র মুসলমান তরুণের সঙ্গে হিন্দু নমঃশুদ্র তরুণীর এক অমর প্রেমের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সামাজিক বাস্তবতার কারণে এই প্রেমের কাহিনি ট্র্যাজিডি হতে বাধ্য। কিন্তু যে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি কবি তুলে ধরেছেন তা পাঠকের মনেও নাড়া দেয় এবং এই প্রেমের প্রতি সমর্থন আদায় করে। এইভাবে সেই যুগে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যগ্রন্থে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির এক মহান দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। আর তাই এটি একটি মহৎ কাব্যে পরিণত হয়েছে। জসীমউদ্‌দীন দেখিয়েছেন সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অন্যায়ের সামাজিক বাধার উপরে রয়েছে মানব হৃদয়, নর নারীর প্রেম।

জসীমউদ্‌দীন জমিদারদের শোষণ ও শয়তানীর চিত্রকেও তুলে ধরেছেন এবং তাঁর পক্ষপাতিত্ব রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি। সাধারণভাবে জসীমউদ্‌দীন গরিব শ্রেণীর উপর নির্যাতনের চিত্র এঁকেছেন যা পাঠকের মনে গভীর বেদনা সৃষ্টি করে, কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম তিনি দেখান নি। প্রতিবাদও তেমন করেননি, করলেও তার ভাষা ছিল মৃদু। তবে পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে (১৯৫১ সালে) তিনি 'মাটির কান্না' শীর্ষক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেখানে কৃষকের উপর শোষক শ্রেণীর অত্যাচার-শোষণের চিত্র যেমন আছে, তেমনই আছে কঠোর প্রতিবাদের ভাষা। ১৯৫৯ সালে এই কাব্যগ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনুদিত হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রীদের মনকে স্পর্শ করেছিল।

BanglaBook.org

সরকারি চাকরি করলেও জসীমউদ্‌দীন স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পাননি। তিনি ভাষা আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। বামপন্থীদের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি ছিল। সেভিয়েত ইউনিয়ন সফর করে ১৯৬৮ সালে তিনি লিখেছেন তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা- 'যে দেশে মানুষ বড়' শীর্ষক গ্রন্থ। সমাজতন্ত্রের সাফল্য তাঁকে অভিভূত করেছিল।

১১.

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নজরুল থেকে সুকান্ত পর্যন্ত সাম্যবাদী কাব্যের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। বস্তুত সমাজ জীবনে সাম্যবাদী ধ্যান ধারণার ও চেতনার উন্মেষ ও বিস্তার ঘটেছিল বলেই সেই সময় এক সমৃদ্ধ সাম্যবাদী সাহিত্য রচিত হতে পেরেছিল। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুলকে প্রথম সাম্যবাদী কবি বলা যেতে পারে। বিষ্ণু দে ছিলেন প্রথম মার্কসবাদী সাম্যবাদী কবি। এরপরে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে তিনজন কবির নাম উল্লেখ করতে হয়– দীনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৬৫), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। সুকান্ত ভট্টাচার্যই এ যাবত বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী কবি।

দীনেশ দাস ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন এবং মার্কসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪২-৪৩ সালের দিকে জনযুদ্ধের যুগে পার্টির সঙ্গে তাঁর মতভেদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনওই মার্কসবাদী মতাদর্শ পরিত্যাগ করেননি। ১৯৩৬ সালে 'কাস্তে' নামে তাঁর একটি কবিতা ছাপা হলে তা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। কবিতার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত হলো–

"বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল আর বম্ হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আর নহে তো
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে।"

BanglaBook.org

মার্কসবাদী নন এমন বহু কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক এ কবিতাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১৯৪২ সালে সেই সময়ের রাজনৈতিক

পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, কালো বাজার, সরকারি ঔদাসীন্য, পাশাপাশি গান্ধীজি'র 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি করে তিনি লিখেছিলেন 'ভুখা মিছিল' কাব্যগ্রন্থটি। মুসোলিনি ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে তার প্রতবিাদে তিনি লিখেন 'ইথিওপিয়া'। গান্ধীজির 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সমর্থনে তিনি লিখেছিলেন 'ভারত ছাড় ১৯৪২' কবিতাটি। কাস্তের পাশাপাশি 'হাতুড়ি' নামেও তিনি একটি কবিতা লেখেন যে কবিতায় পুঁজিবাদ বিরোধী মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সমর সেনের কাব্য রচনা কাল খুব সংক্ষিপ্ত- ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত। এই সময় তিনি মাত্র চারটি ক্ষীণকায় কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থটি কমরেড মুজফ্ফর আহমদের নামে উৎসর্গ করেছিলেন ১৯৩৭ সালে। অনেক পরে, ১৯৫৪ সালে, গদ্যে লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বাবু বৃত্তান্ত'। একসময় তাঁর উপর এজরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট, ইয়েটস প্রমুখ কবিদের প্রভাব ছিল। কিন্তু তা খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। অল্প বয়সেই তিনি মার্কসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। লেনিন-স্তালিনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। তবে তিনি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। কারণ তিনি মনে করতেন, পার্টির সভ্য হওয়ার জন্য যে পরিমাণ শ্রেণীচ্যুত হওয়া দরকার তা তিনি হতে পারেননি। তিনি নিজেকে বিপ্লবী এমনকি বামপন্থী কবি বলেও দাবি করতেন না। তবে তিনি নিজেকে মার্ক্সিস্ট বলে দাবি করেছেন। এক কবিতায় তিনি লেখেন 'আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট'। কবিতাটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। কবিতার নামও 'বাইশে শ্রাবণ'। কবিতার একটি স্তবক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"লেনিন, স্ট্যালিন, জুখভ ও গোর্কি
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দু-নৌকার যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।"

কবি সমর সেন উচ্চস্বরে কথা বলেন না, কিন্তু ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় পুঁজিবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও তিনি ক্রিটিক্যাল। গান্ধী'র রাজনীতির প্রতি সন্দিহান। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ও চীনের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল। স্তালিনগ্রাদে লালফৌজের বিজয়ের পর

BanglaBook.org

উল্লসিত হয়ে কবিতা লেখেন 'স্তালিনগ্রাদ'। 'ইতিহাস' কবিতায় তিনি লিখেছেন-

"ধানক্ষেতে কাস্তে হাতে কিষাণ
হাতুড়ি বাজে কামারশালে
সবুজ আগুন জ্বলে অনেক মাঠে।"

কয়লা শ্রমিকের দুঃসহ জীবনের ছবি আছে 'মহুয়ার দেশ' কবিতায়। 'নাগরিক' কবিতায় আছে পাটকলের শ্রমিকদের প্রতি গভীর সহানুভূতি। বুর্জোয়া রাজনীতির ক্লিবত্বকে তিনি ব্যাঙ্গ করেছেন তীক্ষ্ণ ভাষায়। তাদের মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির মুখোশও উন্মোচন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে সমর সেন অত্যন্ত সৎ, আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে সমর সেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। যদিও উচ্চমাত্রার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ছিল যথেষ্ট। মেধা ও যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু নীতির প্রশ্নে তিনি কখনও আপোষ করতে পারেননি। এজন্য আর্থিক কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি নিজেই ফ্রন্টিয়ার নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এটি চালানো বেশ কঠিন ছিল। কারণ সরকারি নির্যাতন ও আর্থিক অভাব। প্রিয়জনদের কাছ থেকে চাঁদা ও ঋণ নিয়ে খুব নিষ্ঠা সহকারে এই পত্রিকাটি তিনি চালিয়ে আসছিলেন। পত্রিকাটি বামপন্থী মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। নকশাল আন্দোলনের প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল, যদিও নকশাল আন্দোলনের দুর্বলতা ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সভ্য ছিলেন। একই সঙ্গে পার্টির কাজ ও সাহিত্য চর্চা তিনি চালিয়ে গেছেন। ১৯৪৬ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', সব কয়টিই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। এছাড়াও তিনি লিখেছেন ছোটগল্প, গান, নাটক ও ছড়ার বই। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বলেছিলেন 'কিষাণের জীবনের শরিক' 'মাটির কাছাকছি যে কবি' 'সে কবির বাণী-লাগি আমি কান পেতে আছি' (ঐকতান, জন্মদিনে)। সম্ভবত সুকান্তই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই কাঙ্খিত কবি। তবে সুকান্তকে দেখার বা তাঁর

BanglaBook.org

কাব্য পাঠ করার সুযোগ হয়নি রবীন্দ্রনাথের। কারণ ১৯৪১ সালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সুকান্ত কমিউনিস্ট হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি তিনটি কবিতা লিখেছিলেন।

সুকান্ত মার্কসবাদী কবি, শ্রমজীবী মানুষের কবি, সংগ্রামের কবি। প্রতিটি কবিতায় মার্কসীয় চিন্তাধারার ছাপ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে নান্দনিক বিচারেও তিনি খুব বড়ো মাপের কবি। তিনি যে প্রতিভাবান ছিলেন সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন অকমিউস্টি কবি বুদ্ধদেব বসুও। সুকান্তের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছেন, "রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য।" একই লেখায় তিনি একটি 'কঠিন, সংকীর্ণ, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ' এর প্রতি সুকান্তের যে আস্থা ছিল সেটাকেও সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য সেই 'তথাকথিত' বৈজ্ঞানিক মতবাদ যে মার্কসবাদ তা না বোঝার কোন কারণ নেই। বুদ্ধদেব বসুর মত কবিরা ছিলেন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, সংগ্রাম বিমুখ, 'art for art's sake' তত্ত্বে বিশ্বাসী, এক ধরণের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতায় মগ্ন। তাই মার্কসবাদকে নিয়ে এমন তাচ্ছিল্য করতে পেরেছেন।

সুকান্তের সঙ্গে নজরুলের বেশ মিল পাওয়া যায়। সুকান্তের একটি অসাধারণ কবিতা 'বোধন' (ছাড়পত্রে অন্তর্ভূক্ত) থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে যার সঙ্গে বিদ্রোহী সাম্যবাদী কবি নজরুলের প্রকাশভঙ্গির কিছুটা মিল পাওয়া যেতে পারে–

'শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার।
তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার?
'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি
সে কথা আমি কি জীবনে মরণে
কখনও ভুলিতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।'

সুকান্তের লেখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে আমাদের প্রতিদিনের দেখা সামান্য জিনিস যথা সিগারেট, দেশলাই ইত্যাদি এই সকল জিনিসকে

BanglaBook.org

প্রতীক বানিয়ে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন ও বিপ্লবী সামাজিক চেতনা তুলে ধরেছেন। একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার কার্ণিশের ধারে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখে কবির মনে হয়েছে–

'মনে হয়, এইসব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।'

চল্লিশের দশকের কালের প্রবাহ, বিভিন্নমূখী ঘটনাবলি তাঁকে প্রভাবিত করেছে, আলোড়িত করেছে। সমাধানের জন্য তিনি গেছেন লেনিনের কাছে।

"লেনিন ভেঙেছে রুশ জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
অন্যায়ের মুখোমুখ লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
... ...
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।"

জনযুদ্ধের যুগে তিনি পার্টির লাইনের সমর্থক ছিলেন এবং গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগদান করেননি। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। ১৯৪৫ সালে মে দিবস উপলক্ষে রচিত 'ঐতিহাসিক' কবিতায় লালফৌজের বিজয়কে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ১৯৪৩ সালে রোমের শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মুখে ইতালির ফাসিস্ত মুসোলিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুকান্ত লিখলেন 'রোম ১৯৪৩'। ১৯৪৫-এর ২৮ এপ্রিল মুসোলিনি জনতার হাতে ধরা পড়েন এবং জনতা তাকে রাস্তার পাশে লাইট পোস্টে বেঁধে হত্যা করে। এই ঘটনাকে সুকান্ত তুলে ধরেছেন 'চিল' কবিতায়। 'চিল' হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক, মৃত চিল পড়ে আছে রাস্তার ফুটপাতে। সুকান্ত অনেকগুলি ছড়া ও ধাঁধা ধরণের কবিতা লিখেছেন যার মধ্য দিয়ে শ্রেণী চেতনাকে উন্নত করা যায়।

সুকান্তের কবিতা এতই সহজ ও প্রত্যক্ষ যে তা খুব সহজেই পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। যাকে ইংরেজ কবি Wordworth বলেছেন "Felt in the blood and felt along the heart."

ওয়ার্ডসওয়ার্থ Preface to Lyrical Ballad এ প্রকৃত কবির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে "He is a man speaking to men" অর্থাৎ মানুষের কবি। সুকান্ত ছিলেন প্রকৃত অর্থেই মানুষের কবি।

BanglaBook.org

চল্লিশের দশকে অর্থাৎ সুকান্তের যুগে বাম প্রবণতা সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দারুণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সেই সময় বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান কমিউনিস্ট কবি ও লেখকের সাক্ষাত আমরা পাই। তাদের মধ্যে সোমেন চন্দ (ইতিপূর্বেই তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে), কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবি গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর স্তুতি করেও কবিতা লিখেছেন। সংগ্রামী ও নির্যাতিতা নেত্রী ইলা মিত্রকে নিয়ে (পঞ্চাশের দশকে) গোলাম কুদ্দুসের কবিতা যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবিতাটি কাব্যগুণেও সমৃদ্ধ।

সেই সময় স্তালিনের নেতৃত্বে লাল ফৌজের বিজয় এবং মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব ভারতবর্ষসহ সারা পৃথিবীতে প্রগতিশীল মানুষের মনে প্রবল আশাবাদ জাগ্রত করেছিল। বাংলাদেশেও বামপন্থী প্রবণতা জোরদার হচ্ছিল।

একই সঙ্গে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের আক্রমণও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। অনেকে পার্টির জনযুদ্ধের লাইন সমর্থন করতে পারেননি। তাছাড়াও কবি সাহিত্যিকদের একটা অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথও একসময় (বিশের দশকে) বলশেভিকবাদকে গুণ্ডাতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করতেন। পরে ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের পর তাঁর মতের পরিবর্তন হয়।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, "সাম্য মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্যায়ে।" এরচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য আর কী হতে পারে! তিনি আরও বলেছিলেন, "It is very difficult to choose between communism and fascism." তবে সেই সময়ের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে তীব্র সমাজতন্ত্রবিরোধীর সংখ্য খুব বেশি ছিল না। বরং সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ ও সংগ্রামী মেজাজটাই বেশি করে সামনে এসেছিল। গান্ধীর মতো বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতা এটা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। ১৯৪০ সালে গান্ধীজি বলেছিলেন যে, দেশে এখন সংগ্রামী মেজাজ আছে জেনেও তিনি 'লাল সর্বনাশ' টেনে আনতে দেবেন না। (অবশ্য দুবছর পরই তিনি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন do or die)

BanglaBook.org

চল্লিশের দশক একদিকে যেমন গণ আন্দোলনে ভরপুর ছিল, অপরদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করতে এবং সাময়িকভাবে হলেও পাকিস্তানের মতো প্রতিক্রিয়াশীল স্রোতে মুসলমান জনগণকে ভাসিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। তবে সেই পাকিস্তান এক প্রজন্মের বেশি টেকেনি। সাধারন মুসলিম জনগণের দ্রুতই উপলব্ধি হয়েছিল যে তারা বৃটিশের বদলে আরেকটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। শীঘ্রই তারা রুখে দাঁড়ায় পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে যার সূচনা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং যার পরিণতি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। তাই দেখি সুকান্তের সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে–

"হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছাসে
সে কোলাহলে রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।

....

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

BanglaBook.org

পরিচ্ছেদ ষোলো

সাম্প্রদায়িকতা, পাকিস্তান আন্দোলন ও দেশ ভাগ

জাতি এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। ব্যক্তিজীবনে সেক্যুলার মহম্মদ আলী জিন্না নিজেও জানতেন ধর্মের ভিত্তিতে জাতি বা জাতীয় রাষ্ট্র হতে পারে না। তবু ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য তিনি বলেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি। বৃটিশ শাসকরাও এই তত্ত্বটি লুফে নিয়েছিল। Divide and Rule, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ, এর উপর ভিত্তি করে তারা দুইশ' বছর দেশ শাসন করেছিল। চলে যাবার প্রাক্কালেও (সেদিনের বাস্তবতায় ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন পথ ছিল না) তারা সেই একই নীতি প্রয়োগ করে গেল। কংগ্রেস নেতৃত্বও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ও দ্রুত ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খায় ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছিল। সম্ভবত একমাত্র গান্ধী ভারত বিভাগ চাননি। কিন্তু একে ঠেকানোর কোনো ক্ষমতা তখন তাঁর আর ছিল না।

ভারত একটি বহুজাতিক দেশ। বহুজাতিক দেশে জাতি সমস্যার সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সমাধান দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তা হলো প্রধানত ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন রাজ্য নিয়ে এবং সকল রাজ্যের সম অধিকারের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ফেডারেশন গঠন। ভাষাভিত্তিক (ধর্ম ভিত্তিক কখনওই নয়) প্রত্যেকটি রাজ্যের হাতে থাকবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই বৈজ্ঞানিক সমাধানই ভারতের জাতি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তুলে ধরেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি কংগ্রেস তা মানেনি। তারা চেয়েছিল বিপুল ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। বরং বলা যায় মুসলিম লীগ কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রীয়

BanglaBook.org

ধারণা এবং মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলোর জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষাবলম্বী ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন শুধু নয়, একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি তুলল, যা হলো পাকিস্তান। পাকিস্তানের দাবি যখন কার্যকর হতে চলেছে তখন আবার কংগ্রেস দাবি তুলল ভারত ভাগ হলে বাংলা ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে। ভারত ভাগের ভিত্তি যেমন সাম্প্রদায়িকতা, কংগেসের দাবি অনুযায়ি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের ভিত্তিও একই সাম্প্রদায়িকতা। এমনকি যখন স্বাধীন স্বতন্ত্র যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উঠেছিল কংগ্রেস তাতেও আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ সেই স্বাধীন যুক্ত বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হবে। এক্ষেত্রেও কংগ্রেসের নীতি ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং সাম্প্রদায়িক ধারণা দ্বারা আচ্ছন্ন।

জাতি সম্পর্কে স্তালিন যে সংজ্ঞা দিয়েছিলন যা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছিল সেটিই সবচেয়ে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। তা হলো–

"জাতি হলো ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত এমন একটি স্থায়ী জনসমাজ যাদের ভাষা এবং বাসভূমি এক, অর্থনৈতিক জীবন এক, মানসিক গড়ন এক এবং এই মানসিক গড়ন একটি সাধারণ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়।" (স্তালিন-মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা)

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শেষ মুহূর্তে ধর্মভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র গঠন অর্থাৎ পাকিস্তান পরিকল্পনা ও ভারত বিভাগ বৃটিশ শাসক, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস মেনে নিলেও ইতিপূর্বে তাদের চিন্তা ও বক্তব্য ছিল ভিন্ন রূপ। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ মন্ত্রীসভার তিন সদস্য বিশিষ্ট ক্যাবিনেট মিশন পাকিস্তান দাবিকে নাকোচ করে বলেছিল, "পাঞ্জাব এবং বাংলাকে আগাগোড়া ভাগ করা হলে সেটা সেই প্রদেশগুলোর খুব বেশি সংখ্যক অধিবাসীর ইচ্ছা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে হবে, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রত্যেকের একই নিজস্ব ভাষা, দীর্ঘদিনের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য আছে।" (সুনীতি কুমার ঘোষ– 'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি', তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১৭)

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি যে একটি জাতি তা গান্ধী-নেহেরু-জিন্না সকলেই ইতিপূর্বে স্বীকার করেছিলেন। গান্ধী বলেছিলেন, "ধর্মের প্রভেদ দুজনকে [বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানকে] পৃথক করতে পারে

BanglaBook.org

না... তারা একই ভাষায় কথা বলেন, একই সংস্কৃতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। যা কিছু বাংলার আছে তা উভয়েরই এবং তার জন্য উভয়ে গর্ববোধ করতে পারেন। বাংলা বাংলাই (Bengal is Bengal)"(সূত্র ঐ)। নেহেরু বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের কোথাও বাংলার মত দৃঢ় সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ অঞ্চল নেই (সূত্র ঐ)।" জিন্না বলেছিলেন "বাংলা ও পাঞ্জাব-প্রত্যেকেরই একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে: এক ইতিহাস, জীবনযাত্রার একই পদ্ধতি... (সূত্র ঐ)।"

সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজে দুই বা তদাধিক শ্রেণী থাকে। কোনো কোনো জাতীয় রাষ্ট্রে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকতে পারে। যেমন ছিল ভারতবর্ষে। আবার এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনও থাকে। যেমন হিন্দু সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ আছে। মুসলিম সমাজেও আশরাফ ও আতরাফ– এই বিভাজন ছিল এবং এখনো কিছু পরিমাণে আছে। কিন্তু এসব জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের কোনো ভিত্তি হতে পারে না। আমরা দেখেছি হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত মানুষ একত্রে সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে। বড়ো বড়ো রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে। তবে বিবাহ, খাদ্য গ্রহণ এই ধরণের কিছু বিষয়ে পার্থক্য আছে । আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্য থেকে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাদের ভাষা কৃষ্টি লোকায়াত সংস্কৃতি একই রয়ে গেছে, যেগুলো হচ্ছে একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য। তবে বহু শতাব্দী পাশাপাশি বাস করার পরও এবং একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকার পরও এই পার্থক্যগুলো কেন রয়ে গেছে, তা একটি গভীর গবেষণার বিষয় যা এই গ্রন্থের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, "ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলামানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল।" (কালান্তর)

(রবীন্দ্রনাথ এখানে জাত বলতে জাতি বা নেশন নয়, তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন)

এই বিভেদকেই কাজে লাগিয়ে বৃটিশরা দুইশ বৎসর রাজত্ব করেছিল।

BanglaBook.org

উনবিংশ শতাব্দীতে তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

বৃটিশ এই দেশ দখল করার পর থেকেই কৃষক ও শ্রমজীবী হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধ (সিপাহী অভ্যুত্থান) তার প্রমাণ। কিন্তু উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্ত হিন্দু, যারা ছিল জমিদার অথবা মুৎসুদ্দি এবং যাদের একটা অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দু সমাজে ও বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ এনেছিলেন তারা কিন্তু প্রথম থেকেই বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ছিলেন (অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ছিল)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তারা রাজভক্ত ও জমিদার প্রথার সমর্থক হলেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন (যদিও সেটাও ছিল খণ্ডিত)। দুর্ভাগ্যক্রমে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল যে উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই ধারার একটি বড়ো অংশ হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের প্রধান প্রবক্তা, যদিও প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষের কথা বলেছিলেন। অন্যদিকে অভিজাত মুসলমানরা যারা আশরাফ বলে পরিচিত এবং মুসলিম সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতারা প্রথম থেকেই ছিলেন বৃটিশ বিরোধী। তাদের ক্ষোভ ছিল ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল। উত্তর ভারতের দেওবন্দে অবস্থিত ধর্মীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দার-উল-উলুম ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দেশকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার বক্তব্যও রাখত। উত্তর ভারতে বেরিলির সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভি ও তার অনুগামীরা ভারতে পুনরায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন শুরু করেন তাকে ওয়াহাবি আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই আন্দোলন এক পর্যায়ে শিখদের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত হয়। শিখ বিরোধী যুদ্ধেই তিনি নিহত হয়েছিলেন। ১৮৭২ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান জেল পরিদর্শন করতে গেলে শের আলী নামে এক ওয়াহাবি তাকে হত্যা করে। সেইজন্য তার ফাঁসি হয় এবং তিনি শহিদের মর্যাদা অর্জন করেন। ইতিপূর্বে আমরা বাংলায় তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ফরাজি আন্দোলনের বিষয়ে জানতে পেরেছি। অবশ্য ফরায়েজি সংগ্রাম ও তিতুমীরের যুদ্ধে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পাওয়া

BanglaBook.org

যায়, কারণ তা ছিল একই সঙ্গে জমিদার বিরোধী সংগ্রামও। দেওবন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওয়াহাবি আন্দোলন, তিতুমীরের যুদ্ধ ও ফরায়েজী আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী হলেও তার মধ্যে ধর্মীয় রং ছিল। বৃটিশ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এই সকল মুসলমান বিদ্রোহীদের চিন্তা চেতনায় ছিল সামন্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যখন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যা ও বিত্তের উভয় দিক দিয়ে মুসলমানেদের চেয়ে এগিয়ে ছিল, তখন আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানরাও ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রথম উদ্যোগ নেন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমেদ। কাজটি ভালোই ছিল। মাদ্রাসা ভিত্তিক কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যেই মুসলমানরা এতকাল আটকে ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে একই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও মুসলমানেদের বৃটিশরাজের প্রতি অনুগত থাকার জন্য প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সেক্যুলার। পরবর্তীতে তিনিও মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। একইভাবে আমরা দেখি পরবর্তী শতাব্দীতে সেক্যুলার জিন্না মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু এবং মুসলমান জাতীয়তাবাদ দুটোই বেশ প্রবলভাবে চাড়া দিয়ে ওঠে। বঙ্কিমের কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে সেই সময়ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিলেন কেউ কেউ যথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (এই প্রসঙ্গটি আগেই এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে)। বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত আনন্দমঠ উপন্যাসে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয় মুসলমান বাদশাদের নিষ্ঠুরতা, মুর্তি ভাঙ্গা, লুটতরাজ এবং ধর্ষণই হচ্ছে মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৯১ সালে অক্ষয়কুমার মৈত্র ও ১৯০৫ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ উভয়ই 'সিরাজদ্দৌলা' নামে নাটক লেখেন যেখানে সিরাজকে বীর, ক্লাইভকে শত্রু এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'An Indian Pilgrim'-এ

BanglaBook.org

'মুসলমান যুগ' সম্পর্কে ইংরেজ ও কিছু হিন্দুর লেখা ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করেন। ইংরেজ ও কিছু কিছু হিন্দু ঐতিহাসিকের লেখা গ্রন্থে মোঘল ও মুসলিম যুগকে পীড়নমূলক ও হিন্দু বিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুভাষ বসু সেটাকেই খন্ডন করেন। তিনি আরও বলেন যে নবাব সিরাজের পক্ষে যে সেনাপতিরা ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন (মোহনলাল, মীর মদন) তারা উভয়ই ছিলেন হিন্দু। নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে ইংরেজরা যে হলওয়েল মনুমেন্ট তৈরি করেছিল তাকে সরিয়ে নেবার জন্য সুভাষ বসুই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সুভাষ বসু নিঃসন্দেহে ছিলেন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা এবং আগাগোড়া অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু সেটা বিংশ শতাব্দীর কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি মুসলিম জাতীয়তাবদের জন্ম হয়। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো বাংলাতেও নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৬-১৮৯৩) এবং সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮) মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং একই সঙ্গে বৃটিশের প্রতি অনুগত থাকতে আহ্বান জানান। নবাব আব্দুল লতিফ আসলে কোন নবাব ছিলেন না। ফরিদপুরে জন্মগ্রহণকারী আব্দুল লতিফ সরকারি চাকরি করতেন এবং বৃটিশের দালালি করার জন্য নবাব উপাধি লাভ করেছিলেন। সৈয়দ আমি আলী ছিলেন ব্যারিস্টার এবং কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি। তারা একদিকে ছিলেন বৃটিশ ভক্ত, অন্যদিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। নবাব আব্দুল লতিফ ১৮৬৩ সালে ক্যালকাটা মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি এবং সৈয়দ আমির আলী ১৮৭৮ সালে ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। সেখানে ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। এবং এই দুই সংগঠনেই বাংলায় কথাবার্তা বা কাজকর্ম প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তাদের কাছে বাংলা ছিল হিন্দুর ভাষা। বৃটিশ আমলে তথাকথিত অভিজাত মুসলমানরা ঘরে উর্দু কথা বলাকে আভিজাত্যের লক্ষণ মনে করতেন। পরবর্তীকালে এরাই পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি তৈরি করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তাদের সেই আভিজাত্যকে গুড়িতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ সাধারণ বাঙালি ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎসের সন্ধান করতেন বাংলা ও ভারতের বাইরে– আরব, তুরস্ক ও ইরানে।

BanglaBook.org

অবশ্য এই কতিপয় ইংরেজপন্থী মুসলমানদের প্রচারণা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতেই অনেক মুসলমান লেখক ও কবির সাক্ষাত আমরা পাই, যারা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেছেন। এমনকি তাহারুন্নেসা নামে একজন মহিলা মুসলিম কবিরও সাক্ষাত আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে পেয়ে থাকি। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে জমিদার বিরোধী এবং অসাম্প্রদায়িক। তাঁর জমিদার দর্পণ নাটকটি জমিদার বিরোধীতার স্বাক্ষর বহন করে এবং 'গো জীবন' শীর্ষক অসাধারণ রচনাটি তাঁর মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ কয়েকজন বাদ দিলে সাধারণভাবে মুসলমানরা ছিল ইংরেজ বিরোধী আর হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছিল ইংরেজের প্রতি অনুগত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘটনাটি উল্টে গেল। ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল এবং আশরাফ ও অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশপ্রীতি জন্মলাভ করল। এই কারণে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের মত মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকও স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাস পাঠের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাষ্ট্রে বৃটিশকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কয়েকটি গুপ্ত সশস্ত্র সংগঠন গড়ে ওঠে যার সদস্যরা ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই বাংলায় বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে দলে দলে হিন্দু যুবকরা যোগদান করেছিলেন। নেতৃত্ব ছিল হিন্দুদের হাতে। কিছু ব্যক্তিক্রম বাদে সাধারণভাবে মুসলমানারা বঙ্গভঙ্গের এবং বৃটিশের পক্ষে ছিল। প্রথম যুগে যে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে হিন্দু প্রাধান্য ছিল প্রায় একচেটিয়া।

১৮৫৭'র সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর দ্রুত বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নতুন পথ অবলম্বন করে। ভারতীয় জমিদার, ব্যবসায়ী ও উচ্চবিত্তের চাকরিজীবীদের পক্ষে টেনে নেবার জন্য বৃটিশদেরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেস। প্রথমদিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে

BanglaBook.org

কংগ্রেস তাদের ইচ্ছামত চলেনি এবং হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন তারা কংগ্রেসের পাল্টা মুসলিম লীগ গঠনের উদ্যোগ নেয়। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও ধনাঢ্য আগা খাঁ'র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল যারা প্রকাশ্যেই বৃটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ঠিক একই বৎসর মুসলিম লীগের মতো হিন্দু মহাসভাও গঠিত হয়েছিল এবং সেটাও বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস: কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকা

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা কেউই তিরিশের দশক পর্যন্ত হিন্দু বা মুসলমান জনগণের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। অন্ততপক্ষে বাংলার ক্ষেত্রে তা খুবই সত্য। ১৯৩৭ এর নির্বাচনই তার স্বাক্ষ্য প্রমাণ করে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বেশ বেকায়দায় ছিল। সেই সময় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের জিন্না পূর্ণ স্বাধীনতা না চাইলেও ভারতীয়দের জন্য কিছুটা শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবি করতে থাকেন। অবশ্য যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলিম লীগ তো বটেই এমনকি গান্ধীও বৃটিশকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী গান্ধী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য বৃটিশের পক্ষে ভারতীয় সৈন্য রিক্রুটের জন্য প্রচারে নামেন। ভাবতে অবাক লাগে, এটা ছিল সেই সময় যখন রাসবিহারী বসুর মতো বিপ্লবীরা ভারতীয় সৈন্যদের দ্বারা বৃটিশবিরোধী বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছেন এবং তখনই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার চিন্তা করছেন। ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ রাজের পক্ষে লড়াই করার জন্য ভারতীয়দের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। আর মুসলিম লীগ তো সরাসরি বৃটিশের দালালী করছিল। হিন্দু মহাসভার কাজ ছিল মুসলিম বিদ্বেষ এবং হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা।

গান্ধী আশা করেছিলেন, বৃটিশকে সহযোগিতার বিনিময়ে যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতের শাসনকার্যে ভারতীয়রা কিছুটা অধিকার লাভ করবে। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়নি। অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্ণধাররাও বুঝতে পেরেছিল যে শুধু দমননীতি দিয়ে ভারতকে বেশিদিন পরাধীন রাখা

BanglaBook.org

যাবে না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ তখনো তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করত। তাছাড়া বৃটেনকে সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য ভারতীয়দের শাসনকার্যে কিছু অংশ দেবার প্রতুশ্রুতি তারা যুদ্ধকালীন সময়ে করেছিল। এর ফল স্বরূপ এল মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন, ১৯১৯ সাল (মন্টেগু ছিলেন লন্ডনস্থ ভারত সচিব এবং চেমস্‌ফোর্ড ছিলেন ভারতের ভাইসরয়)। এতে ভারতীয়দের ছিটেফোটা কিছু ক্ষমতা দেওয়া থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রে বড়োলাট ও প্রদেশে গভর্নরের উপর। কংগ্রেস এই সংস্কার মেনে নিতে পারেনি। ঠিক এর পরপরই এল রাওলাট আইন। যা ছিল চরম নির্যাতনমূলক এবং দমনমূলক আইন। কংগ্রেস এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করে। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ছিল ইতিহাসের এক চরম কলঙ্কময় দিন। ঐদিন পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা এক মাঠে অনুষ্ঠিত এক শান্তিপূর্ণ সভার উপর অকস্মাৎ গুলি চালিয়ে চারশ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ইংরেজ কর্নেল ডায়ার। নিহতদের মধ্যে শিশু এবং নারীরাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে সমগ্র ভারতবাসী। ইংরেজ সরকার বাধ্য হয় এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করতে। তদন্ত কমিটির সামনে ডায়ার স্বীকার করে যে জনগণ নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সভা করছিল। তবু ভারতবাসীকে শায়েস্তা করার জন্য এবং তারা যে বৃটিশের গোলাম এ কথাটা ভালোভাবে বোঝানোর জন্য ডায়ার ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি চালিয়েছিল। ডায়ার দম্ভভরেই এ কথা বলেছিল। যেন পরাধীন দেশের মানুষকে হত্যা করা পাখি শিকার করার মতোই একটি নিরাপরাধ বিষয় ছিল। 'সভ্য'(?) বলে দাবিদার বৃটিশ সরকারের সেই তদন্ত কমিটি ডায়ারকে নির্দোষ বলে রায় দিয়েছিল।

রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ এই সকল ঘটনার পর (এবং বিশেষ করে যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার কারণে) ক্ষুব্ধ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। একই সময় শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী প্রমুখের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে একটা মিলন তৈরি হয় যার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। চৌরিচোরার ঘটনার পর গান্ধীজি যে অকস্মাৎ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন সেই কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সময় তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে সে দেশেই

BanglaBook.org

খেলাফতের অবসান ঘটে। ভারতেও খেলাফত আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় (এই গন্থের এগারো নম্বর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জিন্না এই অসহযোগ এবং খেলাফত– কোনো আন্দোলন সমর্থন করেননি। প্রথমত তিনি কোনো গণ আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করাই ছিল তার রাজনীতির পথ। দ্বিতীয়ত খেলাফত আন্দোলনকে তিনি সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ এবং প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন বলে বিবেচনা করেছিলেন। এই পয়েন্টে অবশ্য জিন্না যথার্থ ছিলেন। ভারতের ইতিহাসের এই অংশটি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হলে জিন্নার সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক।

মহম্মদ আলী জিন্না (১৮৭৬-১৯৪৮)

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহম্মদ আলী জিন্না একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের স্রষ্টা। ১৯০৬ সালে ব্যারিস্টার জিন্না কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে জিন্না মুসলিম লীগেও যোগদান করেন। এরপর বেশ কয়েক বৎসর তিনি একই সঙ্গে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস করতে থাকেন। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপরে বেশ কিছুদিন তিনি ভারত ত্যাগ করে বিলাতে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে ভারতের মুসলিম লীগের নেতাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি আবার ভারতে ফিরে এসে মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তারই সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভিত্তিক যে প্রস্তাব পাস হয় সেটাই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। লাহোর প্রস্তাব ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ আমরা একটু পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। এখন ফিরে আসি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে।

তখন জিন্না কংগেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। সেই সময় তিনি হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন। জিন্না পরবর্তীকালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন। তবে পাকিস্তানের দাবিটি ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। বলাই বাহুল্য, এ ধরণের কৌশল হচ্ছে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করার স্বার্থে অত্যন্ত অসৎ কৌশল। যাই হোক,

BanglaBook.org

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সেক্যুলার। জীবনে কখনও ধর্ম পালন করেননি। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন সাহেব। বৃটিশের প্রতি অনুরাগও ছিল। তবে আশ্চর্যজনকভাবে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন ভারতের মুসলিম সমাজের নেতা ও তথাকথিত 'ত্রাণকর্তা'। ১৯১৬ সালে তারই উদ্যোগে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সাময়িকভাবে হলেও এই চুক্তি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে কাছাকাছি আনতে সমর্থ হয়েছিল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছিল (নিচের তলায় হিন্দু-মুসলমান শ্রমজীবীদের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য ও প্রীতির ভাব সবসময়ই ছিল)। লক্ষ্ণৌ চুক্তি একদিক দিয়ে সফল হলেও এর একটি নেতিবাচক দিকও ছিল। এতে ভবিষ্যত ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে বৃটিশ সরকার এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হচ্ছে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিনিধি।

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা কী রকম হবে (এমনকি পুরো স্বাধীন না হলেও) তা নিয়ে বিশ ও তিরিশের দশকে রাজনৈতিক মহলে অনেক কথাবার্তা ও বিতর্ক হয়। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় প্রাধান্যে আসে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো না প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন, পৃথক না যৌথ নির্বাচন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আসন বন্টন ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নে কোনো দলেরই খুব দৃঢ় ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না।

জিন্নার জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তার ১৪ দফা প্রস্তাব। ১৯২৮ সালে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য ইংল্যান্ড থেকে সাইমন কমিশন দিল্লীতে আসে। এই কমিশনের অধিকাংশই ছিল কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য। কনজারভেটিভ পার্টির প্রভাবশালী নেতা চার্চিল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন (১৯৪৭ সালেও ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল চার্চিল ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিলেন)। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ (গান্ধী জিন্নাসহ) সাইমন কমিশন বয়কট করেন।

সাইমন কমিশনের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সাংবিধানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয় ১৯২৮ সালেই। মতিলাল নেহেরুর রিপোর্টে ভৌগলিক অবস্থানের উপর

BanglaBook.org

ভিত্তি করে নির্বাচন এলাকা চিহ্নিত করার পক্ষে মত দেওয়া হয়। রিপোর্টে আশা প্রকাশ করা হয় যে এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পরস্পরের নিকটে আসবে। জিন্না তাতে ছাড় দিতে রাজী হন। তবু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মুসলিম লীগের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হয়। জিন্না তখন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। তিনি মুসলমানদের জন্য আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করেন। জিন্নার ১৪ দফার মূল কথা হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন থাকবে এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয় এবং বাকি সকল ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। এর ফলে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের মুসলিম অধিবাসীরা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে। জিন্নার ১৪ দফা সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। তবে অধিকতর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা ভারতবর্ষের মতো বহুজাতিক দেশের জন্য খুবই যথাযথ ও গণতান্ত্রিক। কংগ্রেস কিন্তু এই ব্যাপারে সবসময় অগণতান্ত্রিক আচরণ করে এসেছে এবং শাক্তিশালী এককেন্দ্রীক শাসনের পক্ষে মতামত দিয়ে এসেছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৬৭-১৯২৫)

এই সময় ভারতের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস যিনি দেশবন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলার এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা হলেও এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে গান্ধীর বিরোধ হয় এবং তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজ পার্টি নামে একটি নতুন দল করেছিলেন। মতিলাল নেহেরুও এই দলের সঙ্গে ছিলেন। সুভাষ বসু এবং মুসলমান নেতা সোহরাওয়ার্দীও এই দলে যোগদান করেছিলেন (সোহরাওয়ার্দী অল্পকাল পরেই মুসলিম লীগে চলে যান)।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহানুভবতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থত্যাগ ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব রাজনীতির ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তদানীন্তন বাংলার মুসলমান নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি চুক্তিতে পৌছানো। এই চুক্তিটি ঘোষিত হলে তা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে। চুক্তির বিষয়গুলো হলো– প্রধানত আইন পরিষদের নির্বাচনে জনসংখ্যানুপাতে

BanglaBook.org

আসন নির্দিষ্ট করা হবে এবং ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু থাকবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ৬০ শতাংশ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৪০ শতাংশ আসন লাভ করবে। এছাড়াও চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য কিছু সুবিধার ব্যবস্থা দিতে হবে। এই 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অবশ্য কার্যকরী হয়নি। গোড়া সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা এর সমালোচনাও করেছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও সি আর দাসের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১৯২৫ সালে তিনি কম বয়সেই মৃত্যু বরণ করেন।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত বাংলার কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ চাকরি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিকতর সুবিধা দেয়া হোক, এই আবেদন করেছিলেন। তাঁর মতে এ না হলে হিন্দু মুসলমানের সমতা তৈরি হবে না এবং এই ঐক্যবোধ জাতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন।

হিন্দু সমাজের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা

ভারতবর্ষে কেবল হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এরকম কয়েকটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল তাই-ই নয়, বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দুর মধ্যেও নানা রকমের ভাগ-বিভাজন ছিল। সবচেয়ে নিচের যে অংশ, যারা অস্পৃশ্য, তাদেরকে তো উচ্চবর্ণের সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে বেশি ঘৃণা করত। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজি উভয়ই জোর প্রচার অভিযান চালিয়েছিলেন। আমরা দেখবো পৃথক নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হিন্দু মুসলমানের জন্যই স্বতন্ত্র আসন ও ভোটের ব্যবস্থা ছিল না, তফশিলি সম্প্রদায় যাদেরকে নমঃশুদ্র বলা হয় তাদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে "হিন্দু সমাজে ঐক্য ও সংহতি একটি সুদূর পরাহত স্বপ্ন হিসেবেই থাকবে"। 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯২৬ সালে তিনি বলেন যে হিন্দুদের সামনে "সবচেয়ে বড়ো কঠিন কাজ হলো নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য অর্জন করা... যা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু ধর্মকে বিকৃত করেছে– ছোটো জাতি বলে কিছু লোককে অপমান করেছে।" আমরা দেখতে পাই কংগ্রেসে উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। এজন্য তফশিলি

BanglaBook.org

সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ তৈরি হয় ও তারা পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা নিজেদের সাম্প্রদায়িক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের আদিবাসীদেরকে হিন্দু হিসেবে গণ্য করার জন্য নানা যুক্তি হাজির করতেন। তারা যে হিন্দু এটা প্রমাণ করার জন্য তাদের কারো কারো বংশ উপাধিতে 'সিংহ' অথবা 'রায়' লেখায় উৎসাহিত করতেন। কোন কোন সম্প্রদায়কে ক্ষত্রিয় বলেও ঘোষণা করা হতো। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মতো কিছু নেতা একচেটিয়াভাবে বর্ণ হিন্দুদের জন্য তৈরি মন্দিরকে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই ধরণের প্রস্তাব নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কিছু আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এর আগে নিজেরকে ভদ্রলোক বলে মনে করত এবং অস্পৃশ্য নমঃশুদ্র ও উপজাতীয়দেরকে দূরে ঠেলে রাখত। 'বাংলা ভাগ হল' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের ইতিহাসবিদ জয়া চ্যাটার্জি যথার্থই লিখেছেন, "১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এটা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র ব্যাপক হিন্দু সমর্থন পেলেই প্রদেশের রাজনীতিতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। তফশিলি সম্পদায়ের আসনের মধ্যে, ঐ দলের সামাজিক ভিত্তির সীমাবদ্ধতা এবং ভদ্রলোক জগতের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে বন্ধু লাভের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।" ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন শুধু হিন্দু মুসলমানের বিভাজন নয়, অস্পৃশ্যতা এবং হিন্দু সমাজের মধ্যকার বর্ণপ্রথা, তথাকথিত দলিত সমস্যা স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি বিরাট দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকর (যিনি নিজে অস্পৃশ্য সম্প্রদায় থেকে আগত) ভারতীয় সংবিধানে বর্ণপ্রথা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী ঘোরতর আপত্তি করেন এই কারণে যে এটা হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করবে।

দুইটি শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন

১. যুক্ত নির্বাচন না পৃথক নির্বাচন? ২. শক্তিশালী কেন্দ্র না প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা? এই দুটি প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কখনওই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সেই সুযোগই নিয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কংগ্রেস সবসময়ই শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে,

BanglaBook.org

মুসলিম লীগ মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। এই সকল মতবাদের মধ্যে নীতির চেয়ে অসৎ কৌশলই অধিকতর কার্যকর ছিল। এটি উভয় দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শেষ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনই চালু হয়েছিল এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তা মেনে নিয়েছিল। অবশ্য ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের সময় মুসলমান নেতারা যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলমান নেতারা মিলিত হয়ে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে (পাঞ্জাবের মোহম্মদ শফির একটি উপদল ছাড়া) কিছু শর্ত সাপেক্ষে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রস্তাব নেন। একই বছর মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনেও এই একই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে পরের বছরই ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে (All Parties National Convention) মুসলিম লীগ নেতারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই কক্ষেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক তৃতীয়াংশ হতে হবে মুসলমান। গান্ধী পৃথক নির্বাচন মেনে নিলেও তফশিলি সম্প্রদায়কে হিন্দুর হিসেবে গণ্য করার পক্ষে ছিলেন।

এই দুই দলের বিভিন্ন নেতাদের বিভিন্ন সময় নির্বাচন প্রশ্নে বিভিন্ন রকম উক্তি বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে। সেদিনকার প্রজন্মও একই বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। কারণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা কখনওই সত্যনিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। কংগ্রেস পরিচালিত হতো প্রধানত ভারতের হিন্দু জমিদার ও হিন্দু বুর্জোয়াদের দ্বারা এবং মুসলিম লীগ পরিচালিত হত মুসলিম জমিদার ও কিছু মুসলিম (অবাঙ্গালি) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা। বাংলায় জমিদারদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। আর শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের মধ্যে মুসলমানেদের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং তারা সকলেই ছিল অবাঙালি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস মুসলিম লীগের মধ্যে পার্থক্য ছিল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়–

"যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত সরকারের অধীনে ভারতবর্ষের বর্তমান প্রদেশগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকবে, যাতে প্রত্যেকটি প্রদেশ পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে এবং যেসব বিষয়গুলি সাধারণ এবং

BanglaBook.org

সকলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শুধু সেই বিষয়গুলির মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ থাকবে।"

এমনকি আবুল কালাম আজাদও লিখেছিলেন "পৃথিবীর সর্বত্র প্রবণতা হচ্ছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। ভারতের মতো বিশাল দেশ, যেখানে জনগণের মধ্যে ভাষা, রীতিনীতি ও ভৌগলিক অবস্থার এত বিভিন্নতা, সেখানে স্পষ্টই এককেন্দ্রীক সরকার ('Unitary Government') সবচেয়ে অনুপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশঙ্কাকেও দূর করতে পারে।"

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে মুসলমান নেতাদের দাবি যখন উঠতে লাগলো তখন ১৯৩১ এর জুলাইয়ে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি এক প্রস্তাবে বলল, "দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ছাড়া বাকি সকল ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী ইউনিটদের হাতে ন্যস্ত হবে, যদি না আরও বিবেচনার পরে দেখা যায় তা ভারতের সর্বাধিক মঙ্গলের পরিপন্থী হবে।" (সূত্রঃ সুনীতি কুমার ঘোষ- বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি)

'যদি না আরও বিবেচনার পর দেখা যায়' ইত্যাদি বাক্যাংশটি (Unless on further examination, it is found to be against the best interests of India) গান্ধীর জুড়ে দেওয়া। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান গান্ধীর অত্যন্ত কৌশলী শব্দপ্রয়োগ।

পরবর্তীকালে দেখা গেল সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থাকলেও কেন্দ্রটি ছিল (বা এখনো আছে) অত্যন্ত শক্তিশালী। তবু ভারতে প্রদেশের কিছু ক্ষমতা আছে; কিন্তু পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা নামক প্রদেশটির (যা আজ বাংলাদেশ নামে পরিচিত) জন্য কোনো স্বায়ত্তশাসন কোনদিনই ছিল না। বরং তা ছিল এক ধরণের কলোনী যার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য আমরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলাম ১৯৭১ সালে।

ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ ও ভারত শাসন আইন ১৯৩৫

ভারতের শাসনতন্ত্র নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের গোলটেবিল কনফারেন্স হয়েছে তিনবার। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ এর মধ্যে। ১৯৩২ সালে বৃটেনে সর্বপ্রথম শ্রমিক দলের নেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠিত

BanglaBook.org

হয়। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে বৃটেনের লেবার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ প্রকাশ হলো ১৯৩২ সালের ১৭ই আগস্ট। এই রোয়েদাদ অনুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। গান্ধী চেয়েছিলেন শুধু শিখ ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা। অন্যান্য সম্প্রদায়কে তিনি বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন। তফশিলি (নমঃশুদ্র) হিন্দুদের জন্য ব্যবস্থা হলো যে তারা নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোট দেবেন এবং প্রার্থী দাঁড়াতে পারবেন এবং সাথে সাথে সাতটি প্রদেশে তাদের জন্য কয়েকটি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তার জন্য পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্র থাকবে।

তফশিলি হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্রের ব্যাপারে গান্ধী ঘোরতর আপত্তি জানালেন এবং তিনি অনশন শুরু করলেন। এর ফলে তৎকালীন ভারতের ভারতীয় বড়ো পুঁজিপতি ও গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ ঘনশ্যাম বিড়লার উদ্যোগে পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যার ফলে তফশিলি হিন্দুদের জন্য কয়েকটি এলাকায় পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্র বাতিল হলো। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কেউ কিন্তু তফশিলি হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনী কেন্দ্র বাতিলের দাবি তোলেনি।

ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী বাংলার আইনসভার দুইশত পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে মুসলমানেরা পাবে ১১৯টি যদিও জনসংখ্যার ৫৪.৮ ভাগ ছিল মুসলমান। হিন্দুরা পাবে ৮০টি আসন। জনসংখ্যার ৪৪.৮ ভাগ হলো হিন্দু। এখানে জনসংখ্যা অনুসারে আসনের অনুপাতের দিক দিয়ে মুসলমানরা একটু কম আসন পেয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য, এই রোয়েদাদ অনুযায়ী সার্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না। একেবারে নিরক্ষর এবং নিঃস্ব গরিব মানুষের কোন ভোটাধিকার ছিল না। সর্বপরি বাংলার আইনসভায় বাংলাদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের জন্য রাখা হয়েছিল ২৫টি আসন। অথচ এই ইউরোপীয়দের সংখ্যা বাংলায় ছিল মাত্র চৌদ্দ হাজার। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই রোয়েদাদ সম্পর্কে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। বস্তুত বাংলায় এবং আসামে ইউরোপীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাটি যথেষ্ট বেশি ছিল। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ প্রকাশ পাওয়ার পর এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, স্যার আবদার রহিম প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দ এটাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমানের জনসংখ্যা বেশি

BanglaBook.org

হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু নেতা হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানকে আসন বেশি দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৬ এর ১৫ই জুলাই কোলকাতার টাউন হলে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। এতে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেন এই রোয়েদাদ জাতিকে নানা অংশে বিভক্ত করেছে, জাতীয় স্বার্থের উর্দ্ধে সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্যকে স্থান দিয়েছে, ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলে রাজনৈতিক মুনাফা তোলার সুযোগ করে দিয়েছে কিছু কিছু গোড়া ব্যক্তিদের। তিনি আরও বলেন, মুসলমানরা দীর্ঘদিন নানাক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাননি। তিনি এখন চান মুসলমানরা সমান সুযোগ লাভ করুক (এখানে স্মরণীয় যে ১৯০৭ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই কথা বলেছেন, দীর্ঘদিনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া ও পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য মুসলমানদেরকে হিন্দুদের চেয়ে বেশি দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন)। কোলকাতার এই সভায় তিনি বলেন, হিন্দুদের রাগ মুসলমানদের উপর বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু মুসলমানরা হিন্দুদের মতোই একই সর্বনাশা রাজনীতির শিকার।

এই রোয়েদাদের ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়েছিল। এবং তারই ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সর্বপ্রথম ভারতে বাংলাসহ বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশীদের দ্বারা প্রাদেশিক সরকার গঠিত হলো। বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) হয়েছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) যিনি শের-এ-বাংলা নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৭ এর নির্বাচনের বিশ্লেষণ

১৯৩৭ সালে সারা ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে ৪৮৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৫৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেস ২৬টি আসনে জয়ী হয়েছিল। তার মধ্যে ১৯টি হচ্ছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। এই মুসলিম পাঠান অধ্যুষিত এলাকায় কংগেসের এই বিপুল বিজয়ের কারণ হচ্ছে কংগ্রেস নেতা খান আব্দুল গাফফার খানের বিশাল প্রভাব। তিনি সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত ছিলেন। এগারোটি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে একটি আসনও পায়নি। ১১টির মধ্যে ৮টি প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল।

BanglaBook.org

কংগেসের লাইন ছিল তারা অন্য কোন দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করবে না। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা অবশ্য টিকে ছিল মাত্র আড়াই বছর। কারণ ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের নির্দেশে এই সকল প্রদেশের মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। এই ঘটনায় জিন্না উল্লসিত হয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগের দিনকে নাজাত দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ও গান্ধী ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করেন। মুসলিম লীগ কোন প্রদেশেই মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারেনি। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলাদেশে যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেখানেও তারা সংখ্যগরিষ্ঠ আসন পায়নি। এই নির্বাচনে সারা ভারতে আইনসভাগুলোতে মোট ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ মাত্র ১০৮ আসনে জয়লাভ করেছিল। বাংলাদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। তাদের আসন সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০। মুসলিম লীগ পেয়েছিল ৩৮টি আসন। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি পেয়েছিল ৩৯টি আসন। এই আইনসভাটি প্রায় দশ বছর টিকে ছিল। এর মধ্যে বহু সদস্যদের বহু দলবদলের ঘটনা ঘটে। তিনবার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। প্রথম দুইবার ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে এবং তৃতীয়বার মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে। ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ছিলেন নির্দলীয়। এবং যেহেতু দল বদলেরও সুযোগ ছিল সেহেতু মন্ত্রীসভার ভাঙা গড়া খুব সহজ ছিল। ১৯৩৭ সালে প্রথম মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বাদে মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল ১০। এর মধ্যে ৫ জন হিন্দু, ৫ জন মুসলমান। ৫ জন হিন্দুর মধ্যে বর্ণ হিন্দু ৩ জন, তফশিলি হিন্দু ২ জন। মুসলিম লীগের ছিল মন্ত্রী ছিল ৩ জন। তার মধ্যে খাজা নাজিম উদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী অন্যতম। কৃষক প্রজা পার্টির দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন সৈয়দ নওশের আলী যিনি দেড় বছরের মাথায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি উত্থাপন করলে মন্ত্রীসভা তা গ্রহণ না করায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এবং তিনি পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং আরও পরে চল্লিশের দশকে স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এই ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৮ জনই ছিলেন বড়ো জমিদার। তাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদাররা ছিলেন। বৃটিশ জামানার একেবারে শেষ সময়ে শের-এ-বাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগের বাংলা

BanglaBook.org

প্রদেশের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তাঁর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন হোসেন শহীদ সহরোওয়ার্দী। কিছুকাল তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সাথে করেছিলেন (জিন্নার মতোই)। ১৯৪৬ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে ফজলুল হক কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনর্জীবিত করে নির্বাচনে নেমেছিলেন। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথ মন্ত্রীসভা গঠন করতে। কিন্তু কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কোথাও কোয়ালিশন করবে না। তাই ফজলুল হক বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন করেন এবং পরে নিজেই মুসলিম লীগার হয়ে যান।

ফজলুল হক খুবই জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। হিন্দুদের কাছেও তিনি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন করে তিনি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে বহু ঋণগ্রস্থ কৃষককে মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারের জন্যও তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি কখনওই গণআন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। বৃটিশের বিরুদ্ধে জোরেসোরে কোন বক্তব্যও প্রদান করেননি। বরং বৃটিশরাজের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁরই মন্ত্রীসভার এককালীন সদস্য, তাঁরই দলের নেতা সৈয়দ নওশের আলী বৃটিশ বিরোধী বক্তব্য রাখার জন্য কারাবরণ করেছিলেন। হক মন্ত্রীসভার আর কেউ কখনও জেলখানায় যাননি। ফজলুল হক কৃষকের মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নিলেও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পক্ষে ছিলেন না, যদিও নির্বাচনের আগে এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। বারবার দলবদল এক ধরনের নীতিহীনতারই পরিচয় বহন করে। তবে তিনি মানুষ হিসেবে ছিলেন উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন।

আমরা দেখেছি তখনো পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম লীগের কোনো জোরালো ভিত্তি ছিল না। বস্তুত হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা এবং ফজলুল হকের মুসলিম লীগে যোগদান মুসলিম লীগের জন্য গণভিত্তি করে দিয়েছিল। এই সময় পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষকের জমিদার বিরোধী দাবি পূরণে ফজলুল হকের অনীহা ও ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরই দল কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সৈয়দ নওশের আলী তো আগেই মন্ত্রীসভা ও প্রজা পার্টি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। প্রজা পার্টির অন্যান্য বিদ্রোহী সদস্যরা মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে নতুনভাবে

BanglaBook.org

অন্যদের সাথে যোগ দিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে আগ্রহী ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধের জন্য সুভাষ বসু ও শরৎ বসু প্রজা পার্টির এই বিদ্রোহী অংশের সাথে একমত ছিলেন। সুভাষ বসু তখন ভারতের কংগ্রেসেরও প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের সংযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হলে অনেক সুবিধা হবে। এবং সাম্প্রদায়িকতার তরঙ্গকে রোধ করা যাবে।" কিন্তু গান্ধী তাতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। গান্ধী সুভাষের কাছে চিঠি লিখে বলেছিলেন যেকোনোভাবেই যেন হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে উৎখাত না করা হয়। গান্ধীর চিঠির জবাবে সুভাষ বসু যে চিঠি দেন তাতে তিনি লেখেন, "হক মন্ত্রীসভাকে যত শীঘ্র সম্ভব উচ্ছেদ করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয়। যত দীর্ঘদিন এই প্রতিক্রীয়াশীল মন্ত্রীসভা টিকে থাকবে তত বেশি বেশি বাংলার পরিবেশ সাম্প্রদায়িক রূপ নেবে। ... আমি খুবই বিস্মিত হই যে, এতবড়ো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি আমার সঙ্গে একবার কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেননি।" (সেই সময় সুভাষচন্দ্র বসু সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন)

এ প্রসঙ্গে পরবর্তীতে নিরোদ চৌধুরী (যিনি সুভাষ বসু ও শরৎ বসুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন) বলেছেন যে সুভাষ বসুর মনে হয়েছিল যে গান্ধীর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিড়লার প্রভাব ও হস্তক্ষেপ ছিল। বিড়লা হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চাননি। তাই সুভাষের প্রস্তাবের পক্ষে তিনি ছিলেন না। কারণ তা কোলকাতার মাড়োয়ারিদের অর্থনৈতিক আধিপত্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতো। নিরোদ চৌধুরীর মতে গান্ধী সচেতন ভাবে মাড়োয়ারিদের স্বার্থে কাজ করে গেছেন।

আমরা আরও লক্ষ্য করি যে একই সময় মন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই সৈয়দ নওশের আলী হক-মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভাকে প্রতিক্রীয়াশীল বলে বিবেচনা করেছেন এবং প্রকাশ্যেই তেমন বক্তব্য রেখেছিলেন। মন্ত্রীসভা কর্তৃক কলিকাতা মিউনিসিপিলিটি এক্টের একটি প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে সৈয়দ নওশের আলী যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যা ১৯৩৯ এর ৪ই মার্চ Calcutta Municipal Gazette-এ উল্লেখ করা আছে। তিনি বলেছিলেন, যে মুষ্টিমেয় ইংরেজদের এ দেশে বাণিজ্যিক স্বার্থ আছে এবং যারা শোষক ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়াই হচ্ছে এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেছিলেন যে,

BanglaBook.org

মন্ত্রীসভা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটি অঙ্গ। এবং তাদের নীতি 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি

ফজলুল হকের মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। আবুল কালাম আজাদসহ কংগ্রেসের অনেক নেতাই মনে করেন যে বাংলার কংগ্রেসের উচিত ছিল ফজলুল হকের প্রজা পার্টির সঙ্গে ঐক্য ও যৌথ মন্ত্রীত্ব করা অথবা অন্য কোনোভাবে ফজলুল হককে সমর্থন করা। কোনোভাবেই মুসলিম লীগকে সামনে আসতে দেওয়া ঠিক হয়নি। মুসলিম লীগের ভিত্তি তখনও দুর্বল ছিল। এদিকে মুসলিম লীগ 'ইসলাম বিপন্ন' এই ধ্বনি তুলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটানোর সুযোগ পেয়েছিল যা পরবর্তীতে পাকিস্তানের মতাদর্শগত ভিত্তি তৈরি করেছিল। এই সময় থেকেই হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। ইতিপূর্বে ১৯১৬-১৭ সালে জিন্নার উদ্যোগে অথবা পরবর্তীতে গান্ধীর অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সময় যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল তা এইভাবে বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে কংগ্রেস কোনো সাম্প্রদায়িক দল না হলেও মুসলিম জনগণের একটা ব্যাপক অংশের কাছে হিন্দু পার্টি বলে মনে হয়েছিল। যদিও আবুল কালাম আজাদের মতো মুসলমান নেতা কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (যিনি পরবর্তীতে কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন)। উত্তর পাশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা খান আব্দুল গাফফার খান কংগ্রেসেরও নেতা ছিলেন। বাংলার কংগ্রেসের এক সময়কার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। সৈয়দ নওশের আলীর মতো জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হকের দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। (১৯৪৭ পরবর্তীকালে সৈয়দ নওশের আলী যশোরের লোক হওয়া সত্ত্বেও ভারতে থেকে যান এবং কংগ্রেস ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং তাদের প্রতিনিধিরূপে কয়েকবার রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে ১৯৪৭ পরবর্তীকালে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী নিজ জেলা কুমিল্লায় ফিরে আসেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে নেজাম-ই-ইসলাম নামে একটি সাম্প্রদায়িক পার্টি গঠন করেন।) এরকম আরও অনেক মুসলিম নেতার নাম দেওয়া যায় যারা কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ও নেতা ছিলেন। তবু

BanglaBook.org

হিন্দু নেতাদের একাংশের মধ্যে এমন একটা ধারণা ছিল যে মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না। তৎকালীন ভারতের বড়ো বুর্জোয়া ও গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ ঘনশ্যাম বিড়লা ১৯৩৭ এর ৩১শে আগস্ট গান্ধীকে লিখেছিলেন, "কংগ্রেসের পেছনে নিঃসন্দেহে গণসমর্থন আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস একটি হিন্দু পার্টি" (সূত্র: সুনীতি কুমার ঘোষ- 'বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি'- পৃষ্ঠা-২০৯)।

এর কিছুটা সত্যতাও আছে। ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (AICC) মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৩। তার মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ৬ জন। এ ৬ জনের ৩ জনই হচ্ছেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান। ১৯৩৭ সালের ২৬-২৯ এপ্রিল কংগ্রেস কার্যনির্বাহীর বৈঠকে গান্ধী বলেছিলেন যে শ্রেণী সংগ্রাম হিংসার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সদস্য করার পক্ষপাতী নন, কারণ দুটো সম্প্রদায় পরস্পরকে বিশ্বাস করে না (সূত্র: AICC Papers উদ্ধৃত হয়েছে সুনীতি কুমার ঘোষের বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি বইতে)।

তিরিশের দশক থেকেই হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পর পাকিস্তানের দাবি যখন প্রবল হতে থাকে। সন্দেহ নাই এই সময় মুসলানরাই বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ তোলে এবং সাময়িকভাবে হলেও পাকিস্তান আন্দোলনের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক স্রোতে ভারতের মুসলমানরা ভেসে গিয়েছিল। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই হিন্দু উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছিল যে মুসলমানরা বুঝি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষ শক্তি।

কথাটা একবারেই সত্য নয়। উচ্চবিত্ত তথাকথিত আশরাফ মুসলমানদের অধিকাংশ বৃটিশ ভক্ত ও আন্দোলন বিমুখ ছিল। মুসলিম লীগ ও জিন্না কখনওই বৃটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনে অংশ নেয়নি বরং বিরোধীতাই করেছে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় মুসলমানদের বড়ো অংশ এর বিরুদ্ধে ছিল (যদিও অনেক মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবী যে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। এই সকল কারণে হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী দল অনুশীলন ও যুগান্তরে মুসলমানদের নেওয়া হতো না। তাছাড়া এই

BanglaBook.org

সকল গোপন দলে যে সকল আচার আচরণ করা হতো (যেমন কালী মন্দিরে গিয়ে শপথ গ্রহণ ইত্যাদি) তা মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করত এবং তাদেরকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিত।

তবে মুসলমানদের সম্পর্কে এটাই শেষ কথা এবং সবকথা নয়। বৃটিশ ভারতের প্রথম একশ বৎসরে যেসকল সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে হিন্দু মুসলমানের সমান অংশগ্রহণ ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহও ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম। বরং কোলকাতাস্থ হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই এই মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। নীল বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলন এবং বড়ো বড়ো শ্রমিক আন্দোলন এ সবই ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত লড়াই। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতি মণ্ডলী ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলেই ছিলেন। ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকরা ছিলেন। ভারতবর্ষের সংগ্রামী ইতিহাসে একটি মহৎ ও উজ্জ্বল ঘটনা হলো ১৯৩০ সালের পেশোয়ারে পাঠান জনগণের অভ্যুত্থান যারা সকলেই ছিলেন মুসলমান। তারা ১০ দিনের জন্য পেশোয়ারকে স্বাধীন করে রাখতে পেরেছিলেন। মুসলমান পাঠানদের দমন করার জন্য বৃটিশ প্রশাসন গাড়োয়ালি সৈন্যদের পাঠিয়েছিল একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে। এই গাড়োয়ালিরা ছিল হিন্দু। কিন্তু বিস্ময়ের ও গর্বের বিষয় এই যে সেই গাড়োয়ালি সৈন্যরা ইংরেজ সেনাপতির আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহী পাঠান ভাইদের প্রতি গুলি চালাতে অস্বীকার করে। পরে অবাধ্যতার জন্য গাড়োয়ালি সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার হয়। চন্দ্র সিং নামে একজন সৈনিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পেশোয়ারের জনগণ এই গাড়োয়ালি সৈন্যদের জাতীয় বীর বলে ঘোষণা করেছিল। সেদিনের ভারতের শ্রমিক কৃষক পার্টি (তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির ছদ্মনাম) সেই গাড়োয়ালি সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। পাঞ্জাব এবং ভারতের প্রায় সকল প্রধান শহরে প্রগতিশীল মানুষরা এই গাড়োয়ালি সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি গাড়োয়ালি সৈন্যদের 'অবাধ্যতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী' বলে নিন্দা করেছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে গাড়োয়ালি সৈন্যরা গুলি করতে

BanglaBook.org

অস্বীকার করে বস্তুত তারা একেবারে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গান্ধীর অহিংস নীতির অনুসরণ করেছিলেন।

তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী দলে সংখ্যায় কম হলেও কয়েকজন মুসলমান সশস্ত্র বিপ্লবীর সাক্ষাত আমরা পাই। যেমন ময়মনসিংহের আফতাব আলী অনুশীলন দলের কর্মী, যিনি পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। যুগান্তর দলের কর্মী ছিলেন রাজ্জাক খান। যিনি পরবর্তীতে মুজফ্‌ফর আহমদ ও কমরেড আব্দুল হালিমের সঙ্গে একত্রে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

১৯২৬ সালের পহেলা মে থেকে যে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় উত্তর ভারতের কয়েকজন সশস্ত্র জাতীয়তাবাদীর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়েছিল, ইংরেজের সেই বিচারে চারজন দেশপ্রেমিক বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তারা হলেন রাজেন লাহিড়ি, আশফাকুল্লাহ, রামপ্রসাদ বিসমিল ও রৌশন সিং। আশফাকুল্লাহ ছিলেন মুসলমান পাঠান যুবক। ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর ফায়েজাবাদ জেলে আশফাকুল্লাহর ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্বে তার সঙ্গে সাক্ষাতকারী আত্মীয়দেরকে তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের মতো বহু দেশপ্রেমিক মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আমি যে সেই শহিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার সুযোগ ও অধিকার লাভ করেছি এটা আমার পক্ষে বহু ভাগ্যের কথা।"

মুসলমানরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেনি এমন অভিযোগ মোটেই সত্য নয়। তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক নেতারা ছিলেন। তারা সবাই সমাজের উপরতলার লোক। মুসলমানদের মধ্যে কোনো কোনো নেতা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেন। 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করতেন। জিন্নার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কারণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের মতো অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রচারে নেমেছিলেন। অন্যদিকে মহাত্মা নামে যিনি পরিচিত সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও যখন রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন তখন মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও গান্ধীর আন্দোলন থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। (মুসলিমপ্রীতির জন্য গান্ধী হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলের সদস্য হিন্দু যুবক নাথুরাম গডসে দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।)

BanglaBook.org

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতো লেখক যিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কদর্য দিক তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে অভয়ার মুখ দিয়ে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের উদারনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন, সেই শরৎচন্দ্রও ১৯২৬ সালে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে হিন্দুর 'সাংস্কৃতিক শেষ্ঠত্ব' তুলে ধরেন। এই কথা বলে মুসলমানদের আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতারও বিরোধীতা তিনি করেছিলেন।

১৯৩২ সালে 'দি বেঙ্গল হিন্দু মেনিফেস্টো' নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। সেখানেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থায় তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়। এই প্রচার পত্রে কাসিমবাজারের মহারাজ শিরিশচন্দ্র নন্দীসহ বড়ো বড়ো জমিদার এবং অনেক নামকরা উকিল স্বাক্ষর করেন। সেখানেও মুসলমানদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়। বলা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে 'বাঙালি মুসলমানরা' হিন্দুদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের। হিন্দুদের শেষ্ঠত্ব এবং মুসলমানের অযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য বলা হয়, "তারা (অর্থাৎ মুসলমানরা) কখনও সৈনিক হিসেবে কাজ করেনি বা সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য কোনো কিছু করেনি।" স্পষ্টতই এই বাক্যটি বৃটিশরাজের প্রতি হিন্দু আনুগত্যের প্রমাণ বহন করে। বাস্তবে উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের হিন্দুরা বৃটিশ ভক্ত ছিলেন (কিছু ব্যতিক্রম বাদে)। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সে কথা আর খাটে না। বরং শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। 'সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার' বদলে সাম্রাজ্য উৎখাতের স্বপ্নই তারা দেখতেন। অন্যদিকে ঘরে উর্দু বলা তথাকথিত অভিজাত মুসলমানরা ছিলেন বৃটিশের অনুগত এবং মুসলিম লীগের সমর্থক। কিন্তু বাঙালি মুসলমান কৃষক যে ইতিপূর্বে মুসলিম লীগের প্রতি কোনো সমর্থন দেয়নি তার প্রমাণ তো পাওয়া গেল ১৯৩৭ এর নির্বাচনে। ঘটনাক্রমে বাংলায় অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ছিল মুসলমান। এই কৃষকরা হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খাতেই পাকিস্তান দাবির পেছনে সমবেত হয়েছিল।

BanglaBook.org

পাকিস্তান দাবি

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে যে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র (Separate States) গঠনের দাবি জানানো হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মহম্মদ আলী জিন্না যিনি কায়েদ-এ-আজম (শ্রেষ্ঠ নেতা) উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন। লাহোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ইংরেজিতে লিখিত এই প্রস্তাবে 'States' কথা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে একাধিক রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পাশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো নিয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বাংলা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে এবং উত্তর পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে আরেকটি প্রদেশ গঠিত হবে। লাহোর প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি পাকিস্তান শব্দটিও সেখানে ছিল না। পরে মুসলিম লীগের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী এক সভায় প্রস্তাবটির ভাষায় সংশোধনী আনেন স্বয়ং কায়েদ-এ-আজম। এখন ইংরেজিতে 'States'এর বদলে শুধু 'State' শব্দটি বসানো হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র একটিই হবে, একাধিক নয়। এইভাবে উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি অঞ্চল এবং পূর্বের আরেকটি অঞ্চল (আজকের বাংলাদেশ) নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি।

লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটি লিখিত না থাকলেও হিন্দু রাজনীতিবিদ ও সংবাদপত্র এবং মুসলিম জনগণ এটাকেই পাকিস্তান বলে মনে করতে থাকে। বস্তুত ১৯৪৭ সালের ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাংলার পূর্বাংশ এবং পশ্চিমে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল দুটিকে নিয়ে একত্রে একটি দেশ গঠিত হয়েছিল যার নাম হয়েছিল পাকিস্তান। এই দুই অংশের মধ্যে দূরত্ব ছিল এক হাজার মাইলের বেশি। মধ্যে আরেকটি দেশ ভারত। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিগত কোনো মিলই ছিল না। বস্তুত এটি ছিল একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র।

পাকিস্তানের ধারণাটি লাহোর প্রস্তাবের আগেও প্রচলিত ছিল। মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে যারা তাত্ত্বিক

BanglaBook.org

রূপ দেবার চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে কবি আল্লামা ইকবাল অন্যতম। ইকবাল অবশ্য পৃথক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেননি। তার চিন্তার মধ্যে মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর পশ্চিম ভারতের অঞ্চলটিকে একটি পৃথক রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তাও আবার সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা কনফেডারেশনের কাঠামোর মধ্যে রাখার কথাই তিনি ভেবেছিলেন। ইকবালের মতবাদ দ্বারা ক্যামব্রিজে অধ্যয়নরত কিছু ভারতীয় মুসলিম ছাত্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী 'Now or Never' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন যেখানে সর্বপ্রথম পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। উত্তর ভারতের পাঞ্জাবের 'P', উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বসবাসকারী জনগণ আফগানী'র 'A', কাশ্মিরের 'K', সিন্ধু প্রদেশের 'S' এবং বেলুচিস্তানের শেষাংশ 'Stan' -এইভাবে ইংরেজি বর্ণগুলো নিয়েই পাকিস্তান শব্দটি চয়ন করা হয়েছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে বাংলার কোন উল্লেখ বা চিন্তা নাই। অন্যদিকে কাশ্মিরকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যে কাশ্মির ছিল মুসলমান অধ্যুষিত কিন্তু হিন্দু রাজা শাসিত একটি দেশীয় রাজ্য। এই ক্যামব্রিজ গোষ্ঠী অবশ্য কাশ্মিরসহ যে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান তাকে তারা ভারতের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবেই চিন্তা করেছিলেন।

প্রথমে পাকিস্তান কথাটি খুব একটা সাড়া জাগাতে পারেনি। বরং এটা ছিল সেই সময় যখন বিশ্বযুদ্ধ চলছে। নেতাজি সুভাষ বসুর নেতৃতে আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যে ফৌজে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈন্য ও সেনপতিরা ছিলেন। লাহোর প্রস্তাবের দুই বছর পর গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন সারা দেশকে তোলপাড় করেছিল (১৯৪২-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত গান্ধী কারারুদ্ধ ছিলেন)। বরং যুদ্ধ পরবর্তী কালে পাকিস্তান আন্দোলনটি ভারতের মুসলমান জনগণের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই ভারতের কিছু মুসলিম (অবাঙালি) শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর উদ্ভব ঘটে। এর আগে ভারতের বড়ো বুর্জোয়ারা ছিল প্রধানত হিন্দু ও পার্সি। সদ্য উদীয়মান মুসলমান বুর্জোয়ারা চেয়েছিল অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রভাবমুক্ত একটি শোষণের ক্ষেত্র। এবং সেটই হলো তাদের পাকিস্তান। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম চাকুরীজীবী ও ছোটো ব্যবসায়ীরা হিন্দুদের থেকে সবদিক দিয়েই পিছিয়ে

BanglaBook.org

ছিল। তারা মনে করেছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দুদের কোনো প্রভাব থাকবে না। ফলে চাকরি ও ব্যবসায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী থাকবে না। তারা দ্রুত বিকাশ লাভ করবে। সবচেয়ে বড়ো কথা ব্যাপক সংখ্যগরিষ্ঠ কৃষক যদি পাকিস্তান সমর্থন না করত তাহলে পাকিস্তান আন্দোলন এত দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারত না। বাংলাদেশে ঘটনাক্রমে অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু এবং পূর্ববঙ্গে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজা ও কৃষকরা ছিল মুসলমান। তারা আশা করেছিল পাকিস্তান হলে তারা জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্ত হবে এবং জমি পাবে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যারা উচ্চবিত্তেরও অংশ বটে তারা সামাজিকভাবেও গরিব ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের নির্যাতন ও অপমান করত। তাই এক অর্থে পাকিস্তান আন্দোলনের একটি শ্রেণীভিত্তি আছে, কিন্তু শ্রেণী প্রশ্নটি বিকৃত রূপ নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে আরও জোরদার করে তুলেছিল।

প্রথম থেকেই পাকিস্তান দাবি বা প্রকল্পটি কী তা খুবই অস্পষ্ট ছিল। এমনকি জিন্নার নিজের মনেও কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। অনেক মুসলমান এটাকে উনবিংশ শতাব্দীর ওয়াহাবিদের মতো মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবেও কল্পনা করেছিল। বাস্তবে সেরকম কোনো চিন্তা কখনওই জিন্না বা মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে ছিল না। জিন্না নিজেও কোন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, এমনকি ধর্মীয় আচারবিধিও পালন করতেন না। পাকিস্তান দাবিটি ছিল জিন্নার একটি রাজনৈতিক চাল মাত্র। ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে, বৃটিশ ষড়যন্ত্রের কারণে এবং কংগ্রেসের কতিপয় নেতার ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাস ইত্যাদির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বৃটিশ কুটনৈতিক তৎপরতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে প্রথম দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বেশ বেকায়দায় পড়েছিল। তারা ভারতের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দলের সমর্থন ও সহযোগিতার চেষ্টা চালায়। সেইজন্য তারা ১৯৪২ সালে লন্ডন থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে পাঠান। ভারতের জনগণ তখন স্বাধীনতা চায়। সে ব্যাপারে তিনি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। অন্যদিকে পাকিস্তান দাবি বৃটিশের জন্য সুবিধাজনক হলেও এবং জিন্না ও মুসলিম লীগ

BanglaBook.org

বৃটিশের নির্ভরযোগ্য মিত্র হলেও সে ব্যাপারেও কোনো কিছু বলার এখতিয়ার ছিল না ক্রিপ্‌স মিশনের।

১৯৪৫ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। ১৯৪৫ এর জুলাই মাসে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে। ফ্লিমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী হন। তখন ইংরেজদের অবস্থা ছিল 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। যদিও চার্চিলের মতো প্রতিক্রিয়াশীল নেতা ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, অধিকাংশ ইংরেজ রাজনৈতিক নেতারা দ্রুত ভারত থেকে চলে আসার পক্ষে ছিলেন। তাদের ভয় ছিল বিলম্ব হলে ভারতীয়রা তাদেরকে তাড়িয়ে বিদায় করবে। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতের অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন, নৌ-সেনা বিদ্রোহ, শ্রমিক কৃষকের জাগরণ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ তাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এর পাশাপাশি 'লাল আতঙ্ক'ও বিরাজ করছিল। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছিলেন 'ইউরোপ ভূত দেখছে– কমিউনিজমের ভূত'। ১০০ বছর পর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা সেই 'ভূতের' আতঙ্ক আরও বেশি করে পেতে শুরু করল। সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে বার্লিনের পতন, পূর্ব ইউরোপে লাল পতাকার জয়জয়কার, চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। হো চি মিনের নেতৃত্বে স্বাধীন ভিয়েতনামের সরকার গঠিত হয়েছে। সেখানেও চলছে বিপ্লবী যুদ্ধ। কোরিয়ায় কমিউনিস্টরা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সারা এশিয়া জুড়ে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। সব মিলে সাম্রাজ্যবাদীদের মনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। এদিকে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্য বিশ্বব্যাপীও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনায় বার্ট্রান্ড রাসেল ভারতকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। এমত অবস্থায় বৃটেনের সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা দিলেন যে তিনি ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাসী। তবে কিভাবে তা দেওয়া যাবে তা নির্ভর করবে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলোচনার সাপেক্ষে। তিনি আরও বললেন, ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ভারতের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস মুসলিম লীগসহ বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনার জন্য সিমলায় এক বৈঠকে মিলিত হন। কংগ্রেস মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেই

BanglaBook.org

আলোচনা ব্যর্থ হয়। সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এটলি সরকার এরপর বৃটেনের তিন মন্ত্রীকে আলোচনার জন্য ভারতে পাঠান। এটাই হলো ক্যাবিনেট মিশন। এই মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স (এই মিশনের নেতা), এ জি আলেক্সান্ডার ও স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স। তারা ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে দিল্লী এসে পৌছান। তারা পাকিস্তান প্রস্তাব নাকোচ করে দেন। কিন্তু শিথিল ফেডারেল কাঠামো ও সীমিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সম্পন্ন ভারতীয় রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। ভারতীয় প্রদেশগুলোকে তিনটি বিশেষ গ্রুপে ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণ পরিষদ থাকবে। গ্রুপগুলো হচ্ছে–

১. মুসলিম প্রধান গ্রুপ
২. বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি গ্রুপ
৩. বাদ বাকি অঞ্চল নিয়ে হিন্দু প্রধান গ্রুপ (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত)। সেটাই সবচেয়ে বড়ো গ্রুপ।

প্রত্যেক গ্রুপের মধ্যে একাধিক প্রদেশ থাকবে। গ্রুপগুলোর সদস্যরা একটি সংবিধান পরিষদে মিলিত হয়ে ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করবে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে।

জিন্না ধারণা করেছিলেন কংগ্রেস সম্ভবত দেশ বিভাগ এড়ানোর জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে যেকোনো ধরণের ছাড় দিতে প্রস্তুত। তিনি কেবিনেট মিশন প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। ঐ বছর জুন মাসে জিন্না ও মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মানল না কংগ্রেস। কেবিনেট মিশনও ব্যর্থ হলো।

কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। কংগ্রেস কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব না মানলেও অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের ব্যাপারে রাজি হয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হলো। এই সরকারে প্রথমে শুধু কংগ্রেস দলই ছিল। ভাইসরয় ওয়াভেলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাও সম্মত হলেন যে মুসলিম লীগ এই সরকারে থাকবে। ১৩ই অক্টোবর

BanglaBook.org

জিন্নার প্রতিনিধিরাও এই সরকারে যোগদান করেছিলেন। জিন্নার প্রস্তাবিত লীগ মন্ত্রীদের মধ্যে বাংলার জোগেশ মণ্ডলের নামও ছিল যিনি ছিলেন হিন্দু নমঃশুদ্রদের প্রতিনিধি। নেহেরু প্রধানমন্ত্রী, সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগের লিয়াকত আলী খান অর্থমন্ত্রী। এই মন্ত্রীসভা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারেনি, বরং কংগ্রেস-লীগের বিরোধ একটা বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি করেছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাও কংগ্রেস নেতৃত্বেকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। তারা ভাবতে শুরু করেন অখণ্ড ভারত রক্ষার জন্য মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতায় আসা ও যৌথ কাজের চেয়ে ভারত বিভাগ ভালো। এইভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিকে রাজনৈতিক ঘটনাবলি ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিল।

বৃটিশ রাজের শেষ দিনগুলো

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে হিন্দু এলাকায় কংগ্রেস এবং মুসলিম এলাকায় মুসলিম লীগ বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়েছে।

১৯৩৭ সালে বাংলায় যেখানে মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৩৮টি আসন, বেশিরভাগই ছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী, সেখানে এবার মুসলিম লীগ এককভাবে পেল ১১৩টি। বাংলা এবং পাঞ্জাব হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল। পাঞ্জাবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছিল ৫১টি, মুসলিম লীগ ৭৩টি, অন্যান্য ৫১টি– মোট ১৭৫। বাংলা ছিল সর্ববৃহৎ প্রদেশ।

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ জয়া চ্যাটার্জি তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা ভাগ হল' গ্রন্থে লেখেন নির্বাচনের এই ফলাফলের ফলে "হিন্দু বাঙালিদের প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হয়। কারণ দুর্ভিক্ষের সময় সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী তাঁর কথিত দুর্নীতির জন্য হিন্দু জনমতের দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর লোক বলে চিহ্নিত হন। বাঙলায় দুর্ভিক্ষে, অনাহারে যে অসংখ্য লোক মারা যায় তার জন্য সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন বলে হিন্দু সংবাদপত্রের বিভিন্ন লেখালেখিতে তাঁর নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস হাই কমান্ডের কাছে একজন বাঙালি লেখেন,

BanglaBook.org

'১৯৪৩ সালে বাঙলার প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী লোকটিকে পুনরায় বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক'।" সোহরাওয়ার্দী আরেকটি কাজ যেটা করলেন, এতদিন ধরে মন্ত্রীসভায় হিন্দু মুসলমানের যে সমতার নীতি চালু ছিল তা তিনি উদ্ধতভাবে বাতিল করে দিলেন। ১১জন মন্ত্রীর মধ্যে হিন্দু মন্ত্রীর সংখ্যা মাত্র তিন। একজন বর্ণ হিন্দু, দুইজন তফশিলি হিন্দু।

এর পরের যে ঘটনাটির জন্য সোহরাওয়ার্দীকে অভিযুক্ত করা হয় সেটি যে অত্যন্ত নিন্দনীয় তাতে কোনো সন্দেহ নাই। পাকিস্তান দাবি আদায়ের কথা বলে জিন্না ঘোষণা করলেন (ষোলই আগস্ট ১৯৪৬) 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'। এই ডাইরেক্ট এ্যাকশন কার বিরুদ্ধে জিন্না পরিষ্কার করেন নি। তবে দেখা গেল এই এ্যাকশন ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে নয়, বরং স্বদেশীয় ভ্রাতা হিন্দুদের বিরুদ্ধে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা ১৬ই আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা দিলেন। সেই দিন সকালবেলা মুসলিম জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা সৈয়দ নওশের আলীর বাসায়ও মুসলিম লীগের গুণ্ডারা আক্রমণ চালিয়েছিল। খবর পেয়ে নিকটবর্তী হিন্দু পাড়ার যুবকরা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এসে শেষ মুহূর্তে নওশের আলীর পরিবারকে রক্ষা করে। সেদিন বিকালে মুসলিম লীগের জনসভার সোহরাওয়ার্দী চরম হিন্দু বিদ্বেষী উত্তেজনাময় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সকালবেলা থেকেই মুসলিম লীগাররা সশস্ত্র মহড়া দিতে থাকে। অবশ্য বিষয়টি একেবারে একতরফা ছিল না। ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে এবং সোহরাওয়ার্দীর কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু গুণ্ডা এবং তাদের নেতারা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই দাঙ্গায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার মানুষ কোলকাতায় নিহত হয়। কোলকাতায় মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি। তাই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই মারা গেছে বেশি। চরম সাম্প্রদায়িক ও নিরুদ্বিগ্ন কংগ্রেস নেতা প্যাটেল এই বিভৎস বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করেন, "হিন্দুরা এতে তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হয়েছে"। হিন্দু মুসলমান উভয় দলের সাম্প্রদায়িক নেতারা, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এবং বৃটিশ রাজ (যাদের নীতি ছিল Divide and Rule) সকলেই এই দাঙ্গার জন্য কমবেশি দায়ী। ইতিহাসবিদ জয়া চ্যাটার্জি লিখেছেন, "এই রক্তক্ষরণের দায়িত্বের অনেকটাই বহন করেন সোহরাওয়ার্দী নিজে; কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ দেন এবং দাঙ্গা শুরু হওয়া মাত্রই তা দমনে সন্দেজনক অবহেলার (ইচ্ছাকৃত বা অন্য কারণে) কারণে ব্যর্থ হন।" এই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা সারা দেশেই ছড়িয়ে

BanglaBook.org

পড়ে। পাঞ্জাবে শিখ আর মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্য গান্ধী আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন এবং ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছেন। তিনি ছুটে গেছেন নোয়াখালীতে (যেখানে মুসলমানরা হিন্দুদের হত্যা করেছে) এবং বিহারে (যেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করেছে)। এই দাঙ্গার আসল ফল হলো এই যে, দেশ বিভাগ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

পরের বছর ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এটলি ঘোষণা দিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যেই ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তবে দেশ বিভাগ বা পাকিস্তান সম্পর্কে কোনো বক্তব্য ছিল না। ভারতকে স্বাধীনতা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত করলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন (২০শে ফেব্রুয়ারি)। ২৪শে মার্চ মাউন্টব্যাটেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এসেই বুঝেছিলেন যে দেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং দেশ ভাগ করতে হবে। তিনি বলেছিলেন 'আমরা এক আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছি। আমরা কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছি একমাত্র সেই ঘোষণাই অগ্নুৎপাত রোধ করতে পারে"। ১৯৪৭ এর গোড়ার দিকেই কংগ্রেস দেশ ভাগের প্রস্তাবটি মোটামুটি মেনে নিয়েছিল তবে তাদের শর্ত ছিল, বাংলা ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে। কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনি মাউন্টব্যাটেনকে জানাচ্ছেন যে যুদ্ধের চেয়ে পাকিস্তানের দাবি মেনে নেওয়া ভালো। মাউন্টব্যাটেনও দ্রুত স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন। ১৯৪৭ এর ১৪ই জুন কংগ্রেসের AICC অধিবেশনে গোবিন্দ বল্লভপন্থ দেশভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আজাদ আপত্তি করলেন। কিন্তু কোন বিকল্প প্রস্তাব রাখতে পারলেন না। নেহেরু বললেন এখন দেশভাগ না মেনে নিলে ইংরেজরাই এমন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবে যা আরও ক্ষতিকর হবে। গান্ধীজি অপ্রীতিকর মনে করেও মাউন্টব্যাটেনের পারিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করলেন। এদিকে ১৭ই এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম ও কংগ্রেস নেতা (সুভাষ বসুর ভাই) শরৎ বসু স্বাধীন স্বতন্ত্র যুক্ত বাংলার প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু এর আগেই ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসেই, কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে ভারত ভাগ হলে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে।

স্বতন্ত্র স্বাধীন যুক্ত বাংলায় যে মুসলিম আধিপত্য থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেদিনকার সাম্প্রদায়িক পরিবেশে হিন্দুরা স্থায়ীভাবে

BanglaBook.org

মুসলমানের অধীনে থাকতে না চাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী যখন সেই মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতা। আবুল হাশেম সম্পর্কে অবশ্য বলা হয় তার কিছু প্রগতিশীল চিন্তা ছিল। তিনি আন্তরিকভাবেই যুক্তবাংলা চেয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগের একজন নেতা কতদূর প্রগতিশীল হতে পারেন! ভারত স্বাধীন হলে আবুল হাশেম কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে আইনসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে ছিলেন (তার বাড়ি বর্ধমান)। ১৯৫০ সালে তিনি পূর্ববঙ্গে চলে আসেন। কিন্তু কোনো প্রগতিশীল মহলের সাথে তার সম্পর্ক ছিল না। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম, শরৎ বসু প্রমুখের যুক্ত বাংলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। জয়া চ্যাটার্জি বলছেন, "পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা একজন কুখ্যাত অবিশ্বস্ত মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর (অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী) অধীনে থাকার চেয়ে নিজেদের হিন্দু রাষ্ট্রে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর পূর্ব বাংলার হিন্দু ইতিমধ্যে তিক্ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে যে, তাদের গাঁট্টি-বোঁচকা বেঁধে পশ্চিম বাংলায় পালাতে হবে।"

২রা জুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তার চূড়ান্ত পরিকল্পনা পেশ করলেন। ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান দুটি ডমিনিয়নের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। আসামের সিলেট জেলা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তানের পক্ষে রায় গেল। বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হলো। অতি দ্রুত র‍্যাডক্লিফ মানচিত্রে দাগ কেটে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করলেন। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। আমরা সেদিন বুঝতে পারিনি যে আরেকটি গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিলাম।

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান ২৪ বছর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অস্তিত্ব ঘোষণা করলাম। সে দেশ হলো বাংলাদেশ।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org